বিজ্ঞান

দাখিল নবম শ্রেণি

অনুসন্ধানী পাঠ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

অপরাজেয় বাংলা

সাবাস বাংলাদেশ

বিজয় '৭১

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি ভাস্কর্য

ক. অপরাজেয় বাংলা: অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত যাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৭৯ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এটি অবস্থিত ।

খ. সাবাস বাংলাদেশ: সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ভাস্কর্য যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ। ১৯৯১ সালে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত।

গ. বিজয় '৭১: মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক এই ভাস্কর্যটি। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অবস্থিত। ভাস্কর্যটির শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২০০০ সালে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী
প্রণীত এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

দাখিল
নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
রনি বসাক
ড. তাহমিনা ইসলাম
মোঃ ইশহাদ সাদেক
সাইফা সুলতানা
নাসরীন সুলতানা মিতু
শিহাব শাহরিয়ার নির্ঝর
মোঃ রোকনুজ্জামান শিকদার
ড. মানস কান্তি বিশ্বাস
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ

সব্যসাচী চাকমা

মেহেদী হক

প্রচ্ছদ

মেহেদী হক

গ্রাফিক্স ডিজাইন

নাসরীন সুলতানা মিতু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর ও জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১ : বল, চাপ ও শক্তি ০১

অধ্যায় ২ : তাপমাত্রা ও তাপ ২৮

অধ্যায় ৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ৫০

অধ্যায় ৪ : পদার্থের অবস্থা ৬৮

অধ্যায় ৫ : পদার্থের গঠন ৭৭

অধ্যায় ৬ : পর্যায় সারণি ৯৫

অধ্যায় ৭ : রাসায়নিক বন্ধন ১১০

অধ্যায় ৮ : জিনতত্ত্ব ও বংশগতিবিদ্যা ১২৪

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৯ : জৈব অণু ১৩৪

অধ্যায় ১০ : সালোকসংশ্লেষণ ১৪৭

অধ্যায় ১১ : মানব শরীরের তন্ত্র ১৫৫

অধ্যায় ১২ : বাস্তুতন্ত্র ১৮২

অধ্যায় ১৩ : পৃথিবী ও মহাবিশ্ব ২০৬

অধ্যায় ১৪ : পরিবেশ ও ভূমিরূপ ২১৮

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই? নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের স্বাগতম!

দেখতেই পাচ্ছ, এতদিন তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছ, তাতে একটা বড়ো পরিবর্তন এসেছে! তোমাদের সকল বিষয়ের বইগুলোও তাই এখন একটু অন্যরকম। এই বছরে বিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দুইটি বই হাতে পেয়েছ! এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইটির সঙ্গে তোমাদের আরেকটা 'অনুশীলন বই'ও দেওয়া হয়েছে। এই অনুসন্ধানী পাঠ বইটির সঙ্গে অনুশীলন বইয়ের বড়ো ধরনের পার্থক্য রয়েছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, নতুন নতুন কিছু সমস্যার সমাধান করবে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আর সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো সব বিস্তারিতভাবে তোমাদের অনুশীলন বইটিতে দেওয়া আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে নানা ধাপে তোমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার প্রয়োজন পড়বে, সেজন্য তোমাদের সাহায্য করবে এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বই। স্কুলে বা বাড়িতে, যখন যেখানেই থাকো, তোমরা এই বইটির সাহায্য নিয়ে দরকার হলে নিজে নিজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে!

নবম শ্রেণিতে তোমাদের বিজ্ঞানের যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হবে সেগুলো এই বইয়ে মোট চৌদ্দটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা যে অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে যাবে, তাতে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে তোমাদের কাজে আসবে।

তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো?

অধ্যায় ১

বল, চাপ ও শক্তি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ১

বল, চাপ ও শক্তি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ নিউটনের প্রথম সূত্র
- ☑ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র
- ☑ বল
- ☑ চার ধরনের বল
- ☑ নিউটনের তৃতীয় সূত্র
- ☑ মহাকর্ষ বল ও নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র
- ☑ চাপ: আর্কিমিডিসের সূত্র ও প্লবতা
- ☑ শক্তি: গতিশক্তি ও বিভব শক্তি

আগের শ্রেণিতে তোমরা গতি-সংক্রান্ত রাশিগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছ এবং সময়ের সাপেক্ষে এই রাশিগুলো কীভাবে পরিবর্তন হয় সেটি সহজ কিছু গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে প্রকাশও করতে শিখেছ। অর্থাৎ তোমাদেরকে সরণ, বেগ, ত্বরণ এরকম রাশিমালার সংজ্ঞার কথা বলে তাদের মাঝে সম্পর্কের সমীকরণগুলো শেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই গতিটা কোথা থেকে এসেছে তার পেছনের বিজ্ঞানটুকুর একটুখানি আভাস দেওয়া হলেও সেটি ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই অধ্যায়ে প্রথমবারের মতো তোমাদেরকে সেই গতি কোথা থেকে আসে এবং বলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী সেটি বলা হবে। তোমরা দেখবে নিউটনের তিনটি যুগান্তকারী সূত্র দিয়ে কীভাবে গ্রহ-উপগ্রহ থেকে শুরু করে, রকেট কিংবা গাড়ি এমনকি ক্রিকেট বল পর্যন্ত সব কিছুর গতি বিশ্লেষণ করা যায়।

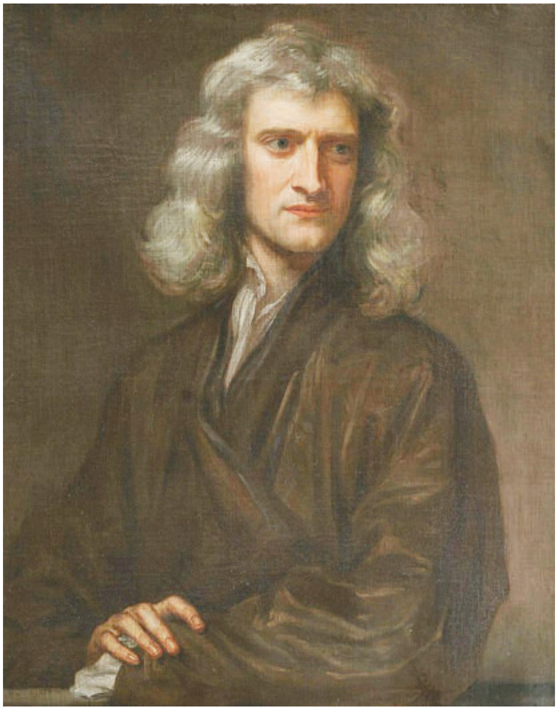

ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা

আইজ্যাক নিউটন ছিলেন ব্রিটিশ একজন পদার্থবিজ্ঞানী। প্রায় তিনশত বছর আগে তিনি গতি, মহাকর্ষ এবং আলো ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশাল অবদান রেখে গেছেন। নিউটন গণিতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। জার্মান গণিতবিদ লিবনিজ এবং নিউটনকে ক্যালকুলাসের আবিষ্কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিউটন একই সঙ্গে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক পরীক্ষণে দক্ষ বিজ্ঞানী ছিলেন। গতি ও মহাকর্ষ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল পুরোপুরি তাত্ত্বিক আবার আলো সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে তিনি সরাসরি পরীক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রমাণ করেছেন। এখন যেমন বৈজ্ঞানিক জার্নালের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কাজগুলো প্রকাশিত হয়, তিন শতাব্দী আগের অবস্থাটি ঠিক এমন ছিল না। তখন কেউ কেউ বই লিখে নিজের কাজ প্রকাশ করতেন। নিউটন লিখেছিলেন 'ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' নামের একটি বই। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এই যুগান্তকারী বইটি "ম্যাথমেটিকা" নামে পরিচিত।

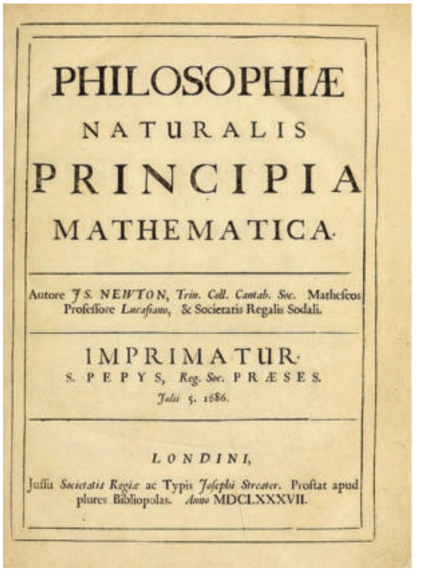
PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA.

Autore J S. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc. Matheseos Professore Lucasiano, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, Reg. Soc. PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Jussu Societatis Regiæ ac Typis Josephi Streater. Prostat apud plures Bibliopolas. Anno MDCLXXXVII.

১.১ নিউটনের প্রথম সূত্র

নিউটনের প্রথম সূত্রটিকে অনেক সময় জড়তার সূত্র বলা হয়। বস্তুর ওপর কোনো বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুটির গতি কেমন হয়, এই সূত্রটি সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে। সূত্রটি জানার আগে আমাদের স্থিতি জড়তা এবং গতি জড়তা বলতে কী বোঝাই সেটি জানা প্রয়োজন।

১.১.১ স্থিতি ও গতি জড়তা

তোমরা যদি বাসে কিংবা ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাক, এবং হঠাৎ বাস কিংবা ট্রেনটি চলতে শুরু করে তখন তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে তোমরা পিছন দিকে পড়ে যেতে চাও। বাস কিংবা ট্রেনের মেঝেতে স্পর্শ করে থাকা তোমার শরীরের নিচের অংশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেও শরীরের উপরের অংশ তার আগের অবস্থানেই স্থির থাকতে চায়, সেজন্য তোমার শরীরের উপরের অংশ পেছন দিকে হেলে পড়ে, এবং তুমি পড়ে যেতে উদ্যত হও। একটি গ্লাসের ওপরে এক টুকরো শক্ত কাগজ বা

কার্ডবোর্ডের ওপর একটি মুদ্রা রেখে তুমি যদি টান দিয়ে কাগজটি সরিয়ে নাও, দেখবে মুদ্রাটি কাগজের সঙ্গে চলে না এসে গ্লাসের ভেতরেই পড়েছে (চিত্র ১.১)। অর্থাৎ, কাগজটি সরে গেলেও মুদ্রাটি তার আগের অবস্থানেই থাকার চেষ্টা করেছে। এই যে, স্থির থাকা একটি বস্তু স্থির হয়েই থাকতে চায়, এই ঘটনাকে 'স্থিতি জড়তা' (Static Inertia) বলে।

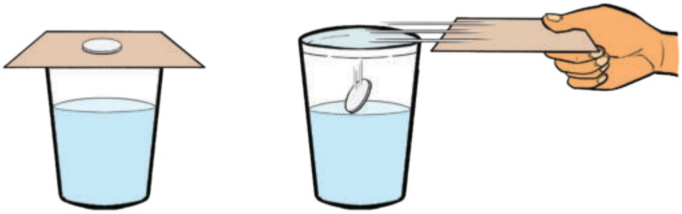

চিত্র ১.১: কার্ডবোর্ড সরিয়ে নিলে স্থিতি জড়তার কারণে মুদ্রাটি গ্লাসে পড়ে যাবে।

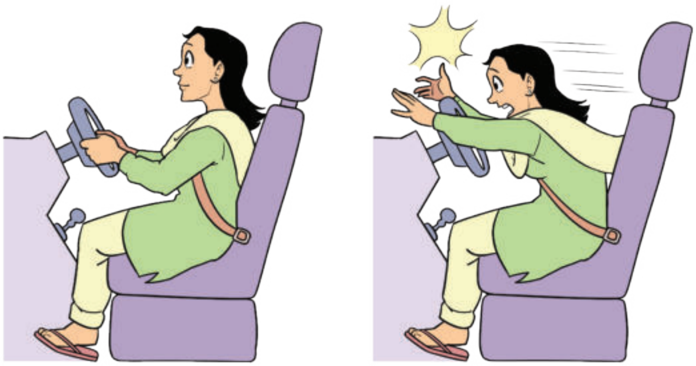

চিত্র ১.২ : হঠাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামিয়ে দিলে গতি জড়তার কারণে শরীরের উপরের অংশ সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ যে, চলন্ত গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করে থামিয়ে দেয়া হলে আমাদের শরীর ঝটকা দিয়ে সামনের দিকে হেলে পড়তে চায়। ব্রেক করার কারণে শরীরের নিচের অংশ গাড়ির সঙ্গে থেমে গেছে কিন্তু আমাদের শরীরের উপরে অংশ তখনো গতিশীল রয়ে গেছে, এজন্য সেটি সামনে হেলে পড়ে। তোমরা কি কখনও কাউকে চলন্ত বাস বা ট্রেন থেকে নামতে দেখেছ? যারা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ তারা মাটিতে পা দিয়ে কিন্তু থেমে যায় না খানিকটা দূরত্ব দৌড়ে যায়, তারা জানে মাটিতে নেমে গেলে তাদের পা থেমে যাবে কিন্তু শরীরের বাকি অংশ তখনও গতিশীল রয়ে যাবে, তাই শরীরের নিচের অংশ সমান বেগে ছুটিয়ে না নিলে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে (চিত্র ১.২)। এই যে, গতিশীল একটি বস্তু আগের মতো গতি বজায় রাখতে চায়— এই ঘটনাকে 'গতি জড়তা' (Dynamic Inertia) বলে।

ভাবনার খোরাক:

- কাঁথা বা কম্বলকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ধুলা বের করা যায়, কেন?
- স্পিন বোলাররা মোটামুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বল করেন, কিন্তু পেস বোলাররা দূর থেকে ছুটে এসে বল করেন। কেন?

১.১.২ নিউটনের প্রথম সূত্র : সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

স্থিতি জড়তা ও গতি জড়তাকে একত্রে বলা হয় জড়তা। অর্থাৎ স্থির বস্তুর স্থির থাকার এবং গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকার যে প্রবণতা, সেটিই হচ্ছে জড়তা। নিউটন তার গতির প্রথম সূত্রে এই জড়তার বিষয়টি বলেছেন।

» নিউটনের প্রথম সূত্র : বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা না হলে, স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে, এবং সরল রেখায় সমবেগে চলমান বস্তু সরল রেখায় সমবেগে চলতে থাকবে।

এই সূত্রটির প্রথম অংশটুকু নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই, দৈনন্দিন জীবনে এটি আমরা সব-সময়ই দেখে থাকি যে স্থির একটি বস্তুকে ধাক্কা না দিলে সেটি স্থির থাকে, নিজ থেকে নড়াচড়া করে না। তবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে পরের অংশটুকু বুঝতে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে, কারণ গতিশীল কোনো বস্তুকেই আমরা অনন্তকাল চলতে দেখি না। এই সমস্যার উত্তর কিন্তু নিউটনের প্রথম সূত্রের শুরুতেই দেয়া আছে, এখানে 'বাইরে থেকে বল প্রয়োগ' করার কথা বলা হয়েছে। তুমি যখনই কোনো একটা বস্তুকে গতিশীল করবে, তখন ঘর্ষণ কিংবা বাতাসের বাধা ইত্যাদি বল গতির উল্টোদিকে কাজ করে গতিটিকে কমিয়ে দেবে। মহাশূন্যে বাতাস নেই বলে বাতাসের ঘর্ষণ নেই, তাই সেখানে যদি কোনো বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেত, তাহলে সেটি অনন্তকাল ধরে একই বেগে চলতে থাকত।

ভাবনার খোরাক:

» পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা ভারী বস্তু একটি সুতা দিয়ে ঝুলছে, এবং বস্তুটির নিচে বাধা আরেকটি সুতা ঝুলছে। নিচের সুতা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে A অংশের এবং ধীরে ধীরে টান দিলে B অংশের সুতা ছিঁড়বে (চিত্র ১.৩)। কেন?

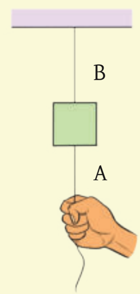

চিত্র ১.৩ : হ্যাঁচকা টান দিলে A বিন্দুতে কিন্তু ধীরে ধীরে টানলে সুতাটি B বিন্দুতে ছিঁড়বে।

১.২ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র

কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুর গতি কেমন হয় সেটি নিউটনের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে। তোমরা দেখবে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুর গতি কেমন হয় সেটি নিউটনের দ্বিতীয়

সূত্রে ব্যাখ্যা করা হবে। আগের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে বেগের পরিবর্তন করতে হলে সেখানে বল প্রয়োগ করতে হয়, নিউটনের প্রথম সূত্র সেই বিষয়টি আবার নিশ্চিত করেছে। প্রথম সূত্রে কিন্তু বলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কী কিংবা কীভাবে বল পরিমাপ করতে হয় সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, বল পরিমাপের পদ্ধতি পাওয়া যায় নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি জানার আগে তোমাদের নতুন একটি রাশির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, সেটি হচ্ছে ভরবেগ।

১.২.১ ভরবেগের ধারণা

যদি কেউ বাইসাইকেলে করে 1 ms^{-1} বেগে তোমার দিকে আসে তাহলে তুমি ইচ্ছে করলেই তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে সেটাকে থামিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি 1 ms^{-1} বেগে একটা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে তুমি কিন্তু তাহলে হাত দিয়ে ধরে গাড়িটা থামাতে পারবে না, যদিও সাইকেল আর গাড়ি দুটোই কিন্তু ঠিক একই বেগে গতিশীল ছিল। দুটোর পার্থক্যটা আসলে ভরের, সাইকেল যেমন- কম ভরের বা হালকা একটি বস্তু, গাড়ি মোটেই তা নয়, সেটি অনেক বেশি ভরের একটি বস্তু। অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে গতি পরিবর্তন করার বেলায় বেগের পাশাপাশি এখানে ভর কম বা বেশি হওয়ার একটি ব্যাপার আছে।

যদি কেউ একটি ছোটো পাথর 1 ms^{-1} বেগে তোমার দিকে ছুঁড়ে দেয় তুমি খুব সহজেই সেই পাথরটা ধরে ফেলতে পারবে। এবারে সে যদি একটা গুলতি দিয়ে সেই একই পাথর তোমার দিকে 100 ms^{-1} বেগে ছুড়ে দেয়, তুমি নিশ্চয়ই সেটি ধরার সাহস করবে না। যদিও দুটো একই পাথর, অর্থাৎ তাদের একই ভর, কিন্তু দুই ক্ষেত্রে পাথরটি একই বেগে গতিশীল নয়। বোঝাই যাচ্ছে, পার্থক্যটা এক্ষেত্রে বেগের। অর্থাৎ, বল প্রয়োগ করে গতি পরিবর্তন করার বেলায় ভরের পাশপাশি এখানে বেগ কম বা বেশি হওয়ার একটি ব্যাপারও আছে।

এই দুটি উদাহরণ থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে, বল প্রয়োগ করে বস্তুর গতি পরিবর্তন, বস্তুর ভর এবং বস্তুর বেগ দুটোর উপরেই নির্ভরশীল। সে কারণে ভর এবং বেগের সমন্বয়ে একটি নতুন রাশির প্রয়োজন হয়, তার নাম ভরবেগ (momentum)। এটি আসলে ভর এবং বেগের গুণফল। তোমাদের ধারণা হতে পারে, যেহেতু ভর এবং বেগ নামে দুটি রাশি রয়েছে, তাই তাদের গুণফল দিয়ে আরেকটি নতুন রাশি সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দৈনন্দিন পরিচিত জীবনের জন্য তোমাদের ধারণা সত্যি, কিন্তু তোমরা জেনে অবাক হবে, যখন কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন ভরবেগ আর শুধু ভর এবং বেগের গুণফল নয়। শধু তাই নয় আলোর কণার (ফোটন) ভর শূন্য কিন্তু তার ভরবেগ শূন্য নয়। উপরের ক্লাসে গিয়ে তোমরা সেটি আরও বিস্তারিতভাবে জানবে। আপাতত আমরা ভরবেগ বলতে ভর ও বেগের গুণফলই বোঝাব।

ভরবেগকে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি p অক্ষর দিয়ে, ভর এবং বেগ যদি যথাক্রমে m এবং v হয় তাহলে $p = mv$ এবং ভরবেগের একক পাওয়া যায় ভরের একক (kg) এবং বেগের একক (ms^{-1})

গুণ করে। অর্থাৎ kg ms^{-1} হলো ভরবেগের একক। বেগের যেহেতু দিক আছে, তাই ভরবেগেরও দিক আছে, বস্তুটির বেগের দিকই হচ্ছে তার ভরবেগের দিক।

উদাহরণ : আগের অনুচ্ছেদে সাইকেল, গাড়ি এবং পাথরের বেগের মান দেওয়া হয়েছিল, ভরের মান দেওয়া হয়নি। যদি সাইকেলের ভর 75 kg, গাড়ির, ভর 2000 kg এবং পাথরের ভর 5g হয়, তাহলে চারটি ক্ষেত্রেই ভরবেগ কত?

সমাধান : সাইকেলের ভরবেগ $p_1 = m_1v_1 = 75 \times 1 = 75$ kg ms^{-1}

গাড়ির ভরবেগ $p_2 = m_2v_2 = 2000 \times 1 = 2000$ kg ms^{-1}

হাতে ছোঁড়া পাথরের ভরবেগ $p_3 = m_3v_3 = 0.005 \times 1 = 0.005$ kg ms^{-1}

গুলতিতে ছোঁড়া পাথরের ভরবেগ $p_3 = m_3v_3 = 0.005 \times 100 = 0.5$ kg ms^{-1}

১.২.২ পরিবর্তনের হার

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি বোঝার জন্য আমাদের আরও একটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে, সেটি হচ্ছে পরিবর্তনের হার। পরিবর্তন শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, যে কোনো একটি রাশির মান যদি বেড়ে যায় কিংবা কমে যায় তাহলে আমরা বলি রাশিটির পরিবর্তন হয়েছে। যেটুকু বেড়েছে কিংবা কমেছে সেটা হচ্ছে পরিবর্তনের মান। কত দ্রুত পরিবর্তনটি হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা পরিবর্তনের হার কথাটি ব্যবহার করি।

ধরা যাক তুমি এবং তোমার বন্ধু সাইকেল চালাতে বের হয়েছ, দুজনেই স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে 10 ms^{-1} বেগে পৌঁছে গেছ, এটি করতে তোমার সময় লেগেছে 2 সেকেন্ড এবং তোমার বন্ধুর লেগেছে 2.5 সেকেন্ড। আমরা হিসাব না করেই বলে দিতে পারি তোমার বেগের পরিবর্তনের হার বেশি কারণ তুমি কম সময়ে একই বেগে পৌঁছে গেছ। যদি হিসাব করতে যাই, তাহলে,

তোমার বেগের পরিবর্তনের হার = $(10\ ms^{-1} - 0)/2s = 5\ ms^{-2}$

তোমার বন্ধুর বেগের পরিবর্তনের হার = $(10\ ms^{-1} - 0)/2.5s = 4\ ms^{-2}$

হিসাব করে আমরা একই উত্তর পেয়েছি। ধরা যাক আবার তুমি এবং তোমার বন্ধু সাইকেল চালাতে বের হয়েছ, এবারেও দুজনেই স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে 5s সাইকেল চালিয়ে দেখেছ তোমার বেগ 20 ms^{-1} এবং তোমার বন্ধুর বেগ 25 ms^{-1}। এবারেও আমরা হিসাব না করেই বলে দিতে পারি এবারে তোমার বন্ধুর বেগের পরিবর্তনের হার বেশি কারণ একই সময় সাইকেল চালিয়ে তার বেগের মান বেশি হয়েছে। যদি হিসাব করতে যাই তাহলে,

তোমার বেগের পরিবর্তনের হার = $(20\ ms^{-1} - 0)/5s = 4\ ms^{-2}$

তোমার বন্ধুর বেগের পরিবর্তনের হার = $(25\ ms^{-1} - 0)/5s = 5\ ms^{-2}$

এবারেও হিসাব করে আমরা একই উত্তর পেয়েছি। কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সময়ের সঙ্গে একটি রাশির পরিবর্তনের অনুপাতকে বলা হয় পরিবর্তনের হার। আগের শ্রেণিতে আমরা বেগ ও ত্বরণ সম্পর্কে জেনেছিলাম। এখন আমরা বলতে পারি, সেখানে বেগ ছিল সময়ের সঙ্গে সরণের পরিবর্তনের হার, এবং ত্বরণ ছিল সময়ের সঙ্গে বেগের পরিবর্তনের হার।

উদাহরণ : আগের অনুচ্ছেদের উদাহরণে প্রতিটি বস্তুকে 1 মিনিটে থামিয়ে দিলে, প্রতিক্ষেত্রে ভরবেগের পরিবর্তনের হার কত হবে?

সমাধান : ভরবেগ পরিবর্তনের হার = (আদি ভরবেগ - শেষ ভরবেগ)/অতিক্রান্ত সময়

এখানে, বস্তুগুলোকে থামিয়ে দেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ শেষবেগ শূন্য, তাই শেষ ভরবেগও শূন্য

সাইকেলের ক্ষেত্রে ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $(75 - 0)/60 = 1.25\ kg\ ms^{-2}$

গাড়ির ক্ষেত্রে ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $(2000 - 0)/60 = 33.33\ kg\ ms^{-2}$

হাতে ছোঁড়া পাথরের ক্ষেত্রে ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $(0.005 - 0)/60 = 8.33 \times 10^{-5}\ kg\ ms^{-2}$

গুলতিতে ছোঁড়া পাথরের ক্ষেত্রে ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $(0.5 - 0)/60 = 8.33 \times 10^{-3}\ kg\ ms^{-2}$

১.২.৩ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র: সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোর একটি। এই সহজ সরল সূত্রটি দিয়ে আমাদের পরিচিত জগতের গতি সংক্রান্ত প্রায় সব কাজই করে ফেলা যায়। বাচ্চাদের মার্বেল খেলা থেকে শুরু করে মহাকাশগামী রকেট দুটিই এই সূত্রটি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তোমরা ইতোমধ্যে পরমাণুর কত ক্ষুদ্র জেনেছ, আবার আলোর বেগ কত বেশি সেটিও জেনেছ, এই দুটি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ পরমাণুর আকারের সঙ্গে তুলনীয় মাত্রার অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য কিংবা আলোর বেগের সঙ্গে তুলনীয় মাত্রার অতি বৃহৎ গতির ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র কার্যকর হয় না। প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় আপেক্ষিক তত্ত্বের, পরের একটি অধ্যায়ে তোমরা এই দুটি বিষয় সম্পর্কেই জানতে পারবে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেহেতু এর কাছাকাছি মাত্রাতেও যাই না, তাই এদের প্রয়োজনটুকুও আমরা আলাদাভাবে অনুভব করতে পারি না। আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগতের প্রায় সব কাজ-কর্মে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র একেবারে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যায়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি এরকম :

» নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র: কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপরে প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক, এবং বল যেদিকে কাজ করে, ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকেই হয়ে থাকে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে বল এবং ভরবেগ পরিবর্তনের হারের মাঝে সমানুপাতিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। মনে করো, m ভরের একটি বস্তু u বেগে চলছিল, বাইরে থেকে এর উপরে t সময় ধরে F পরিমাণ বল প্রয়োগ করায়, বেগ বদলে হলো v। অর্থাৎ, বল প্রয়োগের শুরুতে ভরবেগ ছিল mu এবং বল প্রয়োগের শেষে ভরবেগ হলো mv, সেক্ষেত্রে ভরবেগের পরিবর্তন হবে এদের পার্থক্য,

অর্থাৎ, ভরবেগের পরিবর্তন = $mv - mu$

তাহলে, ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $(mv - mu)/t$

যেহেতু ভরের কোনো পরিবর্তন হয়নি তাই ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $m(v - u)/t$

কিন্তু আমরা জানি ত্বরণ $a = (v - u)/t$

কাজেই ভরবেগ পরিবর্তনের হার = ma

নিউটনের সূত্র অনুযায়ী ভরবেগ পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক, অর্থাৎ

$ma \propto F$ অথবা $F \propto ma$

আমরা এটিকে সমানুপাতিক সম্পর্ক হিসেবে না লিখে যদি একটি সমীকরণ আকারে লিখতে চাই, তাহলে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবকের দরকার হবে। অর্থাৎ আমরা লিখব এভাবে,

$$F = kma$$

যেখানে k হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক। যেহেতু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে সমানুপাতিক ধ্রুবকের মান কত সেটি নিয়ে কিছু বলা নেই তাই সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করে নিতে হবে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভরের (m) বস্তুর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বল (F) প্রয়োগ করে দেখতে হবে কতটুকু ত্বরণ (a) হয়েছে তাহলে সমানুপাতিক ধ্রুবকের (k) মান বের হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে একটা অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। 'নির্দিষ্ট পরিমাণ বল' বলতে কী বোঝানো হবে সেটি কোথাও বলা নেই কারণ বল ব্যাপারটিকে তখন পর্যন্ত পরিমাপ করার পদ্ধতি ঠিক করা হয়নি! কাজেই বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি দিয়েই বল পরিমাপ করা হবে! অর্থাৎ ঠিক করা হলো, যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলে একক ভরের একক ত্বরণ হয় সেটিই হচ্ছে একক বল। অর্থাৎ, $m = 1$ এবং $a = 1$ হলে $F = 1$ হবে। তাহলে আর আলাদা করে k-এর মান বের করতে হয় না, কারণ তখন k -এর মান হয়ে যায় 1! এইভাবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি খুব চমৎকার সহজ একটি রূপ নিয়ে নেয় :

$$F = ma$$

নিউটনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলের এককের নাম দেওয়া হয়েছে Newton (সংক্ষেপে N) অর্থাৎ 1 kg ভরের একটি বস্তুকে 1 ms^{-2} ত্বরণে গতিশীল করতে যতটুকু বল প্রয়োজন হয়, সেটিই ঠিক 1 N পরিমাণ। বল যেহেতু ভরবেগের পরিবর্তনের হার, এবং ভরবেগের যেহেতু সুনির্দিষ্ট দিক আছে তাই বলেরও সুনির্দিষ্ট দিক আছে।

উদাহরণ : আগের অনুচ্ছেদের উদাহরণে প্রতিটি বস্তুর উপরে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে?

সমাধান : যেহেতু, বল = ভরবেগ পরিবর্তনের হার

সাইকেলের উপরে প্রযুক্ত বল = 1.25 N

গাড়ির উপরে প্রযুক্ত বল = 33.33 N

হাতে ছোঁড়া পাথরের উপরে প্রযুক্ত বল = 8.33×10^{-5} N

গুলতিতে ছোঁড়া পাথরের উপরে প্রযুক্ত বল = 8.33×10^{-3} N

উদাহরণ : 50 ms-1 বেগে চলমান 750 kg ভরের একটি গাড়ির বেগ 10 s সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে 70 ms-1 হলো, গাড়ির ইঞ্জিন কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছে?

সমাধান : এখানে, গাড়িটির ত্বরণ $a = (v - u)/t = (70 - 50)/2 = 10\ ms^{-2}$

গাড়িটির ভর $m = 750$ kg

অর্থাৎ, ইঞ্জিনের প্রযুক্ত বল $F = ma = 750 \times 10 = 7500$ N

১.৩ মৌলিক বলের ধারণা

তোমাদের ধারণা হতে পারে পৃথিবীতে অনেক ধরনের বল রয়েছে। একটি রেল-ইঞ্জিন যখন যাত্রীবোঝাই রেলগাড়ি টেনে নিয়ে যায় সেটি একটা বল, ঝড়ে যখন ঘরবাড়ি উড়ে যায় সেটি একটা বল, চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ একটি বল, ক্রিকেটারেরা যখন ছক্কা মারেন তখন ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট বলে যেটা প্রয়োগ করেন সেটি একটি বল, ক্রেন যখন কোনো ভারী মালামাল টেনে তুলে সেটিও একটি বল—তুমি আসলে বলে শেষ করতে পারবে না। তোমার চারপাশে এত বিভিন্ন রূপের বল দেখা গেলেও বিজ্ঞানের চমকপ্রদ ব্যাপারটি হলো, প্রকৃতিতে আসলে মাত্র চার রকমের বল রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : মহাকর্ষ বল, তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও সবল নিউক্লিয় বল। আশপাশের বলগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে ঘুরে-ফিরে এই চার রকমের বাইরে কোনোটা নয়। এদের

বলা হয় মৌলিক বল। তার মাঝে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা শুধু মহাকর্ষ বল আর বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল অনুভব করি, অন্য দুটি প্রকৃতিতে থাকলেও সহজে আমাদের চোখে পড়ে না।

চার ধরনের বল

এই সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতরে নক্ষত্রেরা ঘুরপাক খায় কিংবা সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘোরে! পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমাদের ওপর কাজ করে আমরা সেটাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ।

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে সেটা দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করা বা চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো করেছি। যদিও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বলকে আলাদা ধরনের বল মনে হয় আসলে দুটি একই বল। এর নাম তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল।

তৃতীয় মৌলিক বলের নাম দুর্বল নিউক্লিয় বল। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সঙ্গে যে নিউট্রন থাকে সেগুলো নিউক্লিয়াসের ভেতরে স্থিতিশীল, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় থাকলে দশ মিনিটের মাঝে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনে বিভাজিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটি বেটা (β) তেজস্ক্রিয়তা নামে পরিচিত এবং এটি ঘটে দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের কারণে।

সব শেষের মৌলিক বলের নাম সবল নিউক্লিয় বল। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার ভেতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজেদের মাঝে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদের আটকে রাখে। এই বলের কারণে নিউক্লিয়াসের ভেতরে সঞ্চিত বিশাল শক্তি মুক্ত করে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

মৌলিক বলসমূহে মানের তারতম্য

এই চারটি মৌলিক বলের তুলনা করতে গেলে দেখা যায়, এদের মানের বেশ তারতম্য রয়েছে। যেমন- পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম মৌলিক বলটি হচ্ছে মহাকর্ষ বল, যা দৈনন্দিন জীবনে আমরা সারাক্ষণ অনুভব করে থাকি। ভর আছে সেরকম যে কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। এটি খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার যে, বাকি বলগুলোর তুলনায় এই বলটি সবচেয়ে দুর্বল।

তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই করতে পারে, অন্যগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এই বল 10^{36} গুণ বেশি শক্তিশালী। কথাটি যে সত্যি সেটা খুব সহজেই যাচাই করে দেখা যায়। একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে

এক টুকরো কাগজকে সহজেই আকর্ষণ করে তুলে নেওয়া যায়। তখন সেই টুকরো কাগজটিকে পৃথিবী তার সমস্ত মহাকর্ষ বল দিয়ে টেনে রাখার চেষ্টা করে, তবু চিরুনির অল্প একটু বিদ্যুৎ সেই বিশাল পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দেয়।

দুর্বল নিউক্লিয় বলকে দুর্বল বলা হয় কারণ এটা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকে প্রায় একশ বিলিয়ন গুণ (10^{-11}) দুর্বল তারপরেও মহাকর্ষ বল থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল হলো সবল নিউক্লিয় বল, যা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকেও প্রায় একশ গুণ বেশি শক্তিশালী। এই বলের কারণেই তড়িত-চৌম্বক বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে খুব কাছাকাছি থাকতে পারে।

মৌলিক বলসমূহে পাল্লার তারতম্য

আগের অনুচ্ছেদে চারটি মৌলিক বলের মানের পার্থক্য জানার পরে তোমাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জেগেছে, সবল নিউক্লিয় বল যেহেতু এতটাই শক্তিশালী, তাহলে অন্যান্য দুর্বল বলগুলো টিকে আছে কেমন করে? এই প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক, কিন্তু এতক্ষণ মৌলিক বলগুলোর মানের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু সেই বল কত দূরত্বে কার্যকর থাকে সেটি বলা হয়নি। কোনো বল যতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে ঐ বলের পাল্লা (range) বলে।

মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যে কোনো দূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে, তাই এদের পাল্লা হলো অসীম। অনেক দূরত্বে গেলে এই বলের প্রভাব খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু কখনোই শূন্য হয় না। এজন্যই অত্যন্ত দুর্বল মান সত্ত্বেও মহাকর্ষ বলের প্রভাবেই কিন্তু সৌরজগৎ থেকে শুরু করে বিশালাকারের গ্যালাক্সিগুলো টিকে আছে।

অন্যদিকে, নিউক্লিয় বলগুলো খুবই অল্প দূরত্বে কাজ করে। যেমন- সবল নিউক্লিয় বল কাজ করে 10^{-15} m দূরত্বে আর দুর্বল নিউক্লিয় বল কাজ করে আরও এক হাজার গুণ কম 10^{-18} m দূরত্বে। নিউক্লিয় বলের পাল্লা বেশি হলে মহাকর্ষের আকর্ষণ বল কিংবা তড়িৎ-চৌম্বক বলের চেয়েও সবল এই বলের প্রভাবে গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু কিছুই গঠিত হতে পারত না, তার অর্থ এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বই থাকত না।

চিন্তার খোরাক:

» মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যেকোনো দূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে, কিন্তু তড়িৎ চৌম্বক বল মহাকর্ষ বল থেকে গুণ 10^{36} বেশি শক্তিশালী হওয়ার পরেও মহাজাগতিক দূরত্বে মহাকর্ষ বলকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে দেখি কেন?

১.৪ নিউটনের তৃতীয় সূত্র

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বস্তুর উপরে কোনো বল প্রয়োগ করা না হলে কী ঘটে সেটি আমরা জেনেছি। আর বস্তুতে বল প্রয়োগ করা হলে কী ঘটে সেটি জেনেছি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে। একটি বস্তু যখন অন্য আরেকটি বস্তুর ওপরে বল প্রয়োগ করে, তখন বস্তু দুইটির মাঝে কী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, সেটি আমরা জানব নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে। আমাদের হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর পেছনে আছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র, জেটবিমানের ইঞ্জিন কিংবা মহাশূন্যগামী রকেটের ইঞ্জিনেও (চিত্র ১.৪) ব্যবহৃত হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র।

চিত্র ১.৪ : মহাকাশগামী রকেট

নিউটনের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করার সময় আমরা বল প্রয়োগ করার কথা বলেছি, কিন্তু কে কিংবা কী বল প্রয়োগ করছে সেটি বলিনি। বাস্তব জীবনে সব সময়েই কোনো না কোনো বস্তুর মাধ্যমে অন্য বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করা হয়। যখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন বস্তু দুটির মাঝে কী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে নিউটনের তৃতীয় সূত্র আমাদের সেটি জানিয়ে দেয়।

অনেকভাবে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি লেখা হয়ে থাকে কিন্তু বোঝার জন্য সহজ এবং স্পষ্টভাবে লেখা যেতে পারে এভাবে :

» নিউটনের তৃতীয় সূত্র : যখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন সেই বস্তুটিও প্রথম বস্তুর উপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করে।

প্রয়োগ করা বলটিকে অনেক সময় ক্রিয়া (action) এবং বিপরীত দিকে ফিরে পাওয়া বলটিকে প্রতিক্রিয়া (reaction) বলা হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বল কখনো আলাদা একা থাকে না, এটি সব সময়েই জোড়া হিসেবে আসে—অর্থাৎ ক্রিয়া থাকলে অবশ্যই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে। আলাদাভাবে শুধু ক্রিয়া কিংবা শুধু প্রতিক্রিয়া কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র শেখার সময় একটি বিষয় নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি হয় যে, দুইটি বল যদি একটি অন্যটির সমান এবং বিপরীত দিকে হয়ে থাকে তাহলে কেন একটি অন্যটিকে বাতিল করে

দেয় না? এজন্য তৃতীয় সূত্রটি শেখার আগে খুব স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে, যদি দুটি আলাদা বস্তু A এবং B থাকে এবং A যখন B বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তখন B বল প্রয়োগ করে A বস্তুটির উপরে। অর্থাৎ দুটি বল সমান এবং বিপরীত কিন্তু তারা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে, কখনোই এক বস্তুতে নয়। যদি একই বস্তুতে দুটি বল প্রয়োগ করা হতো শুধু তাহলেই একে অপরকে বাতিল করে দিতে পারত, এখানে তার কোনো সুযোগ নেই। এই আলাদা দুটি বস্তুতে প্রযুক্ত বল দুটির একটি ক্রিয়া, অন্যটি প্রতিক্রিয়া (চিত্র ১.৫)। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

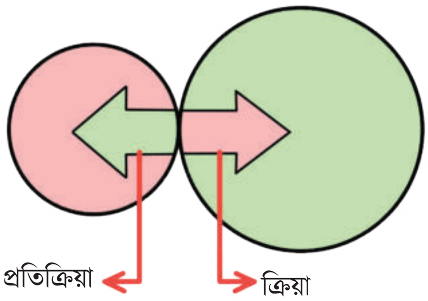

চিত্র ১.৫ : ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

চিত্র ১.৬ : টেবিলকে ধাক্কা দিলে টেবিলও পালটা ধাক্কা দেয়

তুমি যদি কোনো ভারী টেবিলকে ধাক্কা দাও তাহলে টের পাবে টেবিলটাও তোমাকে পাল্টা ধাক্কা দিচ্ছে (চিত্র ১.৬)। দেখতেই পাচ্ছ এখানে বস্তু দুইটি, একটি তুমি নিজে, আর অন্যটি হলো টেবিল। তুমি একটি বল (বা ক্রিয়া) প্রয়োগ করেছ টেবিলের উপরে, সে কারণে টেবিলটিও একটি বল (বা প্রতিক্রিয়া) দিয়েছে তোমার উপরে। এই হলো ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। তোমার যদি শূন্যে একটা ঘুসি মারতে হয়, তুমি সম্ভবত আপত্তি করবে না, কারণ বাতাসের উপর আর কতটুকুই-বা বল প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে যদি কঠিন একটি কংক্রিটের দেওয়ালে সজোরে ঘুসি মারতে বলা হয়, তুমি নিশ্চয়ই রাজি হবে না, কারণ কংক্রিটের প্রতিক্রিয়ায় তুমি যথেষ্ট ব্যথা পাবে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একজন কীভাবে হাঁটে সেটি বোঝা। স্থির অবস্থা থেকে একজন হাঁটতে পারে, তার অর্থ হাঁটার সময় একটি ত্বরণ হয়, যার অর্থ হাঁটার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ যখন হাঁটে তখন কেউ তাদের উপর বল প্রয়োগ করে না, তাহলে বলটি আসে কোথা থেকে? ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ধারণা না থাকলে আমরা কখনোই হাঁটার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। কেউ যখন হাঁটে (চিত্র ১.৭) তখন সে পা দিয়ে মাটিতে বল প্রয়োগ করে (অর্থাৎ, ক্রিয়া করে) তখন মাটিও তার শরীরে পাল্টা বল প্রয়োগ করে (অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া করে)। এই প্রতিক্রিয়ার কারণেই একজন হাঁটতে পারে। সেজন্য খুবই পিচ্ছিল জায়গায় হাঁটা যায় না। পিচ্ছিল জায়গায় মেঝেতে পা দিয়ে পিছন দিকে বল প্রয়োগ করা যায়

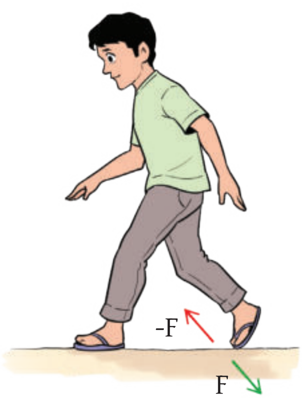

চিত্র ১.৭ : হাঁটার সময়ও কাজ করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

না, পা পিছলে যায়। সে কারণে ক্রিয়া নামের বলটি প্রয়োগ করা যায় না বলে হাঁটার জন্য প্রতিক্রিয়ার বলটি পাওয়া যায় না।

প্লেনের জেট ইঞ্জিনে কিংবা রকেটেও একই ব্যাপার ঘটে। ইঞ্জিন থেকে উত্তপ্ত গ্যাস পিছন দিকে প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসে, তার প্রতিক্রিয়ায় প্লেন কিংবা রকেট সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উদাহরণ : একটি চেয়ার সর্বোচ্চ 525 N প্রতিক্রিয়া বল দিতে পারে। তোমার ভর 50 Kg এবং তোমার বন্ধুর ভর 55 Kg হলে, তোমরা কি এই চেয়ারে উঠে দাঁড়াতে পারবে?

সমাধান : তোমার ওজন = 50 × 9.8 = 490 N

তোমার বন্ধুর ওজন = 55 × 9.8 = 539 N

এখানে, চেয়ারের উপরে উঠে দাঁড়ালে ওজনই ক্রিয়া হিসেবে কাজ করবে।

অর্থাৎ, চেয়ারকেও ঠিক ওজনের সমান বল প্রতিক্রিয়া হিসেবে দিতে হবে।

এখন 490 N < 525 N, অর্থাৎ তুমি চেয়ারে উঠে দাঁড়াতে পারবে।

আবার 539 N > 525 N, অর্থাৎ তোমার বন্ধু চেয়ারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না, চেয়ার ভেঙে যাবে।

১.৫ মহাকর্ষ বল

নিউটনের গতি সূত্রগুলো থেকে আমরা বল সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। আমরা চার রকমের মৌলিক বল নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু সেগুলোর কোনোটির সঙ্গে এখনও পরিচিত হইনি। নিউটন তার মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে প্রথম গাণিতিকভাবে আমাদের এই চারটি মৌলিক বলের একটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবারে একটি নির্দিষ্ট বলের উদাহরণ হিসেবে আমরা সেই মহাকর্ষ বল নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

১.৫.১ তথ্য থেকে সূত্র

পৃথিবীর অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা অনেকে আগে থেকেই রাতের পর রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি বোঝার চেষ্টা করেছে। যারা বুদ্ধিমান তাঁরা এই পর্যবেক্ষণ থেকে গ্রহ

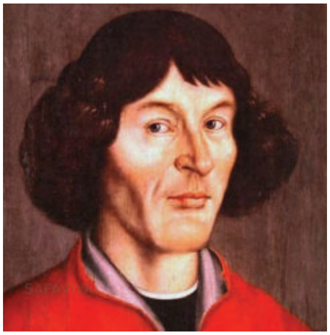

নিকোলাস কোপার্নিকাস
১৪৭৩-১৫৪৩

টাইকো ব্রাহে
১৫৪৬-১৬০১

জোহানেস কেপলার
১৫৭১-১৬৩০

নক্ষত্রের গতিবিধির মাঝে মিল খুঁজে পেয়েছে, অনেকে ঋতু পরিবর্তন কিংবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার সম্ভাব্য সময়ের সঙ্গে এই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে। ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়, কাজে লাগাতে চাইলে কিংবা গাণিতিক সূত্রায়ন খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজন সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

টাইকো ব্রাহে ছিলেন ডেনিস একজন জোতির্বিজ্ঞানী (চিত্র ১.৮), তথ্যের জন্য তিনি রাতের পর রাত আকাশ পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন সময়ে একটি খাতায় গ্রহদের অবস্থান লিখে রেখেছিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস ততদিনে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা বলেছেন, টাইকো ব্রাহে সেটি অন্য গ্রহের জন্য সত্যি হিসেবে মেনে নিলেও পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য সেটি বিশ্বাস করতেন না! টাইকো ব্রাহে বিপুল পরিমাণ নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো বিশ্লেষণের সুযোগ পাননি। তাঁর মৃত্যুর পরে এই খাতা হাতে আসে তার সহকারী জোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের কাছে। কেপলার এই বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করেন এবং সঠিক সূর্যকেন্দ্রিক হিসেবে সবকটি গ্রহের গতির জন্য তিনটি গাণিতিক সূত্র নির্ণয় করেন। এভাবেই পর্যবেক্ষণ ও গাণিতিক সূত্রায়নের মাধ্যমে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রও যে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন, এই সত্য মানুষ জেনে যায়।

কেপলারের সূত্র থেকে জানা যায়, সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঠিক কীভাবে ঘুরছে। সমসাময়িক আরেক বিজ্ঞানী গ্যালিলিও রীতিমতো

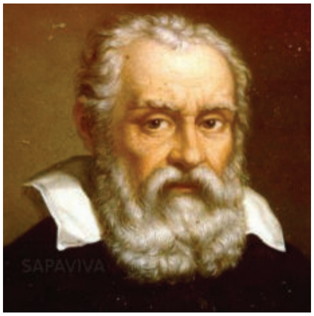

গ্যালিলিও গ্যালিলেই
১৫৬৪-১৬৪২

আইজ্যাক নিউটন
১৫৪২-১৭২৭

চিত্র ১.৮ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী

পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণে সব বস্তু 'একই সঙ্গে' মাটিতে পড়ে, তাদের বেগ বৃদ্ধির হারটি সমান, অর্থাৎ এর পেছনে একটি বল থাকা প্রয়োজন। এই দুইটি আপাত আলাদা ঘটনাকে বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন মহাকর্ষ বলের চমকপ্রদ ধারণা দিয়ে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন (চিত্র ১.৯)। যে বল গাছের আপেল থেকে শুরু করে সূর্যকে ঘিরে গ্রহের ঘূর্ণন দুটিই ব্যাখ্যা করতে পারে। নিউটন শুধু মহাকর্ষ বলের ধারণা দিয়েই থেমে যাননি, তার সূত্রে সেটি পরিমাপের উপায়ও বলে দিয়েছেন।

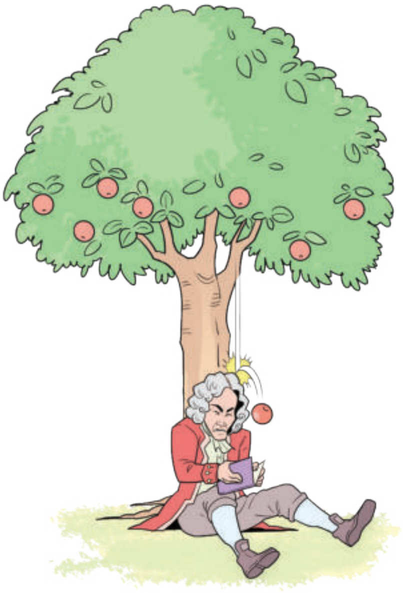

চিত্র ১.৯ : কথিত আছে আপেল গাছের নিচে বসে একটি আপেলকে পড়তে দেখে নিউটন মহাকর্ষ বলের ব্যাখ্যা খুঁজে বের করেন।

১.৫.২ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র : সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্রটি এরকম :

» নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র : মহাবিশ্বের প্রতিটি ভরযুক্ত বস্তু একে অপরকে কেন্দ্রের সংযোজক রেখা বরাবর আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুর ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু R দূরত্বে অবস্থিত, তাদের পরস্পরের মাঝে যে বলের সৃষ্টি হবে তার পরিমাণ যদি F হয় তাহলে গাণিতিকভাবে,

$$F = G\frac{m_1 \ m_2}{R^2}$$

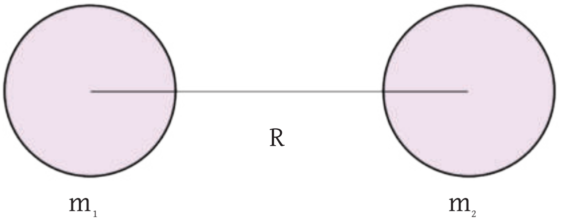

চিত্র ১.৯ : দুটি ভরের ভেতর মাধ্যাকর্ষণ বল

এখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, যার মান : $6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$। মনে রাখতে হবে, এখানে, m_1 ভরটি m_2 ভরকে নিজের দিকে F বলে আকর্ষণ করে আবার m_2 ভরটি m_1 কে নিজের দিকে একই বলে আকর্ষণ করে (চিত্র ১.৯)।

উদাহরণ: পৃথিবীর পৃষ্ঠে রাখা 1 kg ভরের একটি বস্তু পৃথিবীকে কত বলে আকর্ষণ করবে? (পৃথিবীর ভর 6×10^{24} kg ও ব্যাসার্ধ 6.4×10^6 m)

সমাধান : নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে, $F = G\dfrac{Mm}{d^2} = \dfrac{6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24} \times 1}{(6.4 \times 10^6)^2} = 9.8\ N$

পৃথিবীও কিন্তু ঠিক এই পরিমাণ বলেই বস্তুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে।

১.৫.৩ ওজনের ধারণা

মহাকর্ষ বলের বেলায় দুটো ভরের একটা যদি পৃথিবী হয় এবং যদি ধরে নিই তার ভর M এবং পৃথিবীর উপরে m ভরের অন্য একটা জিনিস রাখা হয় তাহলে পৃথিবী m ভরকে তার কেন্দ্রের দিকে F বলে আকর্ষণ করবে।

$$F= GMm/R^2$$

আসলে, এই বলটিই হলো বস্তুটির ওজন। মনে রাখতে হবে ওজন ভর নয়, ওজন হচ্ছে বল। এখানে R পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব নয়, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে m ভরটি পর্যন্ত দূরত্ব। যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বিশাল (প্রায় 6000 km) তাই আপাতত পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছোটোখাটো উচ্চতাকে ধর্তব্যের মাঝে আনার প্রয়োজন নেই। (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব মাপা হয় কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিন্দুই m ভরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং সবকটি আকর্ষণ একত্র করা হলে গাণিতিকভাবে দেখানো সম্ভব যে পৃথিবীর সমস্ত ভর যেন পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে জমা হয়ে আছে।) এখানে উল্লেখ্য যে পৃথিবীর জন্য মহাকর্ষ বলকে মাধ্যাকর্ষণ বল বলা হয়।

পৃথিবী পৃষ্ঠে m ভরের একটি বস্তু রাখা হলে সেটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যে মাধ্যাকর্ষণ বল অনুভব করবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এই বলটি বস্তুটির উপরে একটি ত্বরণ সৃষ্টি করবে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে ত্বরণ হয় সেটাকে a না লিখে g লেখা হয়, কাজেই F = ma এর পরিবর্তে লিখতে পারি :

$$F = mg$$

কিংবা, $mg = GMm/R^2$

অর্থাৎ, $g = GM/R^2$

আমরা যদি পৃথিবীর ভর 6×10^{24} kg, ব্যাসার্ধ 6.4×10^6 m এবং G -এর মান $6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$ ব্যবহার করি তাহলে,

$$g = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{(6.4 \times 10^6)^2} = 9.8\ ms^{-2}$$

ইতোপূর্বে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের জন্য এই মানটি ব্যবহার করা হয়েছিল, এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এই মানটি কেমন করে এসেছে।

উদাহরণ : তুমি দোকান থেকে 102 মিলিলিটার পানির বোতল কিনেছ, পানিটুকুর ওজন কত?

সমাধান : যেহেতু পানির ঘনত্ব 1gm/ml, কাজেই 102 ml পানি মানে আসলে
102 gm পানি = 0.102 kg পানি

কাজেই পানিটুকুর ওজন = $0.102 \times 9.8 = 1$ N

অর্থাৎ, 1 নিউটন বল বোঝাতে আমরা প্রায় 102 মিলিলিটার বা প্রায় 0.1 কেজি পানির ওজনকে বুঝিয়ে থাকি।

১.৬ চাপ (Pressure)

বলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাশি হচ্ছে চাপ। এই অধ্যায়ে নানা ধরনের বল প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বলটি ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেটি বলা হয়নি। যেমন- তুমি একটা পাথরকে এক হাতে ঠেলতে পারো, দুই হাতে ঠেলতে পারো কিংবা তোমার সারা শরীর দিয়ে ঠেলতে পারো (চিত্র ১.১০)। প্রত্যেকবার তুমি সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করলেও এই তিন ক্ষেত্রে পাথরের উপর প্রয়োগ করা চাপের পরিমাণ হবে ভিন্ন তার কারণ চাপ হচ্ছে একক ক্ষেত্রফলে প্রয়োগ করা বল। অর্থাৎ A ক্ষেত্রফলের একটি জায়গায় F বল প্রয়োগ করা হলে চাপ P হচ্ছে-

চিত্র ১.১০ : কতটুকু জায়গায় বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপরে চাপ নির্ভর করে।

$$P = \frac{F}{A}$$

চাপের একক $\frac{N}{m^2}$ অথবা Pa (প্যাসকেল)। অর্থাৎ $1m^2$ ক্ষেত্রফলের উপর 1N বল প্রয়োগ করা হলে 1 Pa (1 প্যাসকেল) চাপ প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ : ধরা যাক তোমার ভর 50kg, তোমার শরীরের এক পাশের ক্ষেত্রফল $0.5\ m^2$ এবং দুই পায়ের তলার ক্ষেত্রফল $0.03m^2$। তুমি চিত হয়ে শুয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে এবং দাঁড়িয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে?

সমাধান : ভর 50 kg কাজেই ওজন 50 × 9.8 N = 490 N

যখন শুয়ে থাকো তখন চাপ

$$P = \frac{490N}{0.5\ m^2} = 980\ \frac{N}{m^2}$$

যখন দাঁড়িয়ে থাকো তখন চাপ

$$P = \frac{490N}{0.3\ m^2} = 16{,}333\ \frac{N}{m^2}$$

অর্থাৎ শুয়ে পড়লে বেশি জায়গা জুড়ে বলটি ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অনেক কম চাপ দেওয়া হয়।

বেশি জায়গা জুড়ে বল প্রয়োগ করা হলে যেরকম কম চাপ প্রয়োগ করা হয়, একইভাবে কম জায়গায় একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলে অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করা যায়। একটি পেরেকের সুচালো মুখের ক্ষেত্রফল খুবই কম তাই এটি যখন কাঠ বা দেয়ালে স্পর্শ করিয়ে পেছনে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে বল প্রয়োগ করা হয় তখন পেরেকের সুচালো মাথা অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করে অনায়াসে কাঠ বা দেয়ালে ঢুকে যেতে পারে।

তোমরা জানো বলের একটি সুনির্দিষ্ট দিক আছে, চাপের কিন্তু কোনো দিক নেই। এটি জেনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চাপের ধারণাটি কঠিন পদার্থ থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থে। তরল বা বায়বীয় পদার্থ যখন চাপ প্রয়োগ করে তখন আসলে সেটি দিকের উপর নির্ভর করে না।

১.৬.১ তরলের ভেতরে চাপ (Pressure in Liquids)

তোমরা যারা পুকুর, নদী বা সুইমিংপুলের পানিতে নেমেছ তারা সবাই লক্ষ করেছ যে পানির গভীরে গেলে পানির এক ধরনের চাপ অনুভব করা যায়। পানি কিংবা অন্য কোনো তরলের গভীরে গেলে ঠিক কতটুকু চাপ অনুভব করা যাবে সেটি খুব সহজেই বের করা যায়। ধরা যাক তুমি তরলের h গভীরতায় চাপ নির্ণয় করতে চাইছ। সেখানে A ক্ষেত্রফলের একটি পৃষ্ঠ কল্পনা করে নাও (চিত্র ১.১১)। তার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু হবে সেখানকার তরলটুকুর ওজন এই A পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করবে।

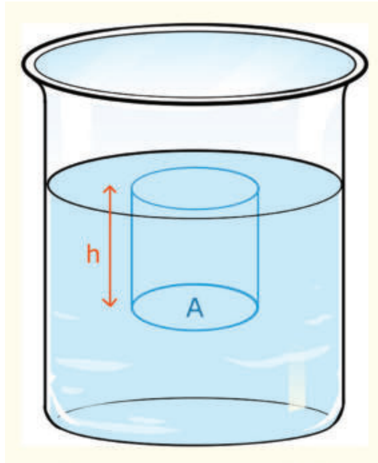

চিত্র ১.১১ : তরলের উচ্চতার জন্য নিচের পৃষ্ঠে চাপ সৃষ্টি হয়।

A পৃষ্ঠের উপরের তরলটুকুর আয়তন হচ্ছে Ah, তরলের ঘনত্ব যদি ρ হয় তাহলে এই তরলের ভর m হচ্ছে :

$$m=Ah\rho$$

কাজেই ওজন বা প্রযুক্ত বল

$$F = mg = (Ah\rho)g$$

কাজেই চাপ :

$$P = \frac{F}{A} = \frac{Ah\rho g}{A} = h\rho g$$

অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে চাপ বাড়তে থাকে। পানির বেলায় আনুমানিক প্রতি দশ মিটার গভীরতায় বাতাসের চাপের সমপরিমাণ চাপ বেড়ে যায়।

উদাহরণ : কেরোসিন (800 kg m^{-3}), পানি (ঘনত্ব 1000 kg m^{-3}) এবং পারদ (ঘনত্ব 13,600 kg m^{-3}) এই তিনটি তরলের জন্য 50 cm নিচে চাপ বের কত?

উত্তর : চাপ $P=h\rho g$

কেরোসিনের জন্য, $P = 0.50 \text{ m} \times 800 \text{ kg m}^{-3} \times 9.8 \text{ N kg}^{-1} = 3{,}920 \text{ N m}^{-2}$

পানির জন্য, $P = 0.50 \text{ m} \times 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 9.8 \text{ N kg}^{-1} = 4{,}900 \text{ N m}^{-2}$

পারদের জন্য, $P = 0.50 \text{ m} \times 13{,}600 \text{ kg m}^{-3} \times 9.8 \text{ N kg}^{-1} = 666{,}400 \text{ N m}^{-2}$

১.৬.২ আর্কিমিডিসের সূত্র এবং প্লবতা

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আর্কিমিডিসের সূত্র এবং সেই সূত্রের পেছনের গল্পটি শুনেছ। সূত্রটি সহজ, কোনো বস্তু তরলে নিমজ্জিত করলে সেটি যে পরিমাণ তরল অপসারণ করে সেইটুকু তরলের সমান ওজন বস্তুটির ওজন থেকে কমে যায়। আমরা এখন এই সূত্রটি বের করব। ১.১২ চিত্রে দেখানো হয়েছে খানিকটা তরল পদার্থে একটা সিলিন্ডার ডোবানো রয়েছে। (এটি সিলিন্ডার না হয়ে অন্য যে কোনো আকৃতির বস্তু হতে পারত, আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য সিলিন্ডার নিয়েছি।) ধরা যাক সিলিন্ডারের উচ্চতা h এবং উপরের ও নিচের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A। আমরা কল্পনা করে নিই সিলিন্ডারটি এমনভাবে তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যেন তার উপরের পৃষ্ঠটির গভীরতা h_1 এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা h_2.

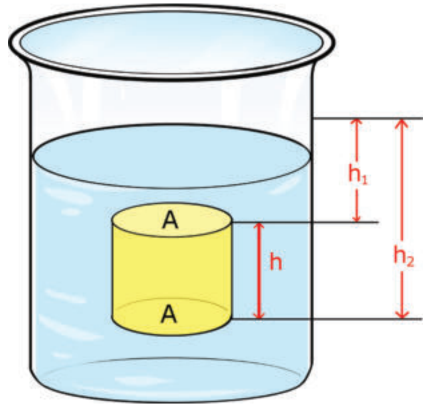

চিত্র ১.১২ : একটি বস্তু যতটুকু তরল অপসারিত করে তার সমপরিমাণ ওজন হারায়।

তরল (কিংবা বায়বীয়) পদার্থে চাপ কোনো নির্দিষ্ট দিকে কাজ করে না। এটি সব দিকে সমানভাবে কাজ করে। কাজেই সিলিন্ডারের উপরের পৃষ্ঠে নিচের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

$$P_1 = h_1 \rho g$$

এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

$$P_2 = h_2 \rho g$$

যেহেতু

$$P_1 = \frac{F_1}{A}$$

কাজেই উপর পৃষ্ঠে নিচের দিকে প্রয়োগ করা বল $F_1 = AP_1 = Ah_1\rho g$

একইভাবে

$$P_2 = \frac{F_2}{A}$$

কাজেই নিচের পৃষ্ঠে উপর দিকে প্রয়োগ করা বল $F_2 = AP_2 = Ah_2\rho g$

সিলিন্ডারের পাশের পৃষ্ঠের উপর কতটুকু বল প্রয়োগ হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ সিলিন্ডারটি একদিক থেকে যে বল অনুভব করে অন্যদিক থেকে ঠিক তার বিপরীত পরিমাণ

বল অনুভব করে এবং একে অন্যকে নিঃশেষ করে দেয়।

যেহেতু h_2 এর মান h_1 থেকে বেশি তাই দেখতে পাচ্ছি F_2 এর মান F_1 থেকে বেশি। কাজেই মোট বলটি হবে উপরের দিকে এবং তার পরিমাণ :

$$F = F_2 - F_1 = A(h_2 - h_1)\ \rho g$$

$$F = Ah\rho g$$

যেহেতু Ah হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন, g তরলের ঘনত্ব এবং g মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ, কাজেই উপরের দিকে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তনের সমান তরলের ওজন। ঠিক যেটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। ঊর্ধ্বমুখী এই বলটিকে প্লবতা (Buoyancy) বলে।

১.৬.৩ বস্তুর ভেসে থাকা বা ডুবে যাওয়া

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন একটা বস্তু ভেসে থাকে আবার অন্য একটা বস্তু ডুবে যায়। তোমরা জানো একটা বস্তু পানিতে ডোবানো হলে প্লবতার কারণে সেটা যতটুকু পানি সরিয়েছে উপরের দিকে সেই পানির ওজনের সমপরিমাণ বল অনুভব করে। সেই বলটি বস্তুটার ওজনের বেশি হলে বস্তুটা ভেসে থাকবে। ঠিক যে পরিমাণ ডুবে থাকলে বস্তুর সমান ওজনের পানি অপসারণ করবে ততটুকুই ডুববে, বাকি অংশটুকু পানিতে ডুবে যাবে না।

যদি বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজন থেকে বেশি হয় তাহলে সেটি পানিতে ডুবে যাবে। তবে পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় তার ওজন কিন্তু সত্যিকার ওজন থেকে কম মনে হবে।

যদি কোনোভাবে বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজনের ঠিক সমান করে ফেলা যায় তাহলে বস্তুটাকে পানির ভেতরে যেখানেই রাখা হবে সেটা সেখানেই থাকবে, উপরেও ভেসে উঠবে না, নিচেও ডুবে যাবে না। দৈনন্দিন জীবনে সে রকম কিছু চোখে না পড়লেও পানির নিচে দিয়ে চলাচল করার জন্য সাবমেরিনে নিয়মিতভাবে এটি করা হয়।

উদাহরণ : এক টুকরো কাঠ পানিতে ভাসিয়ে দিলে তার কত শতাংশ ডুবে থাকবে? (কাঠের ঘনত্ব $\rho = 0.5 \times 10^3\ kg/m^3$ পানির ঘনত্ব $\rho_W = 10^3\ kg/m_3$)

উত্তর : কাঠকে ভেসে থাকতে হলে তার ডুবন্ত অংশের সমপরিমাণ পানির ওজন কাঠের ওজনের সমান হতে হবে। অর্থাৎ যদি কাঠের আয়তন V হয় তার ওজন $V\rho g$, এবং যদি কাঠের V_1 অংশ পানিতে ডুবে থাকে তাহলে সেই পরিমাণ পানির ওজন $V_1\ \rho_W\ g$, কাজেই

$$V\rho g = V_1 \rho_W g \quad \text{কিংবা} \quad V\rho = V_1 \rho_W$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{\rho}{\rho_W} = \frac{0.5\times\ 10^3\ \text{kg/m}^3}{10^3\ \text{kg/m}^3} \times 100 = 50\%$$

১.৭ শক্তি (Energy)

আগের শ্রেণিতে ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন শক্তির উদাহরণ জেনেছি। আমরা এটাও জেনেছি যে কাজ করার ক্ষমতাই হচ্ছে শক্তি। তবে এখানে কাজ বলতে আমরা মোটেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কাজ করে থাকি সেগুলো বোঝাচ্ছি না, বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। এখানে আমরা কাজের সঙ্গে শক্তির কী সম্পর্ক সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

১.৭.১ গতিশক্তি ও বিভবশক্তি

যদি বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে বলের দিকে কিছুটা দূরত্ব সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় কাজ করা হয়েছে। যদি F বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে বলের দিকে s দূরত্ব সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কাজের পরিমাণ,

$$W = Fs$$

কাজের একক জুল (J), 1 নিউটন বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে 1 m সরিয়ে নিলে 1 J কাজ করা হয়।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি $F = ma$, কাজেই আমরা লিখতে পারি,

$$W = mas$$

আমরা গতির সমীকরণ থেকে জানি,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

যদি স্থির অবস্থা থেকে বস্তুটি শুরু করে থাকে তাহলে আদিবেগ $u = 0$,

$$\text{তাহলে} \quad v^2 = 2as$$

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

$$\text{এবং } as = \frac{v^2}{2}$$

কাজেই কাজের পরিমাণ হবে, $W = mas$

$$W = \frac{1}{2} mv^2$$

যেটি আসলে একটি বস্তুর গতিশক্তি। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর কাজ করা হলে সেই কাজটি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাস্তব জীবনে আমরা সব সময় সেটি দেখতে পাই না। কারণ ঘর্ষণ বল বিপরীত দিকে কাজ করে অনেক সময় শক্তিটুকুকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত না করে তাপ, শব্দ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে ফেলে।

কাজ করে যে শুধু গতিশক্তি তৈরি করা যায় তা নয়, কাজ করে সেই কাজকে বিভব শক্তি হিসেবেও সঞ্চয় করা যায়। তুমি একটি বস্তুকে যদি উপরে তুলতে চাও তাহলে বস্তুটিতে উপরের দিকে বস্তুটির ওজনের সমান বল প্রয়োগ করতে হবে। যদি m ভরের একটি বস্তুকে উপরের দিকে বস্তুর ওজনের সমান বল $F = mg$ প্রয়োগ করে h উচ্চতায় তোলা হয় তাহলে কাজের পরিমাণ হবে :

$$W = Fh$$

$$\text{কিংবা } W = mgh$$

বস্তুটি h উচ্চতায় তোলার পর সেটি সেখানে যেহেতু স্থির অবস্থায় থাকে তাই তার ভেতরে গতিশক্তি নেই, ঘর্ষণের কারণে তাপ কিংবা শব্দ হিসেবে অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি, কাজেই এই mgh পরিমাণ কাজ শক্তি নিশ্চয়ই আসলে বিভব শক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়ে গেছে। আমরা সেটা বুঝতে পারি যখন দেখি বস্তুটাকে h উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে সেটি নিচের দিকে পড়ার সময় গতিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং সঞ্চিত বিভব শক্তিটি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

১.৭.২ যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা

আগের শ্রেণিতে আমরা 'শক্তির নিত্যতা' বিষয়টি জেনেছিলাম। এই নীতি অনুসারে শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, কেবল এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন ঘটে। গতিশক্তি ও বিভবশক্তিকে একত্রে 'যান্ত্রিক শক্তি' নামে ডাকা হয়। যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে শক্তির পরিবর্তন না হলে, নিশ্চয় মোট যান্ত্রিক শক্তির পরিমাণ একই থাকবে। এই বিষয়টাকে আমরা 'যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা' বলতে পারি। আমরা একটি বস্তুকে কিছু দূরত্বে উপরে উঠিয়ে নিচে ফেলে দিলে সেটি গতিশীল হতে থাকবে। শুরুতে বস্তুটির কোনো গতি নেই, তাই পুরোটাই বিভবশক্তি। একটু পরে নিচে নামার ফলে উচ্চতা কমে গেলে বিভবশক্তি কমবে, অন্যদিকে গতি বাড়বে তাই গতিশক্তি বাড়তে থাকবে। এভাবে যখন একেবারে নিচে এসে পড়বে তখন দেখা যাবে পুরোটাই গতিশক্তি। অর্থাৎ, যেটুকু বিভবশক্তি খরচ হয়েছে, ঠিক সেটুকু গতিশক্তিই অর্জিত হয়েছে। এটিই হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা।

উদাহরণ: একটি বস্তুকে চিত্রের A বিন্দু থেকে ফেলে দেয়া হলো (চিত্র ১.১৩)। A, B এবং C বিন্দুতে বস্তুটির মোট শক্তি কত?

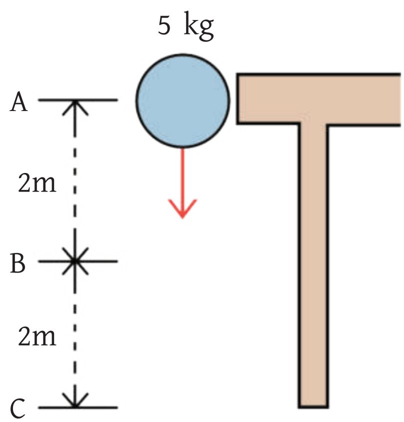

চিত্র ১.১৩ : 4m উচ্চতার একটি টেবিল থেকে 5 kg ভরের বস্তুকে ফেলে দেয়া হচ্ছে

সমাধান :

A বিন্দুতে,

বিভবশক্তি $mgh = 5 \times 9.8 \times 4 = 196$ J

গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 0^2 = 0$ J

মোটশক্তি $mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 196 + 0 = 196$ J

B বিন্দুতে,

বিভবশক্তি $mgh = 5 \times 9.8 \times 2 = 98$ J

যেহেতু গতিশক্তি হচ্ছে $\frac{1}{2}mv^2$ তাই আমাদের v^2 -এর মান বের করতে হবে।

আমরা সেটি $v^2 = u^2 + 2as$ সূত্রটি থেকে বের করতে পারি :

$v^2 = u^2 + 2as$

বা, $v^2 = 0^2 + 2 \times 9.8 \times 2$

বা, $v^2 = 39.2$ ms^{-1}

কাজেই গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 39.2 = 98$ J

মোটশক্তি $mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 98 + 98 = 196$ J

C বিন্দুতে বিভবশক্তি $mgh = 5 \times 9.8 \times 0 = 0$ J

এবারে $v^2 = u^2 + 2as$

বা, $v^2 = 0^2 + 2 \times 9.8 \times 4$, বা, $v^2 = 78.4$ ms^{-1}

কাজেই গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 78.4 = 196$ J

মোটশক্তি $mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 0 + 196 = 196$ J

অর্থাৎ, আমরা একটি নির্দিষ্ট উদাহরণে হিসাব করে দেখে ফেলেছি যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা আসলেই বজায় থাকে। একটি উচ্চতা থেকে কিছু ফেলে দেওয়া হলে উচ্চতার সঙ্গে বিভব শক্তি এবং গতি শক্তি কীভাবে পরিবর্তিত হয় কিন্তু মোট শক্তি যে পরিবর্তিত হয় না সেটি পাশের গ্রাফে দেখানো হয়েছে (চিত্র ১.১৪)।

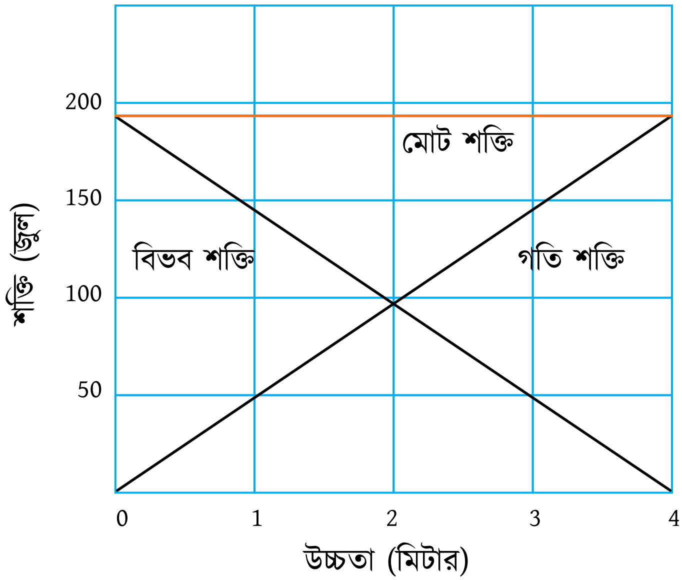

চিন্তার খোরাক

» উচ্চতার পরিবর্তে সময়ের বিপরীতে এই গ্রাফটি আঁকা হলে সেটি দেখতে কেমন হতো?

অধ্যায় ২

তাপমাত্রা ও তাপ

অধ্যায় ২ তাপমাত্রা ও তাপ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ তাপমাত্রা ও অভ্যন্তরীণ শক্তি
- ☑ তাপ প্রয়োগে কঠিন তরল ও গ্যাসের প্রসারণ
- ☑ তাপ প্রয়োগে অবস্থার পরিবর্তন
- ☑ ক্যালোরিমিতি
- ☑ তাপগতিবিদ্যা

তাপ

আমাদের চারপাশে আমরা নানা ধরনের শক্তি দেখি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শক্তি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি। তাপ ঠিক সেইরকম একটি শক্তি। আমাদের জীবনে আমরা সবাই এই শক্তির সঙ্গে পরিচিত এবং কোথাও না কোথাও সেটি ব্যবহার করেছি। আমরা তাপ প্রয়োগ করে রান্না করি, চা-কফি খাওয়ার জন্য তাপ দিয়ে পানি গরম করি, কাপড় ধুয়ে তাড়াতাড়ি শুকাতে চাইলে রোদে কাপড় দিই। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাড়তি তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করি, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিই, গরমের সময় কালো কাপড় না পরার চেষ্টা করি। এই তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা সম্ভব। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাপশক্তিটুকু কীভাবে এসেছে সেটি নিয়ে আমাদের সবার কৌতূহল রয়েছে। কিংবা অন্যভাবে বলতে পারি ঠিক কী কারণে তাপশক্তি গরম পানিতে আছে. কিন্তু ঠান্ডা পানিতে নেই সেটি আমাদের সবার জানা প্রয়োজন।

একসময় এই ব্যাপারটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এখন আমরা জানি, সব পদার্থ অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি, এবং এই অণু-পরমাণুগুলোর গতি বা কম্পনকে সামগ্রিকভাবে আমরা তাপ হিসেবে দেখি। অণু-পরমাণুগুলো যত বেশি ছোটাছুটি করবে, সেটি তত বেশি উত্তপ্ত বলে মনে হবে। এক গ্লাস ঠান্ডা পানির ভেতরকার পানির অণুগুলো স্থির হয়ে নেই, সেগুলোও ছোটাছুটি করছে। কিন্তু যখন তাপ দেওয়া হয় তখন সেই পানির ছোটাছুটি অনেক বেশি বেড়ে যায়। যদি বেশি তাপ দেওয়া হয়, তখন কোনো না কোনো পানির অণুর গতিবেগ এত বেড়ে যাওয়া সম্ভব যে, সেটি পানি থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে যেতে পারে। আমরা সেটাকে বাষ্পীভবন বলি।

তাপ সঞ্চালন

আমাদের নানা কাজে তাপশক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয় কিংবা সঞ্চালন করতে হয়। তিনটি উপায়ে তাপ সঞ্চালন করা হয়; সেগুলো হচ্ছে তাপের পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণ।

পরিবহণ (conduction): কঠিন পদার্থের বেলায় তাপ হচ্ছে অণুগুলোর কম্পন তাই যখন কঠিন পদার্থের এক প্রান্ত উওপ্ত করা হয়, তখন সেই প্রান্তের অণুগুলো নিজের জায়গা থেকেই কাঁপতে থাকে। একটা অণু কাঁপতে থাকলে সেটি তার পাশের অন্য অণুকেও কাঁপাতে শুরু করে। সেই অণুটি তখন তার পাশের অণুকে কাঁপায়। এভাবে কম্পনটি কঠিন পদার্থের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হয় যেটি তাপের পরিবহণ নামে পরিচিত।

পরিচলন (Convection) : তরল কিংবা গ্যাসকে উত্তপ্ত করা হলে তার ঘনত্ব কমে সেটি হালকা হয়ে যায়, কারণ তখন তাদের অণুগুলোকে বেশি বেগে ছোটাছুটি করতে হয় বলে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। একই পরিমাণ তরল বা গ্যাস একটু বেশি জায়গায় নিয়ে থাকলে তার ঘনত্ব কমে যায় বা সেটি হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়, তখন পাশের শীতল তরল বা গ্যাস সেখানে উপস্থিত হয়। এভাবে তরল বা গ্যাসের ভেতর একটা অভ্যন্তরীণ পরিচলন শুরু হয়, সেটি সকল পানিকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে পানিকে উত্তপ্ত করে।

বিকিরণ (Radiation) : আমরা যখন রোদে দাঁড়াই, তখন যে তাপ অনুভব করি, সেই তাপ পরিবহণ কিংবা পরিচলন পদ্ধতিতে সূর্য থেকে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি, এই তাপ যে পদ্ধতিতে পৌঁছায় তার নাম বিকিরণ। বিকিরণের জন্য কোনো মাধ্যমের দরকার হয় না, সেজন্য সূর্য আর পৃথিবীর ভেতরে মহাশূন্য থাকার পরেও দৃশ্যমান আলোর সঙ্গে অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে চলে আসতে পারে।

আপেক্ষিক তাপ

একটা বস্তুতে কী পরিমাণ তাপ সঞ্চিত আছে সেটি নির্ভর করে বস্তুটি তাপমাত্রা, তার ভর এবং তার আপেক্ষিক তাপের উপর। যেহেতু বাতাসের ভর খুবই কম তাই তার তাপ ধারণ করার ক্ষমতা খুবই কম। একটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কম হলে অল্প তাপ প্রদান করেও অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় নেওয়া যায়। অন্যদিকে একটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বেশি হলে একই তাপমাত্রায় নেওয়ার জন্য অনেক তাপ প্রদান করতে হয়।

তাপের প্রবাহ

দুটি বস্তুর তাপমাত্রা যদি ভিন্ন হয় এবং দুটিকে যদি একটির সংস্পর্শে অন্যটিকে আনা হয়, তাহলে যে

বস্তুর তাপমাত্রা বেশি, সেখান থেকে তাপ যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সেখানে প্রবাহিত হবে। সে কারণে তাপের প্রবাহের দিক দিয়ে অনেক সময় তাপমাত্রার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি তাপমাত্রা একই জায়গায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ তাপের প্রবাহ হতেই থাকবে।

একটি সুচকে আগুনে উত্তপ্ত করা হলে তার ভেতরে মোট তাপের পরিমাণ খুব বেশি হবে না। সেই তুলনায় একটা বালতি ভরা পানিতে তাপের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু গরম সুচটিকে যদি পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সুচটির তাপের পরিমাণ কম হলেও সেটি বালতির পানিতে তার তাপ প্রবাহিত করবে।

২.১ তাপমাত্রা ও অভ্যন্তরীণ শক্তি

তাপ শক্তিটি সঠিকভাবে জানার জন্য আমাদের তাপমাত্রা বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কারণ যে কোনো বস্তুর ভেতরে তাপের কারণে যে অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চিত থাকে তার সঙ্গে তাপমাত্রার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

২.১.১ তাপ শক্তি

তাপ আমাদের সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় শক্তির একটি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিয়মিত তাপ সৃষ্টি করি, তাপ ব্যবহার করি, আবার অনেক সময় বাড়তি তাপ অপসারণ করারও চেষ্টা করি। পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতায় তাপের সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছে। যানবাহনে জ্বালানি ব্যবহার করে তাপ সৃষ্টি করা হয় সেই তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে যানবাহন চালানো হয়। বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রে বেশিরভাগ সময়ে তাপশক্তি ব্যবহার করে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়। নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহার করার সময় সেটি তাপ শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের বেলাতেও সঠিক তাপশক্তির প্রাপ্যতা একটি বড়ো ভূমিকা রেখেছে। জীবিত প্রাণীরাও বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে সেটি প্রথমে তাপশক্তি হিসেবে রূপান্তর করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আবার মানুষ শক্তির অপব্যবহার করে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করে সারা পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন করে পৃথিবীর মানুষকে বিপদের ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে।

তাপ শক্তি যেহেতু একটি শক্তি, তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্য শক্তির মতো তাপশক্তির একক হচ্ছে জুল (J)। তাপের আরও একটি একক রয়েছে, সেটি হচ্ছে ক্যালরি (cal), 1 গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ প্রদান করতে হয় সেটিই ক্যালরি নামে পরিচিত। 1 ক্যালরি তাপের পরিমাণ 4.2J।

২.১.২ অণুর গতি ও তাপমাত্রা

আপাতদৃষ্টিতে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পুরোপুরি ভিন্ন এক ধরনের শক্তি মনে হলেও এই শক্তিটা এসেছে পদার্থের অণু-পরমাণুর সম্মিলিত গতিশক্তি কিংবা কম্পন শক্তি থেকে। কঠিন পদার্থের বেলায় তাপের অর্থ অণুগুলোর কম্পন। তরল পদার্থের বেলায় সেটি হচ্ছে অণুগুলো পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে গতিশীল থাকা। গ্যাসের বেলায় সেটি হচ্ছে অণুগুলোর একটি তুলনায় অন্যটির মুক্তভাবে ছোটাছুটি। তাপশক্তিকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায় সেটিও বুঝতে হবে। তাপ হচ্ছে শক্তির পরিমাণ এবং তাপমাত্রা হচ্ছে কোনোকিছু কতটুকু উত্তপ্ত কিংবা কতটুকু শীতল তার একটি পরিমাপ। কাজেই আণবিক দৃষ্টিতে তাপমাত্রাকে বলা যায় পদার্থের অণুগুলোর কম্পন কিংবা গতিশক্তি কত তার একটি পরিমাপ। অণুগুলোর গতি কিংবা কম্পন যত বেশি হবে, বস্তুটির তাপমাত্রা তত বেশি।

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K), তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি, সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস (^{0}C)। সেলসিয়াস এবং কেলভিনের স্কেল তুলনা করলে তোমরা দেখবে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সঙ্গে 273.15^0 যোগ করা ছাড়া কেলভিন স্কেলে আর কোনো পার্থক্য নেই। কেলভিন স্কেলটি তৈরি করা হয়েছে এই পরম শূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে -273.15^0 তাই সেলসিয়াস স্কেলের সঙ্গে 273.15 যোগ দিলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা স্কেল কোনো কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলে বরফের তাপমাত্রা 32^0F এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা 212^0F।

গাণিতিকভাবে এই তিনটি তাপমাত্রার সম্পর্ক এরকম :

$$\frac{T_C}{100} = \frac{T_K - 273.15}{100} = \frac{T_F}{180}$$

২.১.৩ অভ্যন্তরীণ শক্তির ধারণা

কঠিন, তরল এবং গ্যাসের কণার (পরমাণু বা অণু) গতিশক্তি থাকে কারণ সেগুলো গতিশীল। আণবিক বন্ধন কণাগুলোকে টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করে বলে তাদের বিভবশক্তিও রয়েছে। গ্যাসের কণাগুলো প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে বলে তাদের গতিশক্তি সবচেয়ে বেশি। একটি পদার্থের সমস্ত কণার মোট গতিশক্তি এবং বিভবশক্তিকে এর অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে। একটি বস্তুর তাপমাত্রা যত বেশি হয়, তার কণাগুলোও তত বেশি গতিশীল হয় বলে অভ্যন্তরীণ শক্তিও তত বেশি হয়।

সাধারণভাবে আমাদের মনে হতে পারে শক্তির প্রবাহ হয় বেশি শক্তি থেকে কম শক্তিতে।একটু আগে তোমাদের বলা হয়েছে একটি উত্তপ্ত আলপিনে যেটুকু তাপশক্তি আছে তার থেকে অনেক বেশি তাপ শক্তি রয়েছে এক বালতি পানিতে। আমরা যদি উত্তপ্ত আলপিনটা পানিতে ডুবিয়ে দেই তাহলে কিন্তু

আলপিনের অল্প তাপশক্তির খানিকটাই চলে যাবে বালতির পানিতে। তার কারণ তাপ শক্তির প্রবাহ তাপ শক্তির উপর নির্ভর করে না, এটি নির্ভর করে তাপমাত্রার পার্থক্যের উপর। যদি একটি উত্তপ্ত বস্তু একটি শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তবে উত্তপ্ত বস্তুটি অভ্যন্তরীণ শক্তি হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং, একইসঙ্গে শীতল বস্তুটি অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান না হচ্ছে ততক্ষণ তাপশক্তির প্রবাহ চলতে থাকবে। তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে বস্তুর মাঝে স্থানান্তরযোগ্য এই শক্তিই তাপ শক্তি হিসেবে পরিচিত।

একটি উত্তপ্ত বস্তুকে শীতল বস্তুর সংস্পর্শে রাখা হলে যখন উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে তাপশক্তি স্থানান্তরিত হতে থাকে তখন সেই বস্তুটির কণাগুলো গতিশক্তি হারাতে থাকে। আবার, শীতল বস্তু উত্তপ্ত হওয়ার সময় এটির কণাগুলো গতিশক্তি লাভ করে। যখন দুইটি বস্তু একই তাপমাত্রায় পৌঁছায়, তখন প্রতিটি কণার গড় গতিশক্তি সমান হয়ে যায় বলে শক্তির এই স্থানান্তর বন্ধ হয়ে যায়। তাপমাত্রা যত বেশি হবে কণাদের এই গড় গতিশক্তিও তত বেশি হবে।

২.২ তাপ প্রয়োগে পদার্থের প্রসারণ

আমরা যদি একটু ভালো করে রেল লাইনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে রেল লাইনের মাঝে সবসময় একটুখানি ফাঁক রাখা হয়। তার কারণ তাপের কারণে রেল লাইনে প্রসারণ হয় রেল লাইন আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে পারে (চিত্র ২.১)। ঠিক কতখানি ফাঁক রাখা হলে রেল লাইন ট্রেনের জন্য সব সময় নিরাপদ হবে এই জাতীয় বিষয়গুলো জানতে হলে জন্য তাপের সঙ্গে পদার্থের প্রসারণের সম্পর্কটি আমাদের বোঝা দরকার।

চিত্র ২.১ : উত্তপ্ত আবহাওয়ার কারণে রেল লাইনের আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়া

২.২.১ কঠিন পদার্থের প্রসারণ

তোমরা ইতোমধ্যে তাপ প্রয়োগে পদার্থের তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে অণুগুলোর কম্পন বা গতি হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জেনেছ। কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আণবিক বল দিয়ে আটকে রাখে। এই বলকে আমরা ২.২ ছবিতে দেখানো স্প্রিংয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তবে এই স্প্রিংটি হলো একটি বিশেষ ধরনের স্প্রিং, যা বেশি দূর প্রসারিত হয় কিন্তু কম দূর সংকুচিত হয়—একটি অণু অন্য অণুকে বেশি কাছে আসতে দেয় না বলে এরকমটি ঘটে। তাপ দেওয়া হলে অণুগুলোর কম্পন বেড়ে যায়,

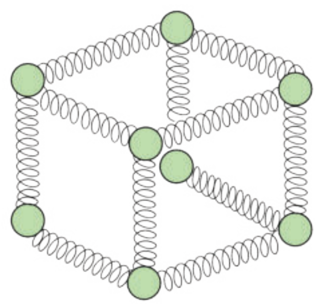

চিত্র ২.২ : পদার্থের অণুদের স্প্রিং মডেল

তখন প্রসারিত হওয়ার সময় এগুলো একটু বেশি দূরে যায় কিন্তু সংকুচিত হওয়ার বেলায় কম দূরত্ব আসে বলে কম্পনরত অণুগুলো বেশি জায়গা নেয় এবং মনে হয় পদার্থের আয়তন বেড়ে গেছে। তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিন দিকেই প্রসারিত হয়। তাই কঠিন পদার্থে প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন প্রসারণ সহগ নামে তিনটি রাশি ব্যবহৃত হয়, যেহেতু এগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই যে কোনো একটি পরিমাপ করলেই অন্য যে কোনো দুটি বের করে ফেলা যায়।

কোনো বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ ব্যবহার করতে হয়। একে গ্রিক অক্ষর α (উচ্চারণ আলফা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ α হচ্ছে প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রার জন্য একটা পদার্থের দৈর্ঘ্যের কত অংশ বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক T_1 তাপমাত্রায় একটি কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে L_1 এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করায় বস্তুটির দৈর্ঘ্য হয়েছে L_2

তাহলে দৈর্ঘ্যের মোট পরিবর্তন হয়েছে : $L_2 - L_1$

দৈর্ঘ্যের কত অংশ পরিবর্তন হয়েছে: $\dfrac{(L_2 - L_1)}{L_1}$

প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দৈর্ঘ্যের কত অংশ পরিবর্তন হয়েছে : $\dfrac{(L_2 - L_1)}{L_1(T_2 - T_1)}$

অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α হচ্ছে,

$$\alpha = \frac{(L_2 - L_1)}{L_1(T_2 - T_1)}$$

অর্থাৎ কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α জানা থাকলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য কত হবে আমরা এই সমীকরণ থেকে বের করতে পারব। T_1 তাপমাত্রায় একটি কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি হয় L_1 তাহলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করা হলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য হবে L_2

$$L_2 = L_1 + \alpha L_1 (T_2 - T_1)$$

উদাহরণ: 290 K তাপমাত্রায় থাকা একটি 10 m দৈর্ঘ্যের ধাতব তারকে রোদে ফেলে রাখায় এর তাপমাত্রা 325 K হলো। এখন তারের দৈর্ঘ্য কত হবে? (তারের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $23 \times 10^{-6}\ K^{-1}$)

সমাধান : পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য $L_2 = L_1 + \alpha L_1 (T_2 - T_1) = 10 + 23 \times 10^{-6} \times 10 \times (325 - 290) = 10.008$ m

কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল বরাবর প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ ব্যবহার করা হয়। এটিকে গ্রিক অক্ষর β (উচ্চারণ বেটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। T_1 তাপমাত্রা ও A_1 ক্ষেত্রফলের একটি

বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়ে T2 হওয়ায় যদি ক্ষেত্রফল পরিবর্তিত হয়ে A_2 হয় তবে

$$\beta = \frac{(A_2 - A_1)}{A_1 (T_2 - T_1)}$$

একইভাবে, কোনো বস্তুর আয়তনের প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য আয়তন প্রসারণ সহগ ব্যবহার করা হয়। আয়তন প্রসারণ সহগকে গ্রিক অক্ষর γ (উচ্চারণ গামা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। T_1 তাপমাত্রা ও V_1 আয়তনের একটি বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়ে T_2 হওয়ায় যদি আয়তন পরিবর্তিত হয়ে V_2 হয় তবে

$$\gamma = \frac{(V_2 - V_1)}{V_1 (T_2 - T_1)}$$

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α জানা থাকলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ β কিংবা আয়তন প্রসারণ সহগ γ আলাদাভাবে পরিমাপ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ :

$$\beta = 2\alpha$$

$$\gamma = 3\alpha$$

নিজে কর :

ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ বের করার জন্য কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল বর্গাকৃতি ধরে নিয়ে আমরা A_1 এবং A_2 -এর জন্য লিখতে পারি :

$$A_1 = L_1^2$$

$$A_2 = L_2^2 = \{L_1 + \alpha L_1 (T_2 - T_1)\}^2$$

যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α -এর মান খুবই ছোটো, কাজেই α^2 -এর মান আরও অনেক বেশি ছোটো, তাই α^2 কে শূন্য ধরে দেখাও $\beta = 2\alpha$।

নিজে কর:

একইভাবে আয়তন প্রসারণ সহগ বের করতে হলে তোমাদের কঠিন পদার্থের আয়তনের জন্য একটি কিউব ধরে নিয়ে আমরা V_1 এবং V_2 -এর জন্য লিখতে পারি :

$$V_1 = L_1^3$$

$$V_2 = L_2^3 = \{L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)\}^3$$

যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α -এর মান খুবই ছোটো, কাজেই α^2 এবং α^3 -এর মান আরও অনেক বেশি ছোটো, তাই α^2 এবং α^3 কে শূন্য ধরে দেখাও $\gamma = 3\alpha$।

উদাহরণ : 275 K তাপমাত্রায় থাকা একটি 5 cm বাহুর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বর্গাকার ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করায় এর তাপমাত্রা 350 K হলো। এখন পাতটির ক্ষেত্রফল কতটুকু বাড়বে? (পাতের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $\alpha = 22 \times 10^{-6}\ K^{-1}$)

সমাধান : যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $\alpha = 22 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

কাজেই ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ $\beta = 2\alpha = 2 \times 22 \times 10^{-6} = 44 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

এখানে, শুরুতে ক্ষেত্রফল $A_1 = 5 \times 5 = 25\ cm^2$

পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল $A_2 = A_1 + \beta A_1 (T_2 - T_1)$

অর্থাৎ, ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন $A_2 - A_1 = \beta A_1 (T_2 - T_1) = 44 \times 10^{-6} \times 25 \times (350 - 275) = 0.0033\ cm^2$

উদাহরণ : সোনার ঘনত্ব 19.30 gm/cc, এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $14 \times 10^{-6^0}\ C^{-1}$-এর তাপমাত্রা 100^0C বাড়ালে ঘনত্ব কত হবে?

সমাধান : ঘনত্ব, $\rho = \frac{m}{v}$

যেখানে V হচ্ছে আয়তন এবং m হচ্ছে ভর। তাপমাত্রা বাড়ালে ভর এক থাকলেও আয়তন বেড়ে যায়। কাজেই 100^0C তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তন V' হবে :

$$V' = V + \gamma V(T_2 - T_1) = V(1 + 3\alpha \times 100)$$

$$\alpha = 14 \times 10^{-6^0}\ C^{-1}$$

$$V' = V(1 + 4.2 \times 10^{-3})$$

$$\rho' = \frac{m}{V'} = \frac{m}{V(1 + 4.2 \times 10^{-3})} = \frac{m}{V} \times 0.9958 = 0.9958\rho$$

$$\rho' = 0.9958 \times 19.30\ gm/cc = 19.22\ gm/cc$$

একটি পদার্থের প্রসারণ সহগ জানা থাকলে পরিবর্তিত তাপমাত্রায় তার কতটুকু পরিবর্তন হবে সেটি হিসাব করা যায়। বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রসারণ সহগ জানা থাকাটা খুবই প্রয়োজনীয়। তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যেহেতু রেল লাইন তাপে প্রসারিত হয়, তাই আগেই হিসাব করে নিতে হয় এজন্য কতটুকু ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। তা না হলে রেল লাইন বেঁকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইঞ্জিন কিংবা এ ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করার সময়ও প্রসারণ সহগ জানা প্রয়োজন, কেননা এসব যন্ত্রে অনেক বেশি তাপমাত্রা ওঠানামা করে। আবার রকেট কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে তীব্র গতিতে যাওয়ার সময় উত্তপ্ত হয়। এখানেও প্রসারণ সহগ জানা থাকা প্রয়োজন। দাঁতের ফুটো মেরামত করতে ডেন্টিস্টরা যে পদার্থ ব্যবহার করেন, সেই পদার্থটির প্রসারণ সহগ হতে হয় দাঁতের প্রসারণ সহগের ঠিক সমান। তা না হলে ঠান্ডা কিছু খাওয়ার সময় এটি ছোটো হয়ে খুলে আসবে, অথবা গরম কিছু খাওয়ার সময় বেশি প্রসারিত হয়ে দাঁতের ওপরে চাপ ফেলবে।

২.২.২ তরল পদার্থের প্রসারণ

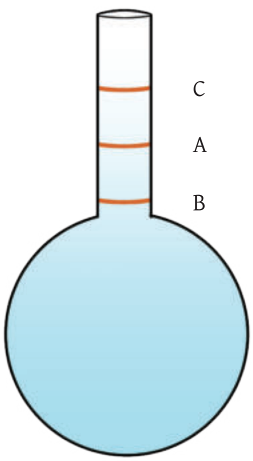

চিত্র ২.৩ : তরল পদার্থের আপাত ও প্রকৃত প্রসারণ

তরল পদার্থের দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফল বলে কিছু নেই, শুধু আয়তন আছে। তাই তরল পদার্থের প্রসারণ বলতে তার আয়তন প্রসারণ বোঝায়। তবে, তরল পদার্থের প্রসারণ মাপার সময় একটু সতর্ক থাকতে হয় কারণ তরল পদার্থকে সব সময়ই কোনো পাত্রে রাখতে হয়। কাজেই প্রসারণ মাপার জন্য তরলটিকে উত্তপ্ত করার সময় পাত্রটিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পাত্রটিরও কিছু প্রসারণ হয়। তাই পাত্রে রাখা তরলে যে প্রসারণ দেখা যায় সেটা আসল প্রসারণ না, সেটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ। পাত্রের প্রসারণটি বিবেচনায় রেখে তরলের প্রসারণ বের করা হলে সেটি হবে সত্যিকার প্রসারণ বা প্রকৃত প্রসারণ (চিত্র ২.৩)।

একটা সরু নলবিশিষ্ট কাচের পাত্রের A দাগ পর্যন্ত তরল দিয়ে ভরে যদি পাত্রটিকে গরম করা হয় তাহলে আমরা দেখব প্রথমে তরলের উচ্চতা B তে নেমে এসেছে। এটি ঘটবে কারণ তাপ দেওয়ার পর তরলটির তাপমাত্রা বাড়ার আগেই পাত্রটির তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং তার প্রসারণ হবে, অর্থাৎ পাত্রটির আয়তন একটুখানি বেড়ে যাবে। যদি আমরা তারপরও তাপ দিতে থাকি তাহলে এক সময় তরলটির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। যেহেতু তরলের প্রসারণ বেশি তাই আমরা দেখব তরলটি A কে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত C উচ্চতায় পৌঁছেছে। পাত্রের এই অংশের প্রস্থচ্ছেদকে CB উচ্চতা দিয়ে গুণ করে আমরা তরলটির প্রকৃত প্রসারণ পাব।

তরল পদার্থের প্রসারণের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে পারদ বা অ্যালকোহল থার্মোমিটার। নানা রকম থার্মোমিটার রয়েছে, তার মধ্যে জ্বর মাপার থার্মোমিটার সম্ভবত তোমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত। এই

থার্মোমিটারের গোড়ায় একটা কাচের টিউবে পারদ থাকে। তাপ দেওয়া হলে পারদের আয়তন বেড়ে গিয়ে খুব সরু একটা নল বেয়ে উঠতে থাকে (চিত্র ২.৪)। দাগকাটা থার্মোমিটারে পারদ কতটুকু উঠেছে সেটি দেখে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। দেহ থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর যেন পারদের অংশটুকু নেমে না যায় সেজন্য সরু নলের গোড়ায় খুব সরু বক্রতা রাখা হয়। এ কারণে একবার প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে গেলে তাপমাত্রা কমে যাবার পরও নেমে আসতে পারে না, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নামাতে হয়।

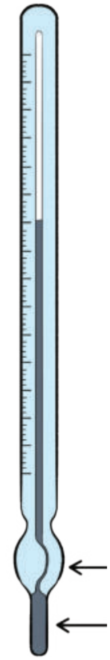

চিত্র ২.৪ : থার্মোমিটারে পারদের প্রসারণ

উদাহরণ : 280 K তাপমাত্রায় থাকা 4 L পানিকে উত্তপ্ত করে এর তাপমাত্রা 360 K করা হলো। এখন পানিটুকুর আয়তন 4.0672 L হলে, পানির আয়তন প্রসারণ সহগ কত?

সমাধান : আয়তন প্রসারণ সহগ

$\gamma = (V_2 - V_1)/\{V_1\ (T_2 - T_1)\}$

$= (4.0672 - 4)/\{4\ (360-280)\}$

$= 2.1 \times 10^{-4}\ K^{-1}$

২.২.৩ বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ

কঠিন পদার্থের আকার আর আয়তন দুটিই থাকায় প্রসারণ বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। তরলের নির্দিষ্ট আকার না থাকলেও তার আয়তন আছে, তাই তার প্রসারণও আমরা দেখতে পাই কিংবা মাপতে পারি। গ্যাসের বেলায় বিষয়টা একটু অন্যরকম কারণ তার শুধু যে নির্দিষ্ট আকার নেই তা নয়, তার নির্দিষ্ট আয়তনও নেই। গ্যাসকে যে পাত্রে ঢোকানো হবে গ্যাসটি সঙ্গে সঙ্গে সেই পাত্রের আয়তন নিয়ে নেবে। কঠিন ও তরল পদার্থের প্রসারণ যথেষ্ট কম বলে সেটি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি দেখতে পাই না। সে তুলনায় গ্যাসের প্রসারণ যথেষ্ট বেশি বলে আমরা সহজ পরীক্ষা করেই সেটা

চিত্র ২.৫ : বেলুনের ভেতরের বাতাস শীতল করা হলে বেলুনটি সংকুচিত এবং উত্তপ্ত করা হলে প্রসারিত হয়।

দেখতে পারি। একটা বেলুনকে একটুখানি ফুলিয়ে একটা বোতলের মুখে লাগিয়ে যদি বোতলটা বরফ দেওয়া পানিতে চুবিয়ে রাখি তাহলে দেখব বেলুনটা সংকুচিত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, আবার বোতলটা যদি গরম পানিতে চুবিয়ে রাখি তাহলে দেখব বেলুনটা ফুলে উঠেছে (চিত্র ২.৫)।

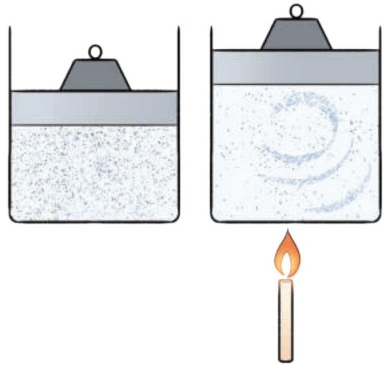

চিত্র ২.৬ : তাপের ফলে গ্যাসের চাপ ও আয়তন বৃদ্ধি পায়

তবে কঠিন কিংবা তরলের বেলায় তাদের উপর প্রযুক্ত চাপ বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়নি, গ্যাসের বেলায় কিন্তু চাপ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তরল কিংবা কঠিন পদার্থকে চাপ দিয়ে খুব বেশি সংকুচিত করা যায় না। কিন্তু গ্যাসকে খুব সহজে চাপ দিয়ে অনেক বেশি সংকুচিত করা যায়। একই পরিমাণ গ্যাসকে ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের পাত্রে ঢোকানো হলে তার চাপও ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ তাপমাত্রার মতো চাপ বাড়িয়ে কমিয়েও গ্যাসের প্রসারণ সংকোচন করা যায়। কাজেই আমরা যদি তাপ দিয়ে গ্যাসের আয়তন কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে মাপতে চাই, তাহলে লক্ষ রাখতে হবে যেন তার চাপের কোনো পরিবর্তন না হয় (চিত্র ২.৬)। তাই প্রথমেই আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ (P), আয়তন (V) ও তাপমাত্রা (T) -এর মাঝে সম্পর্কটা জানা দরকার। মনে রাখতে হবে, এখানে T তাপমাত্রা কিন্তু কেলভিন স্কেলে। এটাকে বলে আদর্শ গ্যাসের সূত্র এবং গাণিতিকভাবে সূত্রটিকে এভাবে লেখা যায় :

$$PV = nRT$$

এখানে R হচ্ছে 'সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক', এর মান 8.314 $JK^{-1}mol^{-1}$ আর n হলো মোল এককে গ্যাসের পরিমাণ। এই ধ্রুবকের মান সকল গ্যাসের জন্য সত্যি।

উদাহরণ : একটি 100 ml আয়তনের পাত্রে 108 Pa চাপে 128 g অক্সিজেন গ্যাস রাখা হলে এর তাপমাত্রা কত হবে?

সমাধান : চাপ P = 10^8 Pa, আয়তন V = 100 ml = 10^{-4} m^3, অক্সিজেনের আণবিক ভর 32g, তাই 128 g অক্সিজেন মানে

n = 128/32 = 4 mole অক্সিজেন

যেহেতু, PV = nRT

কাজেই $T = PV/nR = (10^8 \times 10^{-4})/(4 \times 8.314) = 300K$

সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে $300 - 273 = 27^0C$

4 mole হাইড্রোজেন বা 4 mole নাইট্রোজেন বা 4 mole যে কোনো গ্যাসের জন্যই ফলাফলটি কিন্তু একই হতো।

আমরা এবারে গ্যাসের জন্য প্রসারণ সহগ বের করতে পারি। আমরা জানি, একটা নির্দিষ্ট চাপে যদি T_1 তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়াতন হয় V_1 এবং T_2 তাপমাত্রায় সে একই গ্যাসের আয়তন হয় V_2 তাহলে তার প্রসারণ সহগ হবে,

$$\gamma = \frac{(V_2 - V_1)}{V_1(T_2 - T_1)}$$

কিন্তু আমরা জানি $$PV_1 = nRT_1$$

$$PV_2 = nRT_2$$

কাজেই $$P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$$

যেহেতু $PV_1 = nRT_1$ তাই বাম দিকে PV_1 দিয়ে এবং ডান দিকে nRT_1 দিয়ে ভাগ করে

$$(V_2 - V_1)/V_1 = (T_2 - T_1)/T_1$$

কিংবা $$\frac{(V_2 - V_1)}{V_1(T_2 - T_1)} = \frac{1}{T_1}$$

কাজেই $$\gamma = \frac{1}{T_1}$$

তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্যাসের প্রসারণ সহগ ধ্রুব সংখ্যা নয়, এটি তাপমাত্রার বিপরীত। তাপমাত্রা যত কম হবে গ্যাসের প্রসারণ হবে তত বেশি।

২.৪ ক্যালরিমিতি

তাপ, তাপমাত্রা এবং এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এ রকম অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, একটা বস্তুর মোট তাপ কেমন করে মাপতে হয়, কিংবা একটা বস্তুর তাপমাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়াতে হলে সেখানে কতটুকু তাপ দিতে হবে সেটি এখনো আলোচনা করা হয়নি। বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটাকে ক্যালরিমিতি বলা হয়।

বস্তুর ভেতরে কতটুকু তাপ রয়েছে, সেটি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর কর। একটি হচ্ছে বস্তুটির ভর,

তোমরা যারা কেতলিতে পানি গরম করেছ তারা সবাই এটি জানো। তোমরা দেখেছ এক কাপ পানি ফুটাতে কেতলিটিতে যত তাপ দিতে হয়, পুরো কেতলির পানি ফুটাতে তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ দিতে হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'তাপমাত্রা', আমরা সবাই এটিও অনুমান করতে পারি। কারণ আমরা দেখেছি কেতলির পানিকে অল্প তাপ দিলে সেটি একটু উষ্ণ হয়, কিন্তু সময় নিয়ে অনেক তাপ দিলে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। কাজেই দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বলতে পারি বেশি ভর এবং তাপমাত্রা বেশি হলে তার ভেতরেও তাপ বেশি থাকে।

কোনো বস্তুর তাপ তৃতীয় যে বিষয়টির উপর নির্ভর করে সেটি হলো আপেক্ষিক তাপ যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সঠিকভাবে অনুমান করতে পারি না। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, খানিকটা পানিকে তাপ দিয়ে তার তাপমাত্রা 10^0C ডিগ্রি বাড়ালে সেটি একটি আরামদায়ক উষ্ণতায় পৌঁছাবে। কিন্তু সমান পরিমাণ একটি লোহার টুকরাতে সমান পরিমাণ তাপ দিলে তার তাপমাত্রা প্রায় 100^0C ডিগ্রি বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সেটি এত উত্তপ্ত হবে যে স্পর্শও করা যাবে না। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, পানির আপেক্ষিক তাপ যেহেতু লোহার আপেক্ষিক তাপ থেকে দশগুণ বেশি তাই লোহার সমান তাপমাত্রায় পৌঁছাতে পানিকে দশগুণ বেশি তাপ দিতে হয়।

» 1 kg পদার্থের তাপমাত্রা $1^{\circ}C$ বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ

অর্থাৎ যদি m ভরের কোনো পদার্থকে T_1 থেকে T_2 তাপমাত্রায় নিতে Q তাপের প্রয়োজন হয়, এবং পদার্থটির আপেক্ষিক তাপ s হলে :

$$Q = m\,(T_2 - T_1)\,s$$

আপেক্ষিক তাপের একক সেলসিয়াস স্কেলে $Jkg^{-1}\,{}^0C^{-1}$ এবং কেলভিন স্কেলে $Jkg^{-1}K^{-1}$

উদাহরণ : কাচের আপেক্ষিক তাপ 840 J kg-1K-1 হলে 3 kg কাচের তাপমাত্রা 30 K বৃদ্ধি করতে কী পরিমাণ তাপ প্রয়োজন?

সমাধান : প্রয়োজনীয় তাপ $Q = m\,s\,(T_2 - T_1) = 3 \times 840 \times 30 = 71280$ J

উদাহরণ : 300 K তাপমাত্রায় থাকা 2 Kg পানিকে চুলার উপরে রাখায় এর তাপমাত্রা 310 K হলো। চুলা থেকে 84000 J তাপ পাওয়া গেলে পানির আপেক্ষিক তাপ কত?

সমাধান : তাপ $Q = m\,s\,(T_2 - T_1)$

অর্থাৎ, আপেক্ষিক তাপ $s = Q / \{m\,(T_2 - T_1)\} = 84000 / \{2\,(310 - 300)\}$

$= 4200\ J\ kg^{-1}K^{-1}$

উদাহরণ : 295 K তাপমাত্রায় থাকা 5 kg পানিকে 63000 J তাপ দেয়া হলে পানিটুকুর তাপমাত্রা কত হবে?

সমাধান : তাপ $Q = m\ s\ (T_2 - T_1)$

অর্থাৎ, পরিবর্তিত তাপমাত্রা $T_2 = T_1 + Q/ms = 295 + 63000/(5 \times 4200) = 298\ K$

বস্তুর তাপ ধারণক্ষমতা C বলতে বোঝানো হয় সেই বস্তুটির তাপমাত্রা 1K বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন। বস্তুটির ভর এবং আপেক্ষিক তাপ জানা থাকলে খুব সহজেই যে কোনো বস্তুর তাপ ধারণক্ষমতা C বের করা যায়, কারণ বস্তুর ভর যদি m হয়, আপেক্ষিক তাপ s হয় তাহলে বস্তুটির ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে :

$$C = ms$$

উদাহরণ : 10kg লোহার তুলনায় 10kg পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা কত বেশি? (লোহার আপেক্ষিক তাপ $450\ Jkg^{-1}K^{-1}$, পানির আপেক্ষিক তাপ $4200\ Jkg^{-1}K^{-1}$)

সমাধান : লোহার তাপ ধারণ ক্ষমতা : $C = ms = 10 \times 450 = 4500\ Jkg^{-1}K^{-1}$

পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা : $C = ms = 10 \times 4200 = 42000\ Jkg^{-1}K^{-1}$

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা লোহার তাপ ধারণ ক্ষমতা থেকে প্রায় দশগুণ বেশি।

ক্যালরিমিতির মূলনীতি

শীতকালে গোসলের জন্য অনেক সময় আমরা বালতির ঠান্ডা পানিতে কিছুটা ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিই। ফুটন্ত গরম পানি বালতির শীতল পানিকে তাপ দিতে দিতে ঠান্ডা হতে থাকে এবং একই সঙ্গে বালতির শীতল পানিও গরম ফুটন্ত পানি থেকে তাপ নিতে নিতে উত্তপ্ত হতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা যায় উত্তপ্ত পানির তাপমাত্রা কমে এবং শীতল পানির তাপমাত্রা বেড়ে পুরো পানিটুকুই একটা ব্যবহারযোগ্য উষ্ণতায় চলে এসেছে। খুব সহজেই কোনো পদার্থের কোনো তাপমাত্রার বস্তুর সঙ্গে অন্য কোনো তাপমাত্রার কোনো বস্তু মেশালে কে কতটুকু তাপ দেবে বা নেবে এবং শেষ পর্যন্ত কত তাপমাত্রায় পৌঁছাবে এই বিষয়গুলো বের করে ফেলা যায়। এই ঘটনা দুটি নিয়ম মেনে চলে, যা উপরের বালতির উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। এই নিয়ম দুটিই হচ্ছে ক্যালরিমিতির মূলনীতি :

(১) বেশি তাপমাত্রার বস্তু কম তাপমাত্রার বস্তুর কাছে তাপ দিতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটো বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয়।
(২) উত্তপ্ত বস্তু যতটুকু তাপ ছেড়ে দেবে, শীতল বস্তু ঠিক ততটুকু তাপই গ্রহণ করবে।

(এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়া চলাকালে অন্য কোনোভাবে তাপ নষ্ট হচ্ছে না।)

উদাহরণ : 300 K তাপমাত্রার 2 kg পানির মধ্যে 400 K তাপমাত্রার 5 kg উত্তপ্ত লোহার টুকরা ছেড়ে দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পরে তাপমাত্রা কত হবে? (লোহার আপেক্ষিক তাপ 450 J kg-1K-1)

সমাধান : যেহেতু, এখানে পানির তাপমাত্রা কম এবং লোহার তাপমাত্রা বেশি ছিল, তাই দুটি একই তাপমাত্রায় না আসা পর্যন্ত তাপের আদানপ্রদান হতে থাকবে। মনে করি এই তাপমাত্রাটি T_1 তাহলে পানির তাপমাত্রা বেড়ে T হবে এবং লোহার তাপমাত্রা কমে T_2 হবে।

তাহলে, পানিকে উত্তপ্ত করতে প্রয়োজনীয় তাপ $Q_1 = m_1\ s_1\ (T - T_1)$
আবার, লোহাকে ঠান্ডা হতে ছেড়ে দেয়া তাপ $Q_2 = m_2\ s_2\ (T_2 - T)$
ক্যালরিমিতির মূলনীতি অনুযায়ী, $Q_1 = Q_2$ হবে।
অর্থাৎ, $m_1\ s_1\ (T - T_1) = m_2\ s_2\ (T_2 - T)$
তাহলে, $2 \times 4200 \times (T - 300) = 5 \times 450 \times (400 - T)$
বা, $T = 321.13$ K

২.৫ পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব

তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছ, সব পদার্থ অণু দিয়ে তৈরি এবং কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আটকে রাখে। তাপ দেওয়া হলে এগুলোর কম্পন বেড়ে যায় এবং আণবিক বন্ধন শিথিল হয়ে একে অন্যের ওপর দিয়ে নড়তে শুরু করে এবং এটাকে আমরা বলি তরল। তাপমাত্রা যদি আরও বেড়ে যায়, তখন অণুগুলো মুক্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে, তাকে আমরা বলি গ্যাস। তবে বিশেষ বিশেষ কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সেটি সরাসরি গ্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ভৌত পরিবর্তন, কাজেই তাপ সরিয়ে নিয়ে এই তিনটি অবস্থার বিপরীত পরিবর্তনগুলোও ঘটানো সম্ভব। ২.৭ চিত্রে তাপ প্রয়োগ করে পদার্থের এই তিন অবস্থার পরিবর্তনগুলো দেখানো হয়েছে।

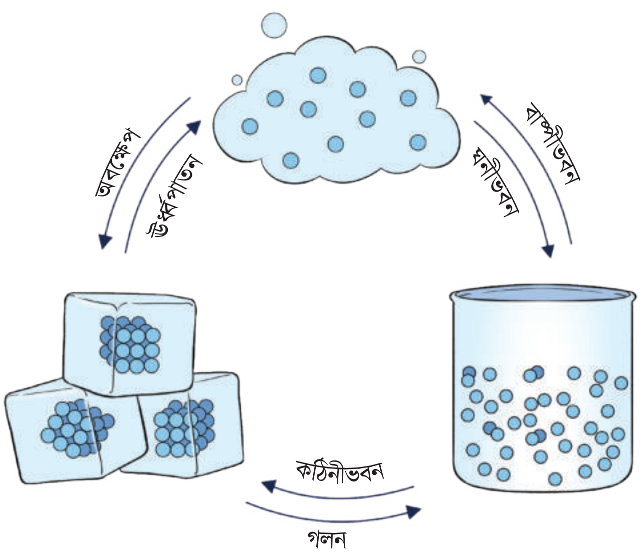

চিত্র ২.৭: তাপ বিনিময় করে পদার্থকে কঠিন তরল এবং গ্যাস এই তিনটি অবস্থার মাঝে রূপান্তর করা যায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কঠিন থেকে তরল এবং তরল থেকে কঠিন:

একটা কঠিন পদার্থকে যখন তাপ দেওয়া হয়, তখন তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে কঠিন পদার্থটি গলতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম গলন (melting), আমরা এক টুকরা বরফকে বাইরে রেখে দিলে সেটি চারপাশের বাতাস থেকে তাপ গ্রহণ করে গলতে থাকে। যে তাপমাত্রায় গলন শুরু হয়, সেটাকে বলে গলনাঙ্ক। বরফের গলনাংক 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা তরল কঠিন হতে পারে। তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে কঠিনীভবন (Solidification) বলে। জ্বলন্ত মোমবাতি থেকে যে গলিত মোম গড়িয়ে পড়ে, সেটি শীতল হয়ে আবার কঠিন হয়ে যায়, এটি কঠিনীভবনের একটি উদাহরণ।

তরল থেকে গ্যাস এবং গ্যাস থেকে তরল :

তরল পদার্থকে তাপ দিলে তার তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে এবং তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম বাষ্পীভবন (vaporization) এবং যে তাপমাত্রায় বাষ্পীভবন ঘটে, সেটাকে বলে স্ফুটনাঙ্ক। পানির স্ফুটনাংক 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপ দিয়ে তরল থেকে গ্যাসে যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা গ্যাস তরল হতে পারে। একটা গ্লাসে কয়েক টুকরা বরফ রেখে দিলে আমরা দেখতে পাই গ্লাসের গায়ে জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে বিন্দু বিন্দু পানি হিসেবে জমা হয়েছে। বায়বীয় অবস্থা থেকে এভাবে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে ঘনীভবন (condensation) বলে।

কঠিন থেকে গ্যাস এবং গ্যাস থেকে কঠিন :

যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রদান করা হলে, সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) বলে। আমরা কাপড়ে পোকা না ধরার জন্য সেখানে ন্যাপথালিন ব্যবহার করতে দেখেছি। কঠিন ন্যাপথালিনকে তাপ দিলে সেটি তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়।

ঊর্ধ্বপাতনের বিপরীত প্রক্রিয়াটির নাম অবক্ষেপ (Deposition) যেখানে একটি পদার্থের বাষ্পকে শীতল করা হলে সেটি তরল না হয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। আয়োডিন মেশানো খাদ্য লবণের মধ্যে আয়োডিন একটি ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ। কাজেই এই আয়োডিন মেশানো খাদ্য লবণের মিশ্রণকে তাপ দিলে আয়োডিন সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তখন ঐ বাষ্পকে ঠান্ডা করে আয়োডিনের বাষ্পকে সরাসরি কঠিন আয়োডিনে পরিণত করা যায়।

তাপ প্রদান অথবা অপসারণের মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ বা সংকোচনের পরিমাণ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

বরফ কিংবা মোমকে যদি তাপ দিয়ে গলানো হয় তাহলে সেগুলো গলার সময় তাপমাত্রা একই থাকে। অন্যান্য কঠিন পদার্থকে গলিয়ে তরল করতে গেলেও একই ঘটনা ঘটে, কেবল ভিন্ন পদার্থের জন্য তাপমাত্রাটি ভিন্ন হয়। তোমরা জানো যে কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটির নাম 'গলন' আর গলন ঘটার এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রাটি হচ্ছে 'গলনাঙ্ক'। এই সময় যে তাপ দেওয়া হয় সেটি কঠিন পদার্থের অণুগুলোর আণবিক বন্ধন শিথিল করার কাজে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর গতিশক্তি বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই তাপমাত্রা বাড়ে না (চিত্র ২.৮)। একইভাবে পানি ফোটাতে

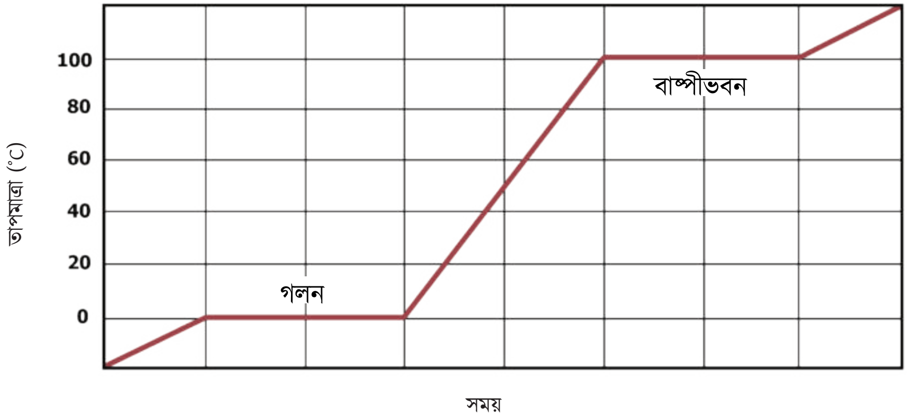

চিত্র ২.৮ : সময়ের সঙ্গে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির লেখচিত্র।
গলন এবং বাষ্পীভবনের সময় তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না।

গেলেও একই ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, পুরো পানিটুকু ফুটে বাষ্পীভুত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাপমাত্রা একই থাকে। বিভিন্ন তরল পদার্থকে ফুটিয়ে বাষ্পীভূত করতে গেলেও একই ঘটনা ঘটে, শুধু তাপমাত্রাটি ভিন্ন হয়। তাপ প্রয়োগের কারণে তরল পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটির নাম 'বাষ্পীভবন' আর বাষ্পীভবন ঘটার এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকেই পদার্থটির 'স্ফুটনাঙ্ক' বলে।

গলন কিংবা বাষ্পীভব ঘটানোর জন্য বাইরে থেকে তাপ দিতে হয়। এই দুটি ঘটনা ঘটার সময় যেহেতু পদার্থের তাপমাত্রায় কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই এসময় পুরো তাপটুকুই পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে কাজে লাগে। পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হয়, তত বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পদার্থের জন্য এই পরিমাণটি কম-বেশি হয়ে থাকে। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে ব্যবহৃত এই তাপকে বলা হয় সুপ্ততাপ। গলনের ক্ষেত্রে এটি 'গলনের সুপ্ততাপ' এবং বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে এটি 'বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ' নামে পরিচিত।

বস্তুর সুপ্ততাপ জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই কোনো পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় তাপ Q বের করতে পারব। কারণ বস্তুর ভর যদি m হয়, আর সংশ্লিষ্ট অবস্থা পরিবর্তনের সুপ্ততাপ L হয়, তাহলে $Q = mL$

উদাহরণ : বরফ গলনের সুপ্ততাপ 33600 J Kg^{-1} হলে গলনাংক তাপমাত্রায় থাকা 3 Kg বরফ গলিয়ে 300 K তাপমাত্রার পানি পেতে কী পরিমাণ তাপ প্রয়োজন?

সমাধান : শুধু বরফ গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ

$Q_1 = m\ L = 3 \times 33600 = 100800$ J

আবার, 273 K তাপমাত্রার পানিকে 300 k তাপমাত্রায় নিতে প্রয়োজনীয় তাপ

$Q_2 = m\ s\ (T_2 - T_1) = 3 \times 4200 \times (300 - 273) = 340200$ J

অর্থাৎ, মোট তাপের প্রয়োজন হবে $Q_1 + Q_2 = 441000$ J

তাপ বাড়ানোর সময় যেহেতু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছানোর পর গলন এবং বাষ্পীভবন ঘটে থাকে, তাই তোমাদের ধারণা হতে পারে সেই তাপমাত্রায় না পৌঁছানো পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলো ঘটে না। কিন্তু সেটি সত্যি নয়, পানির স্ফুটনাংক 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু আমরা দেখতে পাই একটি মেঝেতে পানি পড়ে থাকলে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দেখতে দেখতে সেটি শুকিয়ে যায়। হাতে একটু অ্যালকোহল লাগিয়ে ফুঁ দিলে আমরা সেই জায়গাটুকু শীতল অনুভব করি। অ্যালকোহল বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য তার সুপ্ত তাপটুকু আমাদের ত্বক থেকে নিয়ে নেয় বলে এরকমটি ঘটে। আমরা যদি পদার্থের আণবিক মডেলে ফিরে যাই তাহলে বিষয়টা বোঝা মোটে কঠিন নয়। একটি অণু যদি কোনোভাবে যথেষ্ট শক্তি পেয়ে যায় এবং তার কারণে যদি তার গতিশক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায় তাহলে সেটি কঠিন কিংবা তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে আসতে পারে। কঠিন কিংবা তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশে যেহেতু অসংখ্য অণু ক্রমাগত আঘাত করছে তাই তাদের আঘাতে কোনো কোনো অণু মুক্ত হয়ে যাবার মতো শক্তি পেয়ে যেতে পারে। আমরা সবাই এই প্রক্রিয়াটি দেখেছি।

পানির বাষ্পীভবনের সময় পানি যেরকম তার বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটুকু নিয়ে নেয়, এর উল্টোটুকুও সত্যি, বাষ্প যখন পানির কণায় পরিণত হয় তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটুকু তাপ হিসেবে ফিরিয়ে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় পানি সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ নিয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে উপরে উঠে যায়, সেখানে শীতল হওয়ার পর জলকণায় পরিণত হওয়ার সময় বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটুকু শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। এই শক্তি ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করে।

২.৬ তাপগতিবিদ্যা

তাপ শক্তির অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে তাপগতিবিদ্যা বলা হয়। অতীতে তাপের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এক সময় মনে করা হতো তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ক্যালরিক নামে একটি তরল পদার্থের প্রবাহ, যেটি সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যায় না।

তবে বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড কামানের নল ফুটো করার সময়ে ড্রিল দিয়ে ঘর্ষণ করে ক্রমাগত তাপ সৃষ্টি করে দেখান তাপ ক্যালরিক নামে কোনো তরল নয়, এটি এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তি। বর্তমানে ক্যালরি তত্ত্ব না থাকলেও ক্যালরি এককটি এখনো রয়ে গেছে, বিশেষ করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটে এই এককের একটি রূপ নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞানী জুল যান্ত্রিক কাজের সঙ্গে তাপের একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করেন এবং দুটির ভেতর গাণিতিক সম্পর্কটি বের করেন। বিজ্ঞানীরা তখন তাপকেও শক্তির একটি রূপ হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানী জুলের পরীক্ষণ

এই অধ্যায়েই আমরা ক্যালরিমিতির মূলনীতিটি জেনেছি এবং তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক তাপের সাহায্যে তাপ পরিমাপ করতে শিখেছি। আগের অধ্যায়ে আমরা বিভবশক্তি নির্ণয়ের গাণিতিক রাশিমালা শিখেছিলাম। এই দুটি বিষয়কে একত্র করেই বিজ্ঞানী জেমস জুল তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষণটি করেছিলেন (চিত্র ২.৯)। এখানে পুলির মাধ্যমে রোলারে পেঁচানো একটি দড়িতে আটকানো ভরটি অভিকর্ষের প্রভাবে নামতে থাকে। এসময় প্যাঁচ খোলার সঙ্গে সঙ্গে রোলারটি ঘুরতে থাকে এবং এর সঙ্গে আটকানো একটি চাকাকে ঘোরাতে থাকে। পানিতে ডোবানো চাকাটি পানিকে আলোড়িত এবং উত্তপ্ত করে। একটি থার্মোমিটারের মাধ্যমে পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন পরিমাপ করে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ হিসাব করা যায়। অন্যদিকে ভরটির কতটুকু নিচে নেমেছে সেখান থেকে কতটুকু বিভব শক্তি কাজে রূপান্তরিত হয়েছে সেটি বের করা যায়। এভাবে জুল যান্ত্রিক কাজের সঙ্গে তাপের সম্পর্কটি বের করেছিলেন।

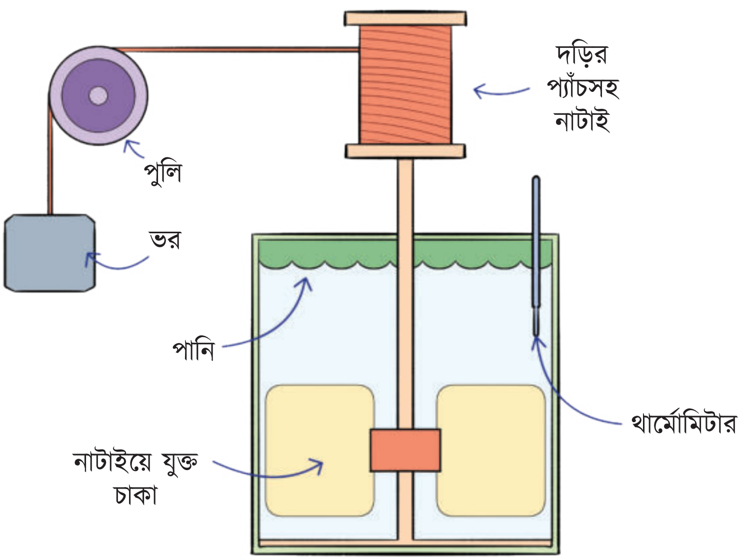

চিত্র ২.৯ : জুলের পরীক্ষা

তোমরা জানো পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$ এখান থেকেই বুঝতে পারছ জুল তার পরীক্ষায় 1kg পানির উপর 4200J কাজ করে তার তাপমাত্রা 1K বাড়াতে পেরেছিলেন।

উদাহরণ : জুলের পরীক্ষণে আবদ্ধ পাত্রের ভেতরে 310 K তাপমাত্রার 100g পানি নেয়া হলো। এরপরে রোলারের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা 50 kg ভর 3 m নামানোর ফলে সৃষ্ট আলোড়নের পরে পানির তাপমাত্রা কত হবে? (মনে করো অন্য কোনোভাবে শক্তির অপচয় হয়নি)।

সমাধান : এখানে, ভরটির বিভব শক্তি হ্রাস পায় $E = mgh = 50 \times 3 \times 9.8 = 1470$ J

আলোড়নের পরে পানির তাপমাত্রা T_2 হলে $Q = m\ s\ (T_2 - T_1)$

যেহেতু, অন্য কোনোভাবে শক্তির অপচয় হচ্ছে না, তাই ভরটির হ্রাস পাওয়া বিভবশক্তির পুরোটাই গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে, এবং সেই গতিশক্তিই পানিকে আলোড়িত করে উত্তপ্ত করবে।

অর্থাৎ, $E = Q = m\ s\ (T_2 - T_1)$

তাহলে, $1470 = 0.1 \times 4200 \times (T_2 - 310)$

বা, $T_2 = 313.5$ K

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী জুল, ক্লসিয়াস, সাদি কার্নট এবং কেলভিন তাপগতিবিদ্যাকে এগিয়ে নেন, এদের মাঝে সাদি কার্নটকে তাপগতিবিদ্যার জনক বলা হয়। এই বিজ্ঞানীরা প্রবাহিত পদার্থ হিসেবে তাপের ক্যালরিক তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়ে বলেন যে তাপ হলো শক্তি, অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতা।

তাপগতিবিদ্যার তিনটি সূত্র রয়েছে, এই তিনটি সূত্র তাপশক্তি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। এই সূত্র তিনটি নানাভাবে লেখা হয়, তবে সূত্রের মূল ভাবটি খুব সহজে প্রকাশ করে এভাবে লেখা সম্ভব :

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র : শক্তিকে তাপ, অভ্যন্তরীণ শক্তি কিংবা কাজ হিসেবে রূপান্তর করা সম্ভব কিন্তু তাকে সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যাবে না।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র : যখন শক্তিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন করা হয় তখন সব সময়ই খানিকটা শক্তি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়।

তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র : পরম শূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয়।

তাপগতি বিদ্যার তিনটি সূত্র প্রকাশ করার পর বিজ্ঞানীরা আরও একটি বিষয়কে সূত্র হিসেবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সূত্রটির গুরুত্বের কারণে সেটিকে সবার আগে স্থান দেওয়ার জন্য এটিকে তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র হিসেবে প্রকাশ করা হয় :

তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র : যদি দুটি সিস্টেম তৃতীয় একটি সিস্টেমের সঙ্গে একই তাপমাত্রায় থাকে তাহলে প্রথম দুটি সিস্টেম একই তাপমাত্রায় থাকবে।

এই শূন্যতম সূত্রের ভিত্তিতেই আমরা থার্মোমিটার তৈরি করে থাকি।

অধ্যায় ৩
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান

ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তের প্রায় ১৭৫ মিটার নিচে ২৭ কিলোমিটার পরিধির একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে স্থাপিত লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার, এই যন্ত্রের সাহায্যে কণা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের পরীক্ষানীরিক্ষার দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছে

অধ্যায় ৩ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ কোয়ান্টাম মেকানিকস
- ☑ রিলেটিভিটি
- ☑ স্ট্যান্ডার্ড মডেল বা কণাবিদ্যা

৩.১ কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Quantum Mechanics)

গত শতকের প্রথম দিকে পৃথিবীর বড়ো বড়ো পদার্থবিজ্ঞানীরা কিছুতেই একটা হিসাব মিলাতে পারছিলেন না। উত্তপ্ত বস্তু থেকে যে আলো বিকিরণ হয় সেটি তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, এক টুকরা লোহাকে উত্তপ্ত করা হলে সেটি গনগনে লাল হয়, আরও বেশি হলে সেটি ধীরে ধীরে নীলাভ হতে শুরু করে। উত্তপ্ত বস্তুর বিকিরিত আলোর তীব্রতার সঙ্গে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা সবাই জানতেন। বিজ্ঞানীরা উত্তপ্ত বস্তুর জন্য একটি সূত্র দিয়ে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলোর তীব্রতা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন আবার আরেকটি সূত্র দিয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলোর তীব্রতা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু একটি সূত্র দিয়েই উত্তপ্ত বস্তুর জন্য বিকিরিত সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর তীব্রতা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না।

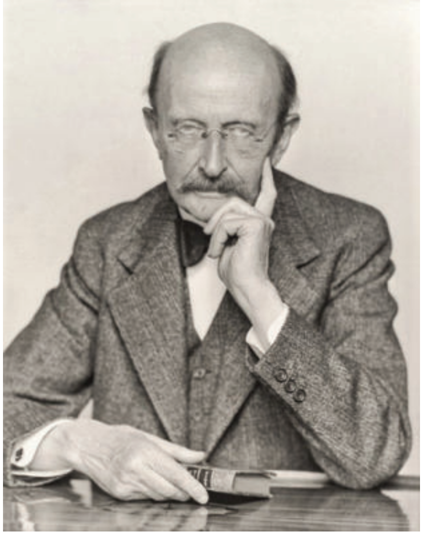

চিত্র ৩.১ : ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে শক্তি অবিচ্ছিন্ন (Continuous), কিন্তু বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (চিত্র ৩.১) অন্যভাবে চিন্তা করলেন। তিনি শক্তিকে অবিচ্ছিন্ন না ধরে সেটিকে বিচ্ছিন্ন (Discrete) হিসেবে বিবেচনা করলেন অর্থাৎ তিনি ধরে নিলেন শক্তিকে যত ইচ্ছে তত ছোটো অংশে বিভাজিত করা যাবে না, এর একটি ক্ষুদ্রতম কণা আছে। কম আলোর অর্থ হচ্ছে কম সংখ্যক আলোর কণা এবং বেশি

আলোর অর্থ হচ্ছে বেশি সংখ্যক আলোর কণা। তখন চমৎকারভাবে একটি সূত্র দিয়েই উত্তপ্ত বস্তু হতে ছোটো থেকে বড়ো সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য শক্তির তীব্রতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। সেই বিচ্ছিন্ন শক্তির কণাকে বলা হলো শক্তির কোয়ান্টা এবং ধীরে ধীরে যে নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হলো সেটি হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে বহুল ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবরাশিটির নাম রেখেছেন প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক। এর মান 6.634×10^{-34} Js এবং একে প্রকাশ করা হয় h দিয়ে।

মানুষের চোখ যথেষ্ট সংবেদী, ধারণা করা হয় যদি মানুষের চোখ আরও দশগুণ বেশি সংবেদী হতো তাহলে আমরা খালি চোখেই আলোর বিচ্ছিন্ন শক্তির কোয়ান্টা দেখতে পেতাম! অর্থাৎ তুমি যদি অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে এবং খুব ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গের আলোর তীব্রতা কমিয়ে আনা হতো, তাহলে তুমি এক সময় লক্ষ করতে যে আলো অবিচ্ছিন্নভাবে আসছে না, বিচ্ছিন্ন আলোর বিচ্ছুরণ বা কণা হিসেবে আসছে। এই কণাগুলোর সবকটির বিচ্ছুরণের তীব্রতা সমান, তবে আলোর তীব্রতা যতই কমিয়া আনা হতো কণাগুলোর সংখ্যা ততই কমে আসত।

৩.১.১ কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা (Wave-particle Duality)

আমরা সবাই তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত, তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাংক, পর্যায়কাল ইত্যাদি নানা রাশি সংযুক্ত থাকে, এবং সেটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি বয়ে নিয়ে যায়। তরঙ্গের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হচ্ছে ব্যাতিচার, যেখানে একটি তরঙ্গ অন্য আরেকটি তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বড়ো বিস্তারের একটি তরঙ্গ তৈরি করে কিংবা একটি তরঙ্গ অন্য তরঙ্গের সঙ্গে বিপরীতভাবে মিলিত হয়ে সম্মিলিত

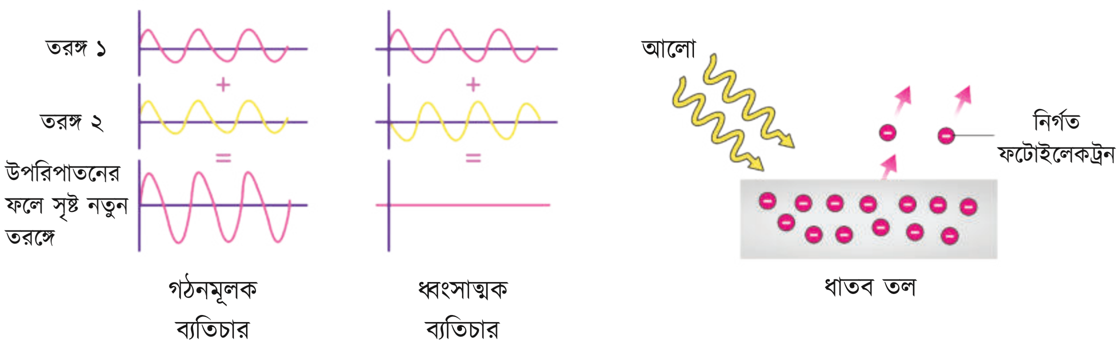

চিত্র ৩.২ : (বামে) আলোর তরঙ্গ ধর্ম ব্যাতিচার এবং (ডানে) আলোর কণা ধর্ম ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট।

বিস্তার কমিয়ে দেয়। (চিত্র ৩.২) প্রকৃতির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তরঙ্গ হচ্ছে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গেরই একটি অংশ, যা আমাদের চোখের রেটিনায় ধরা পরে, তাকে আমরা বলি আলো। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে আলোর আচরণ তরঙ্গের মতো নয়, বরং কণার মতো। একটা কণা যে রকম অন্য কণাকে ঠোকা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে আলো ঠিক সেভাবে

ইলেকট্রনকে ঠোকা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে। আলোর কণাধর্মী এ রকম একটা উদাহরণ হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট যেখানে আলোর কণা বা কোয়ান্টা একটা ধাতব পদার্থকে আঘাত করে সেখান থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে দেয়। চমকপ্রদ এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তোমরা নিশ্চয় সোলার সেল দেখেছ, সোলার সেলে এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যবহার করেই সূর্যের আলোর শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আবার অন্যদিকে তোমরা নিশ্চয় এটিও জানো যে ইলেকট্রন হচ্ছে কণা; এর ভর আছে, এর ভরবেগ আছে এটি অন্য কণাকে আঘাত করে সরিয়ে দিতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে বিজ্ঞানীরা এক সময়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে কখনো কখনো ইলেকট্রন এমন আচরণ করে যেন এটি কণা নয়, যেন এটি একটি তরঙ্গ! এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে শুধু তাই নয় ইলেকট্রন ঠিক তরঙ্গের মতো ব্যাতিচার পর্যন্ত করতে পারে। ইলেকট্রন এতই নিশ্চিতভাবে তরঙ্গের মতো আচরণ করে যে, ইলেকট্রনের এই বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে রীতিমতো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে।

তাহলে, প্রশ্ন হচ্ছে আলো কি আসলে তরঙ্গ নাকি কণা? আবার একই সঙ্গে ইলেকট্রনের জন্যও একই প্রশ্ন করা যায়। ইলেকট্রন কি আসলে কণা নাকি তরঙ্গ?

উত্তরটা শুনলে তোমরা হকচকিয়ে যেতে পারো, কারণ উত্তর হচ্ছে: দুটোই! অর্থাৎ আলো তরঙ্গ এবং কণা দুইরকমের বৈশিষ্ট্যই বহন করে। আবার ইলেকট্রনও কণা এবং তরঙ্গ দুইরকমের বৈশিষ্ট্যই বহন করে। আলোর বেলায় বিজ্ঞানীরা প্রথমে তার তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের কথা জেনেছেন আর ইলেকট্রনের বেলায় প্রথমে জেনেছেন তার কণা বৈশিষ্ট্যের কথা, এটুকুই পার্থক্য। এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি তোমাদের প্রথমে খুব বিচিত্র মনে হতেই পারে, কিন্তু জেনে রাখো সত্যিই এটা সম্ভব। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিকে বলেন কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা (Wave-particle Duality)।

৩.১.২ ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (De-Broglie Wavelength)

শুধু যে ইলেকট্রনকে তরঙ্গ হিসেবে দেখা যায় তা নয়। বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি (চিত্র ৩.৩) প্রথম বলেছিলেন যে, প্রত্যেক পদার্থ বা কণার সঙ্গেও একটা তরঙ্গ থাকে, এমনকি সেই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে সেটাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। কোনো কণার ভরবেগ যদি p হয় তাহলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হবে :

$$\lambda = h/p$$

চিত্র ৩.৩ : লুই ডি-ব্রগলি

যেখানে h হচ্ছে প্লাংকের ধ্রুবক। এই অত্যন্ত সহজ সমীকরণটি একটি বিস্ময়কর সমীকরণ কারণ এই সমীকরণের বাম পাশে রয়েছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ, যেটি পুরোপুরি তরঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য এবং ডানদিকে রয়েছে ভরবেগ p, যেটি পুরোপুরি কণার একটি বৈশিষ্ট্য। এই সমীকরণটি তরঙ্গ এবং কণার মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করেছে।

উদাহরণ : তোমার ভর যদি 50 kg হয় আর তুমি যদি 2 m/s বেগে দৌড়াও তাহলে তোমার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

সমাধান : তোমার ভরবেগ হবে $p = 50 \times 2$ kg m/s = 100 kg m/s, কাজেই তোমার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে : $\lambda = (6.634 \times 10^{-34} / 100)$ m $= 6.634 \times 10^{-36}$ m

বুঝতেই পারছ, এটি এতই ছোটো যে, সেটি দেখার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তুমি যদি ইলেকট্রন-প্রোটনের মতো ছোটো কণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করো, তাহলে কিন্তু এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিংবা তরঙ্গের মতো ব্যবহার এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

উদাহরণ : 4×10^{6} ms^{-1} বেগে গতিশীল একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? (ইলেকট্রনের ভর 9.1×10^{-31} kg)

সমাধান : ইলেকট্রনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = h/p = h/mv = 6.634 \times 10^{-34}/(9.1 \times 10^{-31} \times 4 \times 10^{6})$

$$= 1.8 \times 10^{-10} m$$

খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা যায় যে, সত্যিই যদি সব কণার জন্যই একটি তরঙ্গ থাকে, তাহলে সেটি কীসের তরঙ্গ? খুব সহজ করে বললে বলা যায় যে এই তরঙ্গটি বাস্তব কোনো তরঙ্গ নয় তবে এই তরঙ্গটির সঙ্গে একটি কণাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেই ‘সম্ভাবনার’ (Probability) একটি সম্পর্ক আছে।

৩.১.৩ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (Heisenberg's uncertainity principle)

৩.৪ চিত্রে একটা কণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি ভিন্ন ডি ব্রগলি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় চিত্রটির কোন তরঙ্গে কণাটির অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা সহজ? অবশ্যই তুমি বলবে উপরের তরঙ্গটিতে। কারণ এখানে তরঙ্গটি ছোটো একটা জায়গায় আটকে আছে, কাজেই কণাটি

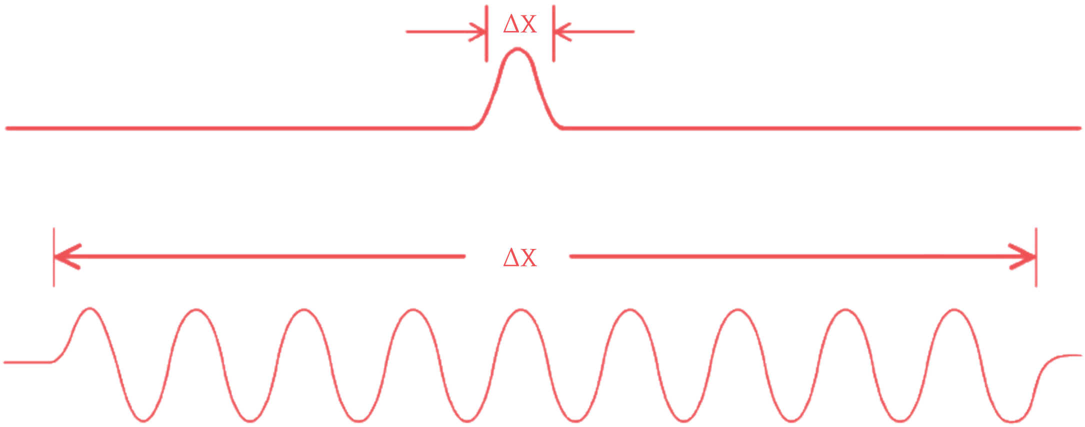

চিত্র ৩.৪ : উপরের তরঙ্গের অবস্থানের অনিশ্চয়তা (Δx) কম, নিচের তরঙ্গের অবস্থানের অনিশ্চয়তা (Δx) বেশি

নিশ্চয়ই সেখানে আছে। নিচের তরঙ্গটিতে যেহেতু তরঙ্গটা অনেকদূর বিস্তৃত তাই বস্তুটার অবস্থান এর যে কোনো জায়গায় হতে পারে, অর্থাৎ তুমি অবস্থানটি আর নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না। এবারে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, চিত্রের কোনো তরঙ্গে কণাটির ভরবেগ নির্দিষ্ট করে বলা যাবে? তাহলে তুমি নিশ্চয় বলবে যে নিচের তরঙ্গে ভরবেগ নির্দিষ্ট করে বলা যাবে, কারণ সেটিতে তরঙ্গটা যেহেতু অনেকটুকু বিস্তৃত, সেখানে অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে নিখুঁতভাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করা সম্ভব, আর ডি-ব্রগলির সূত্র অনুযায়ী ভরবেগ p হচ্ছে h/λ কাজেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ যত নিশ্চিতভাবে মাপা হবে ভরবেগও তত নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। উপরেরটিতে তো পুরো একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যই নেই—কেমন করে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুমান করা যাবে? কাজেই উপরের তরঙ্গে তুমি কণাটির ভরবেগ আর নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না।

চিত্র ৩.৫ : ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ

এই উদাহরণটি থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ কোনো কণার অবস্থান নির্দিষ্ট করে জানলে তার ভরবেগ অনিশ্চিত হয়ে যায়। আবার ভরবেগ ভালো করে জানলে অবস্থানটা অনিশ্চিত হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে হাইজেনবার্গের (চিত্র ৩.৫) বিখ্যাত অনিশ্চয়তার সূত্র।

গাণিতিকভাবে কোনো অবস্থানের অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করা হয় Δx দিয়ে। Δx কম হওয়া মানে অবস্থানে অনিশ্চয়তা কম, অর্থাৎ অবস্থানটা ভালো করে জানি আবার Δx বেশি হওয়া মানে অবস্থানের অনিশ্চয়তা বেশি অর্থাৎ অবস্থানটা ভালো করে জানি না। একইভাবে ভরবেগের অনিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয় Δp দিয়ে। Δp কম হওয়া মানে ভরবেগের অনিশ্চয়তা কম, অর্থাৎ ভরবেগটা ভালো করে জানি আবার Δp বেশি হওয়া

মানে ভরবেগে অনিশ্চয়তা বেশি অর্থাৎ ভরবেগটা ভালো করে জানি না। Δx এবং Δp ব্যবহার করে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রকে এভাবে লেখা হয় :

$$\Delta x.\Delta p \geq h/4\pi$$

মনে রেখো, একই সঙ্গে অবস্থান এবং ভরবেগ নিশ্চিতভাবে জানতে না পারার বিষয়টি কিন্তু বিজ্ঞানীদের বা তাদের পরিমাপ করার যন্ত্রের অক্ষমতা নয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে, এক সময় যখন বিজ্ঞান অনেক উন্নত হবে, তখন আরও ভালো যন্ত্রপাতি দিয়ে নিখুঁতভাবে একই সঙ্গে অবস্থান আর ভরবেগ মেপে ফেলা যাবে—এটি কখনোই হবে না। প্রকৃতি তার নিয়মের মধ্যে এই অনিশ্চয়তাটুকু রেখে দিয়েছে। তবে h -এর মান যেহেতু খুবই ছোটো তাই অনিশ্চয়তার মানও খুব কম বলে আমাদের দৈনন্দিন বৈজ্ঞানিক পরিমাপে বা প্রযুক্তির কাজে কখনো কোনো সমস্যা হয় না।

পদার্থবিজ্ঞানে এই অনিশ্চয়তা সূত্রের একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। পরবর্তী কালে তোমরা যারা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করবে তারা দেখতে পাবে, এই অনিশ্চয়তার সূত্র থেকে ইলেকট্রন-প্রোটন, অণু-পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র কণাদের বিচিত্র জগৎ বর্ণনা করতে গড়ে উঠেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নামে বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা।

৩.২ কণা-পদার্থবিজ্ঞান (Particle Physics)

আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে মানুষজন, গাছপালা, দালানকোঠা, আকাশের দিকে তাকালে চাঁদ সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মহাকাশের গভীরে তাকালে গ্যালাক্সি পর গ্যালাক্সির দেখতে পাই এবং আমরা সবাই জানি সেগুলোর সবকিছু তৈরি হয়েছে কিছু পরমাণু দিয়ে এবং সেই পরমাণুগুলো তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। তোমাদের নিশ্চয়ই জানার কৌতূহল হয় যে এই ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন কি সত্যিকারের মৌলিক কণা, নাকি সেগুলোও অন্যকিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে? এই তিনটি কণা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু কণা কি আছে? তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে এই মৌলিক বস্তুকণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে চার ধরনের বল দিয়ে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে যেগুলো হচ্ছে মহাকর্ষ বল, তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও সবল নিউক্লিয় বল। কিন্তু তোমরা কি জানো এই বলগুলো আসলে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে এক ধরনের শক্তি কণা বিনিময় করে? যার অর্থ এই ভৌতজগত তৈরি হয়েছে দুই ধরনের কণা দিয়ে, যেগুলো হচ্ছে বস্তুকণা এবং শক্তিকণা। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় বস্তুকণা এবং শক্তিকণার বিভাজন এবং ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটি হচ্ছে কণা পদার্থবিজ্ঞান। এই অধ্যায়ে আমরা সেই কণা পদার্থবিজ্ঞানের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় জগতের সঙ্গে তোমাদের একটুখানি পরিচয় করিয়ে দেব, তবে সেটি সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা পেতে হলে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের আরও অনেক গভীরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে বস্তুকণা এবং শক্তিকণা দিয়ে, বস্তুকণাকে বলা হয় 'ফার্মিওন' (Fermion) এবং শক্তিকণাকে বলা হয় 'বোজন' (Boson)। তাই আমরা বলতে পারি এই মহাবিশ্বের যে কোনো

১৯২১ সালে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, যেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কার্জন হল থেকে ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনকে তিনি একটি চিঠি লিখে জানান যে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের হিসাবে একটু গড়মিল আছে, হিসাবটা অন্যরকম হলে ভালো হতো। সেটি কেমন হওয়া উচিত তার ওপর তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই তরুণ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অনুরোধ করেন তার প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে একটি জার্নালে প্রকাশ করতে। আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ চিঠির জবাব দিয়ে সত্যেন বসুর ইংরেজি প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে একটি জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সত্যেন বসুর সেই কাজের কারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেক কণাকে তার নাম অনুসারে বোজন কণা ডাকা হয়।

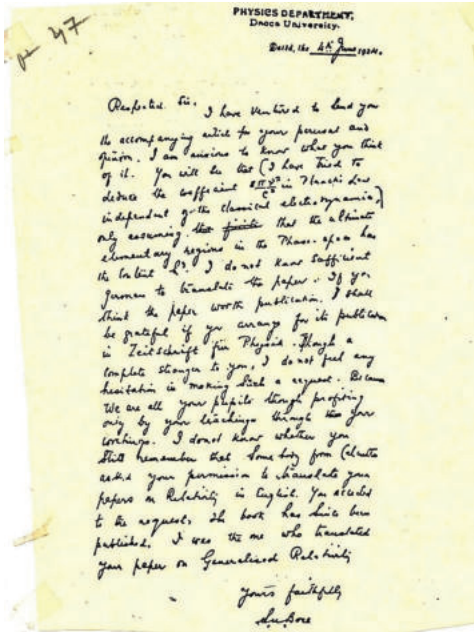
p 47

PHYSICS DEPARTMENT,
Dacca University.

Dated, the 4th June 1924.

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that (I have tried to deduce the coefficient $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ in Planck's Law independent of the classical electrodynamics) only assuming that the ultimate elementary regions in the Phase-space has the content h^3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because We are all your pupils though profiting only by your teachings through the writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S. N. Bose

একটি মৌলিক কণা নেয়া হলে মোটা দাগে সেটা হয় 'ফার্মিওন', না হয় 'বোজন' হবে। এই বোজন নামটা এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন বাঙালি অধ্যাপক সত্যেন বসুর (চিত্র ৩.৬) নাম থেকে, আর ফার্মিওন নামটা এসেছে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির (চিত্র ৩.৬) নাম থেকে। মৌলিক কণা ফার্মিওন এবং

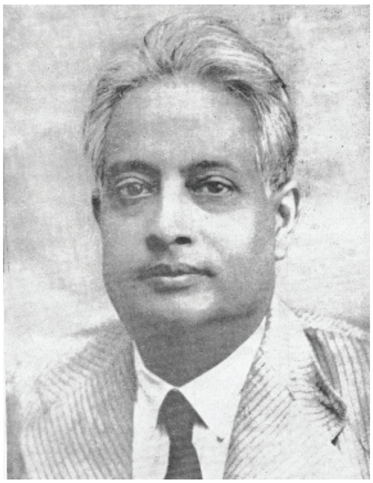

চিত্র ৩.৬ : সত্যেন বোস এবং এনরিকো ফার্মি

বোজনের অনেক বড়ো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যটি সহজভাবে বলতে হলে এভাবে বলা যায় : হুবহু একরকম কণা হলে যখন সেগুলো একসঙ্গে থাকতে পারে না তখন বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে ফার্মিওন। আর যখন হুবহু একরকম কণা একসঙ্গে থাকে তখন বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে বোজন। ইলেকট্রন হচ্ছে ফার্মিওন, তাই তোমরা যখন পরমাণুর গঠন পড়েছ তখন লক্ষ করেছ একটি শক্তিস্তরে

সবকটি ইলেকট্রনকে গাদাগাদি করে রাখা যায় না। ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ইলেকট্রন দিয়ে একটি শক্তিস্তর পূর্ণ হয়ে গেলেই অন্য ইলেকট্রনের জায়গা করে দেয়ার জন্য পরের শক্তিস্তরে চলে যেতে হয়। আবার আলোর কণা বা ফোটন হচ্ছে বোজন। ফোটন এক শক্তিস্তরে থাকতে পারে বলে এত তীব্র আলোর লেজার রশ্মি তৈরি করা সম্ভব হয়।

৩.২.১ পরমাণুই শেষ কথা নয়

পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বস্তুকণা ফার্মিওন আর শক্তিকণা বোজন দিয়ে তৈরি হয়েছে। ফার্মিওন নামের বস্তুকণাদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম কোয়ার্ক অন্য ভাগের নাম লেপটন। কোয়ার্ক হচ্ছে সেইসব ফার্মিওন যেগুলো সবল নিউক্লিয় বল অনুভব করে, আর যেগুলো নিউক্লিয় বল অনুভব করে না তারা হচ্ছে লেপটন। ইলেকট্রন হচ্ছে একটি লেপটন। পরমাণুর গঠন পড়ার সময় আমরা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটি মৌলিক কণার কথা পড়েছি। ইলেকট্রন সত্যি সত্যি লেপটন জাতীয় একটি মৌলিক কণা হলে প্রোটন ও নিউট্রন কিন্তু মৌলিক কণা নয়, সেগুলো তৈরি হয়েছে আপ কোয়ার্ক (u) ও ডাউন কোয়ার্ক (d) নামে দুই ধরনের কোয়ার্ক দিয়ে। আমরা জেনেছিলাম সকল পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। সেটি এবারে আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, সকল পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন এবং আপ কোয়ার্ক ও ডাউন কোয়ার্ক (e এবং u, d) দিয়ে। (এখানে জেনে রাখো এই কোয়ার্কের মাঝে কিন্তু কোনো কিছু উপরে (up) কিংবা নিচে (down) নেই, এটি শুধু খেয়ালি বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম।)

কোয়ার্ক যেরকম দুটি, লেপটনও কিন্তু দুটি। একটি হচ্ছে আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন অন্যটির নাম নিউট্রিনো। আমরা সাধারণভাবে নিউট্রিনোর কথা বলি না, কারণ এটি কোনোভাবে সাধারণ মানুষের চোখে দৃশ্যমান নয়, প্রতি সেকেন্ডে তোমার চোখের আইরিশের ভেতর দিয়ে দশ লক্ষ নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে তুমি কিন্তু ভুলেও সেটি কখনো টের পাও না। এর ভর বলতে গেলে নেই, এটি কোনো কিছুর সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া করে না, অবলীলায় এটি শোষিত না হয়ে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দীর্ঘ সীসার পাতের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। এটি ইলেকট্রনের সঙ্গে থাকা আরেকটি লেপটন, তাই তাকে ডাকা হয় ইলেকট্রন নিউট্রিনো এবং লেখা হয় ν_e হিসেবে। আমরা বোজন নামের শক্তি কণাদের মাঝে একটু পরে আসব, আপাতত ফার্মিওন কণার একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিখে ফেলি। এটি খুবই সহজ সরল :

ফার্মিওন		
কোয়ার্ক	u	আপ কোয়ার্ক
	d	ডাউন কোয়ার্ক
লেপটন	e	ইলেকট্রন
	ν_e	ইলেকট্রন নিউট্রিনো

এই বেলা তোমাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেওয়া যায়, সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটি বস্তুকণার একটি প্রতিকণা রয়েছে। একটি কণা এবং প্রতিকণা একত্র হলে দুটিই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শুধু তাই না শক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত পরিবেশে বস্তুকণা এবং তার প্রতিকণা তৈরি করা যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমান পরিমাণ বস্তুকণা এবং তাদের প্রতিকণা থাকার কথা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো জানেন না কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে শুধু বস্তুকণা দিয়ে। কিন্তু উপরের তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ফার্মিওনের এই পরিবারে তাদের প্রতিকণাগুলোও যোগ করতে হবে। কাজেই তালিকাটি হবে এরকম :

ফার্মিওন		
	পদার্থ	প্রতিপদার্থ
কোয়ার্ক	u	$\bar{u}$
	d	$\bar{d}$
লেপটন	e	$\bar{e}$
	ν_e	$\bar{\nu}_e$

উপরের কণাগুলো হচ্ছে বস্তুকণা, এদের ভেতর বল বা শক্তির বিনিময় করার জন্য তালিকাতে আমাদের শক্তিকণা বোজনগুলোও যুক্ত করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে :

বোজন		
তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল	γ	ফোটন
দুর্বল নিউক্লিয় বল	Z_0, W +, W_	জি নট, ডাব্লিউ প্লাস এবং ডাব্লিউ মাইনাস
সবল নিউক্লিয় বল	g	গ্লুওন
মহাকর্ষ বল	G	গ্রেভিটন

তোমরা এখানে আমাদের পরিচিত ফোটন বা আলোর কণাকে দেখছ এটি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তির দায়িত্বে আছে। জি নট (Z_0) এবং ডাবলিউ প্লাস এবং ডাব্লিউ মাইনাস (W_+, W_) হচ্ছে দুর্বল নিউক্লিয় শক্তির বাহক, গ্লুওন (g) হচ্ছে সবল নিউক্লিও বলের বাহক এবং গ্রেভিটন (G) হচ্ছে মহাকর্ষ বলের বাহক। এখানে উল্লেখ্য যে, এই তালিকার অন্য কণাগুলোর অস্তিত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেলেও গ্রেভিটনের অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

৩.২.২ স্ট্যান্ডার্ড মডেল (Standard Model)

কাজেই একজন মোটামুটি এই ভেবে আনন্দ পেতে পারত যে, মাত্র চারটি বস্তুকণা ফার্মিওন দিয়েই এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এত সহজ থাকেনি। দেখা গেল ফার্মিওনের যে পরিবারটির কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন কারণে সেটা যথেষ্ট নয়। ঠিক এ রকম আরও দুটো পরিবার দরকার। u, d, e, ν_e এর পরিবারটিকে প্রথম প্রজন্ম বলা হয়। এই প্রথম প্রজন্ম দিয়েই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু গঠিত হলেও প্রকৃতির রহস্য বোঝার জন্য আমাদের হুবহু এরকম আরও দুটি প্রজন্ম প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে : c, s, μ, νμ এবং t, b, τ, ν_τ

দ্বিতীয় প্রজন্ম		
কোয়ার্ক	c	চার্ম কোয়ার্ক
	s	স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক
লেপটন	μ	মিউওন
	ν_μ	মিউওন নিউট্রিনো

তৃতীয় প্রজন্ম		
কোয়ার্ক	t	টপ কোয়ার্ক
	b	বটম কোয়ার্ক
লেপটন	τ	টাও
	ν_τ	টাও নিউট্রিনো

এবং আলাদা করে লেখা না হলেও মনে রাখতে হবে, অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির প্রতিপদার্থ। আমরা যদি প্রতিপদার্থগুলো আলাদাভাবে না লিখি তাহলে ছোটো একটা ছকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মৌলিক কণাকে লিখে ফেলা যায় (চিত্র ৩.৭)। সংগত কারণেই তোমাদের মনে হতে পারে শক্তিকণা বোজনগুলোর প্রতিকণাগুলোকেও আমাদের তালিকায় নেওয়া দরকার। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বস্তুকণার ভেতরে বল বা শক্তি আদানপ্রদানকারী এই শক্তিকণা বোজনগুলোর কয়েকটি নিজেরাই নিজেদের প্রতিকণা, কয়েকটি একটি অন্যটির প্রতিকণা তাই তাদের আলাদা তালিকা করার প্রয়োজন হয়নি।

এই সকল কণা ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের যে মডেল দিয়ে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয় সেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল। তোমরা হয়তো পর্যায় সারণি সম্পর্কে জেনেছ। পর্যায় সারণিতে যেমন- মৌলিক পদার্থগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলেও একইভাবে একটি সারণিতে মৌলিক কণাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে এই কণাগুলোর ভর, চার্জ এবং আরও নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আলোচনাটুকু সহজ রাখার জন্য যেগুলো সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি।

এক সময়, পরমাণুকে অবিভাজ্য একক ভাবা হতো। পরবর্তী কালে ইলেকট্রন এবং পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের পর সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়। আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে নিউট্রন আবিষ্কারের

পরে, পদার্থবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন কণা পদার্থবিজ্ঞানের সব কণার কথা জানা হয়ে গেছে। এর পরের বছরগুলোতে শত শত পদার্থবিজ্ঞানী কেবলই কণাদের সিঁড়ি ভেঙে আরও গভীরে গিয়েছেন। কেউ এই কণাদের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করে তত্ত্ব দিয়েছেন, কেউ আবার ল্যাবরেটরিতে নতুন নতুন কণার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

চিত্র ৩.৭ : মৌলিক কণার স্ট্যান্ডার্ড মডেল

এখন পর্যন্ত যে কণাগুলোর কথা বলা হয়েছে তাদের ভর নির্ধারণ করার জন্য হিগস বোজন (Higgs Boson) নামে আরও একটি বোজনের (H) অস্তিত্ব পদার্থবিজ্ঞানীরা আগেই অনুমান করেছিলেন। অবশেষে 2013 সালে সার্ন নামের একটি গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন—যেটি এখন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তালিকায় (চিত্র ৩.৭) দেখানো হয়। হিগস বোজনের আবিষ্কার তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বড়ো একটি অর্জন।

৩.৩ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)

আইনস্টাইনের (চিত্র ৩.৮) বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে নিচের দুটি স্বীকার্য মেনে নিয়ে:

(১) সব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো একইরকম দেখাবে এবং
(২) সব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোয় আলোর গতিবেগ একই হবে

তোমরা যারা এই স্বীকার্য দুটি পড়েছ তাদের কাছে প্রথম স্বীকার্যটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে। পুরোপুরি স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো বলে কিছু নেই, সব প্রসঙ্গ কাঠামোর বেলাতেই একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা করে দুটি কাঠামোর আপেক্ষিক বেগ বের করতে হয়। পৃথিবী নিজেই সূর্যকে

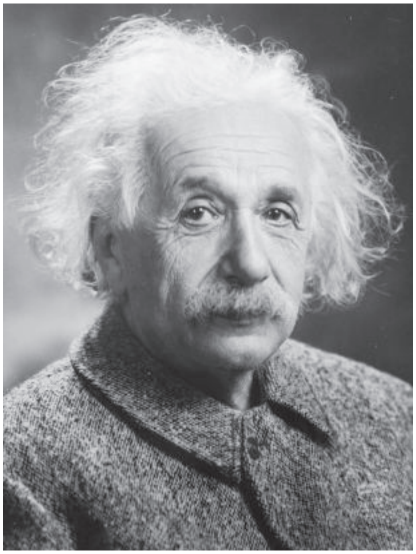

চিত্র ৩.৮ : আলবার্ট আইনস্টাইন

ঘিরে ঘণ্টায় প্রায় লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটে যাচ্ছে। কাজেই কোনো জড় প্রসঙ্গ কাঠামোই আসলে বিশেষ কোনো কাঠামো নয়, সবকটিই এক। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ কাঠামোতে ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে দ্বিতীয় স্বীকার্যটি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে না। একটা গাড়ি যদি ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার বেগে যায় আর তুমি যদি ঘণ্টায় 40 কিমি বেগে যাও, তাহলে তোমার মনে হবে অন্য গাড়িটি তোমার সাপেক্ষে 60 - 40 = 20 কিমি বেগে যাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বীকার্যটি বলছে অন্য কথা। আমরা জানি কেউ যদি তোমার দিকে একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে আলোক রশ্মি পাঠায় তোমার মনে হবে রশ্মিটি আলোর বেগে তোমার কাছে পৌঁছাচ্ছে। এখন তুমি নিজেই যদি আলোর অর্ধেক বেগে যেতে থাকো, তাহলে যদি আবার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে তোমার দিকে আলোক রশ্মি পাঠানো হয় তাহলে একইভাবে আলো তোমার কাছে অর্ধেক বেগে পৌঁছানো কথা, কিন্তু দ্বিতীয় স্বীকার্য বলছে তখনও আলোটি তোমার কাছে আলোর বেগেই পৌঁছাবে।

যাই হোক, আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য দুটি ব্যবহার করা হলে কী বিচিত্র ঘটনা ঘটতে থাকে এবারে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ দিই।

৩.৩.১ সময় প্রসারণ (Time Dilation)

ধরা যাক, তুমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছো এবং তোমার বন্ধু ট্রেনে বসে আছে, যার গতিবেগ v, তোমার বন্ধুর কাছে দুটি আয়না, একটি নিচে আরেকটি H উচ্চতায়; আলো নিচের আয়না থেকে উপরে এবং উপরের আয়না থেকে নিচে প্রতিফলিত হয় (চিত্র ৩.৯)। আলো নিচ থেকে উপরে (কিংবা উপর থেকে নিচে) যেতে t_o সময়ে ঘড়ির একটি ক্লিক হয়, অর্থাৎ এটাই তার ঘড়ি। তাহলে, $t_o = H/c$ যেখানে c হচ্ছে আলোর বেগ। তুমিও ঠিক করলে তুমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের ভেতরে তাকিয়ে ক্লিকগুলো মাপবে। ট্রেনটি যেহেতু v বেগে যাচ্ছে তাই তুমি অবশ্যই দেখবে 'তোমার' ঘড়ির প্রথম ক্লিকটি যখন ঘটেছে সেই t সময়ে উপরের আয়নাটি vt দূরত্বে সরে গেছে। কাজেই তোমার কাছে মনে হবে ঘড়ির ক্লিক হওয়ার সময় আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী সেটা হচ্ছে :

$$\sqrt{H^2 + v^2t^2}$$

আবার, আইনস্টাইন বলেছেন সব জায়গায় আলোর বেগ c সমান, তাই তোমার ঘড়ির এক ক্লিকের সময়কে যদি t বলি, তাহলে,

$$t = \frac{\sqrt{H^2 + v^2t^2}}{c}$$

অর্থাৎ $$t^2 = \frac{H^2}{c^2} + \frac{v^2 t^2}{c^2}$$

কিন্তু আমরা জানি, তোমার বন্ধুর ঘড়ির ক্লিক $t_o = H/c$, অর্থাৎ, $H^2/c^2 = t_o^2$

তাহলে লেখা যায় : $t^2 = t_o^2 + v^2t^2/c^2$

বা, $t^2 (1 - v^2/c^2) = t_o^2$

বা, $t^2 = t_o^2 / (1 - v^2/c^2)$

অর্থাৎ $$t = \frac{t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

এই নিরীহ সমীকরণটি আমাদের পরিচিত জগৎকে পুরোপুরি ওলটপালট করে দিয়েছে। আবার মনে করিয়ে দেই, এখানে t হচ্ছে তোমার ঘড়িতে মাপা সময় আর t_o হচ্ছে তোমার বন্ধুর ঘড়িতে মাপা সময়। তুমি স্থির দাঁড়িয়ে আছো এবং তোমার বন্ধু v বেগে যাচ্ছে, এটুকুই পার্থক্য।

এখানে, v -এর মান কম হলে t এবং t_o -এর মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু যদি আলোর বেগের কাছাকাছি হয় তাহলে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ঘটতে থাকে। যেমন- যদি $v = 0.99c$ হয় তাহলে

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 7t_0$$

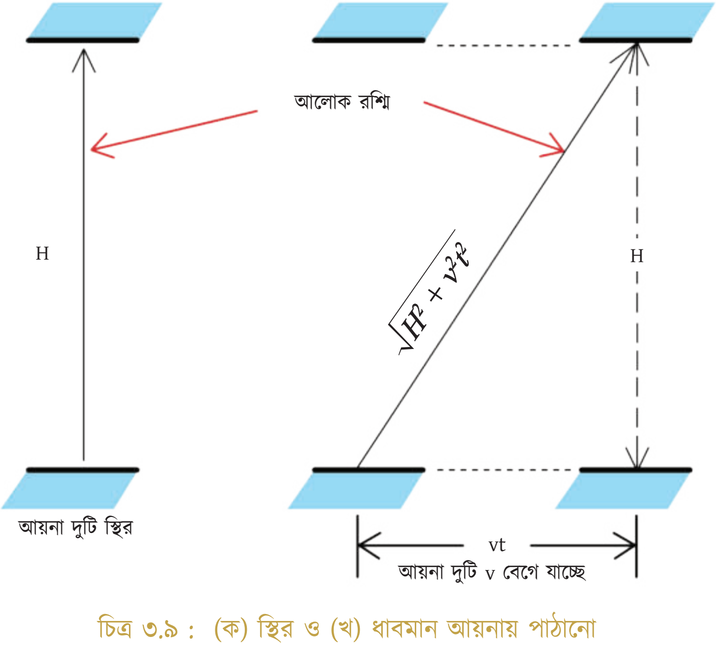

চিত্র ৩.৯ : (ক) স্থির ও (খ) ধাবমান আয়নায় পাঠানো আলোকরশ্মি

অর্থাৎ তোমার বন্ধু যদি 0.99c বেগে গতিশীল একটি ট্রেনে দশ বছর কাটায় (t_o = 10 বছর) তাহলে তার বয়স বাড়বে ঠিক দশ বছরই। কিন্তু, একই সময়ে তোমার বয়স বাড়বে ($t = 7t_o = 70$) সত্তর বছর। পনেরো বছরে রওনা দিয়ে সে পঁচিশ বছরের যুবক হিসেবে ফিরে এসে দেখবে তুমি পনের বছরে শুরু করে এর মাঝে পঁচাশি বছরের থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেছো।

তোমার তুলনায় তোমার বন্ধু v বেগে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার বন্ধুর তুলনায় তুমিও তো v বেগে যাচ্ছ। তাহলে উল্টোটা কেন সত্যি হয় না? অর্থাৎ, দশ বছর কাটিয়ে দিয়ে তুমি কেন আবিষ্কার করো না যে তোমার বয়স যখন দশ বছর বেড়েছে তখন তোমার বন্ধুর বয়স সত্তর বছর বেড়ে গেছে?

এটি আপেক্ষিক তত্ত্বে একটা অত্যন্ত মজার প্রশ্ন। কার বয়স বেড়েছে দেখার জন্য তোমার এবং তোমার বন্ধুর দেখা হতে হবে, দেখা না হলে তোমরা কখনওই জানবে না কার বয়স কত বেড়েছে। দেখা হতে হলে মাঝে একজনকে থামতে হবে এবং গতি পরিবর্তন করে ফিরে আসতে হবে। যে থামবে এবং গতি পরিবর্তন করবে তার সময় অতিক্রান্ত হবে কম। কেন সেটি হবে তার ব্যাখ্যাটি খুব কঠিন নয় কিন্তু আপাতত সেটি আমরা উপরের ক্লাসের জন্য রেখে দেই।

সময়ের প্রসারণের এই বিখ্যাত সমীকরণটি শুধু একটা মজার সূত্র হতে পারত কিন্তু এটা মোটেও সেটা হয়ে থাকেনি। বিজ্ঞানীরা এর অসংখ্য উদাহরণ দেখেছেন এবং এটি সত্যি।

৩.৩.২ স্থান সঙ্কোচন (Space Contraction)

তোমরা আগের পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় প্রজন্মের লেপটন হিসেবে মিউওনের কথা পড়েছ। বায়ুমণ্ডলে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 km উপরে কসমিক রে'র আঘাতে এই মিউওন কণার জন্ম হয় যেটার আয়ু মাত্র 2.2 মাইক্রো সেকেন্ড। এটি যদি প্রায় আলোর বেগেও (3×10^8 m/s) ছুটে আসে তাহলে এই সময়ে এটি মাত্র 0.66 km দূরত্ব অতিক্রম করবে, কোনোভাবেই পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারবে না।

কিন্তু আমরা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে মিউওন দেখে থাকি কারণ এটি আলোর বেগের কাছাকাছি (0.998c) বেগে ছুটে আসার কারণে সময় প্রসারণ ঘটে থকে। 2.2 মাইক্রো সেকেন্ড

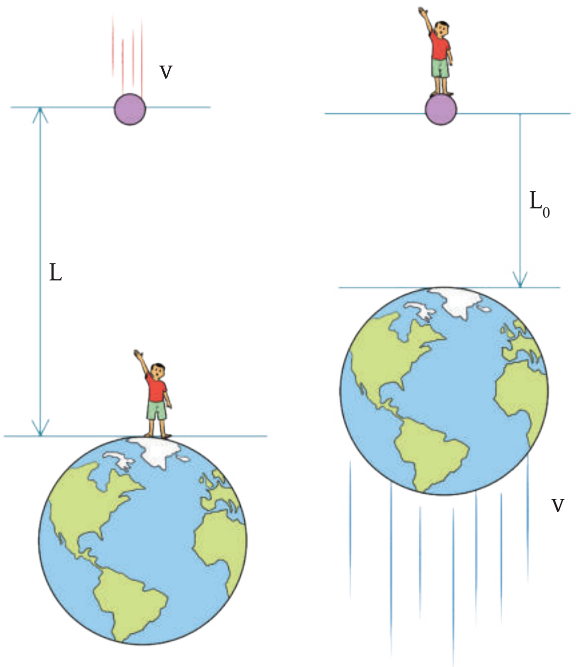

চিত্র ৩.১০ : স্থির পৃথিবী থেকে ছুটে আসা মিউওনকে মনে হবে v বেগে নিচে ছুটে আসছে। মিউওন থেকে মনে হবে পৃথিবীটাই মিউওনের দিকে v বেগে ছুটে আসছে।

সময় প্রসারিত হওয়ার কারণে তার মান হয় :

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2.2}{\sqrt{1 - 0.998^2}} = \frac{2.2}{\sqrt{0.004}} = \frac{2.2}{0.063} = 35\mu s$$

0.998c বেগে 35 মাইক্রো সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব 10.5 কিমি, যেটি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট।

মিউওনের পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে আসার ব্যাপারটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠের দূরত্ব L এবং তুমি তোমার ঘড়িতে একটি মিউওনকে t সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে দেখেছ (চিত্র ৩.১০) । কাজেই তোমার কাছে মনে হবে মিউওনের বেগ হচ্ছে :

$$v = L/t$$

আবার মিউওনের ঘড়িতে (!) মিউওনের মনে হবে সে নিজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীটাই v বেগে তার দিকে ছুটে আসছে (চিত্র ৩.১০) এবং t_0 সময়ে পৃথিবীটা তার কাছে পৌঁছে গেছে। মিউওনের যদি মনে হয় পৃথিবীটা L_0 দূরত্বে আছে তাহলে তার কাছে v বেগটা হচ্ছে :

$$v = L_0/t_0$$

দুটো বেগ সমান, কাজেই আমরা লিখতে পারি :

$$L/t = L_0/t_0$$

কিংবা $(t_0/t) = (L_0/L)$

অথবা $L_0 = L(t_0/t)$

কিন্তু আমরা জানি $t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

বা $\frac{t_0}{t} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

কাজেই $L_0 = L(t_0/t)$ সমীকরণে (t_0/t) -এর মান বসিয়ে আমরা পাই :

$$L_0 = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

লক্ষ করো, $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ -এর মান সবসময়েই 1 থেকে কম, কাজেই L_0 -এর মান সব সময়ই L থেকে কম। এখানে আমাদের স্থির অবস্থার সাপেক্ষে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য L (মিউওনের জন্য 10.5km) হলে আমাদের সাপেক্ষে v বেগে গতিশীল কাঠামো থেকে সেই দূরত্বটিকে মনে হবে L_0 (মিউওনের জন্য 0.63km)। কাজেই মিউওন যখন প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছিল, তার মনে হচ্ছিল সে বুঝি স্থির বরং পৃথিবীটাই প্রচণ্ড বেগে তার দিকে ছুটে আসছে। শুধু তা-ই না, সে কারণে বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, পুরো দূরত্বটাই সংকুচিত হয়ে ছোটো একটুখানি হয়ে গেছে। তাই মিউওন মাত্র 2.2 মাইক্রো সেকেন্ড বেঁচে থেকেই এই ছোটো দূরত্বটা অতিক্রম করে ফেলেছে।

৩.৩.৩ আপেক্ষিক ভরবেগ ও শক্তি (Mass & Energy)

আমরা সবাই জানি আমদের ত্রিমাত্রিক জগতে একটা বস্তুর অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে তিনটি মাত্রার জন্য তিনটি স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয়, একটি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে সেই তিনটি মাত্রার স্থানাংককে সাধারণত x, y এবং z দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এবারে তোমরা একটি বিস্ময়কর তথ্যের জন্য প্রস্তুত হও : আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বে দেখালেন, প্রকৃতিকে অনেক সহজে ব্যাখ্যা করা যায় যদি আমরা ত্রিমাত্রিক জগতটিকে চতুর্মাত্রিক জগৎ হিসেবে ধরে নিই, যেখানে চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে সময়। এই চতুর্মাত্রিক জগতে একটি বস্তুর অবস্থান শুধু তিনটি স্থানাংক দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয় না, তার সঙ্গে সময়টিকেও একটি মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কালে তোমরা এই নতুন উপলব্ধির কারণে কীভাবে বিজ্ঞানের জগৎটি শুধু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, অনেক নতুন বিজ্ঞানেরও জন্ম দিয়েছে সেগুলো জানার সুযোগ পাবে। আপাতত আমরা শুধু নতুন কয়েকটি পর্যবেক্ষণ তোমাদের জানিয়ে দিই, সেজন্য একটি স্থির কাঠামো এবং তার সাপেক্ষে একটি গতিশীল বস্তুর সঙ্গে যুক্ত আরেকটি কাঠামো কল্পনা করে নিই।

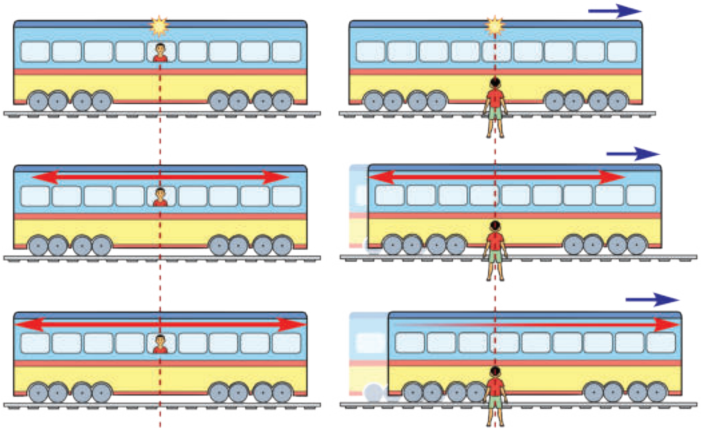

চিত্র ৩.১১ : বামদিকে চলন্ত ট্রেনের মাঝখানে বসে থাকা একজন যদি একসঙ্গে দুই পাশে দুটি আলোক রশ্মি ছাড়ে সে দেখবে দুটি আলোক রশ্মি একইসঙ্গে ট্রেনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। ডানপাশের ছবিতে, একজন বাইরে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের দিকে তাকালে দেখবে ট্রেনটি ডানদিকে সরে যাওয়ার কারণে আলোক রশ্মি বামদিকে আগে ট্রেনের শেষ প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে, এবং ডানদিকে পরে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

১। একটি কাঠামোতে যদি একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন অবস্থানে দুটি ঘটনা ঘটে তাহলে গতিশীল ভিন্ন কাঠামোতে মনে হবে ভিন্ন সময়ে দুটি (চিত্র ৩.১১) ঘটনা ঘটেছে।

২। একটি কাঠামোতে যদি একই অবস্থানে কিন্তু ভিন্ন সময়ে দুটি ঘটনা ঘটে তাহলে গতিশীল ভিন্ন কাঠামোতে মনে হবে ভিন্ন অবস্থানে দুটি ঘটনা ঘটেছে।

দেখতেই পাচ্ছ সময় সম্পর্কে আমাদের পূর্বের ধারণা আপেক্ষিক তত্ত্ব পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

তবে আপেক্ষিক তত্ত্বের কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি আগেই অনেকবার তোমাদের বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে :

$$E = mc^2$$

এখানে E হলো শক্তি, m হলো ভর, আর c হলো আলোর বেগের মান। অর্থাৎ, পদার্থের ভরকেও আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সেক্ষেত্রে অল্প একটুখানি ভর থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি তৈরি করা যায়। আপেক্ষিক সূত্রে একটুখানি গভীরে গেলেই এই সূত্রটিকে বের করে ফেলা যায় কিন্তু আমরা আপাতত সেটি না করে শধু সূত্রটি তোমাদের জানিয়ে রাখছি।

আপেক্ষিক তত্ত্বের এই আলোচনায় আমরা সব সময় সমবেগ ধরে নিয়েছি, কোনো ত্বরণ বিবেচনা না করে একটি বিশেষ অবস্থা কল্পনা করে নেওয়া হয় বলে এটিকে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (special theory of relativity) বলা হয়। যখন সমবেগের পরিবর্তে ত্বরণযুক্ত অবস্থা বিবেচনা করা হয় তখন সেটি হচ্ছে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (General theory of relativity)। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে, মহাবিশ্বের প্রসারণ বা ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব সবকিছু ব্যাখ্যা করে থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ৪
পদার্থের অবস্থা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ৪ পদার্থের অবস্থা

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ পদার্থের তিনটি অবস্থা
- ☑ কণার গতিতত্ত্ব
- ☑ ব্যাপন, নিঃসরণ
- ☑ মোমবাতির জ্বলন এবং মোমের তিনটি অবস্থা
- ☑ গলন ও স্ফুটন, পাতন ও ঊর্ধ্বপাতন

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের এই তিন অবস্থায় তাদের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে থাকে, ফলে তাদের ব্যবহারও তিন অবস্থায় ভিন্ন হয়। এই অধ্যায়ে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হবে।

৪.১ কণার গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory of Particles)

আমরা জানি যে, সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (অণু এবং পরমাণু) দ্বারা গঠিত। এই সমস্ত কণার গতিশক্তি তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পদার্থটি কোন অবস্থায় (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) থাকবে সেটি প্রভাবিত করে। পদার্থের এই কণাগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং সে কারণে কণাগুলোর মাঝে একধরনের আন্তঃকণা আকর্ষণ (আন্তঃআণবিক বা আন্তঃপারমাণবিক) শক্তি থাকে। কণাগুলোর গতিশক্তি এবং আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি দিয়ে পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায় এবং ব্যাখ্যা করার এই তত্ত্বকে কণার গতিতত্ত্ব (Kinetic theory of particles) বলা হয়।

কঠিন পদার্থে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি খুব বেশি থাকে। ফলে, কণাগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে খুব কাছাকাছি বা ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে এবং নিজেদের অবস্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারে না। যখন কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ দেওয়া হয়, তখন কণাগুলো তাপশক্তি গ্রহণ করে কাঁপতে (vibrate) থাকে। যখন আরও বেশি তাপ দেওয়া হয়, তখন কণাগুলো এত বেশি কাঁপতে থাকে যে সেগুলো আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে নিজেদের খানিকটা মুক্ত করে কিছুটা গতিশক্তি লাভ করে। পদার্থের এই অবস্থা হচ্ছে তরল অবস্থা। আমরা জানি যে, তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও নির্দিষ্ট আকার থাকে না। এই অবস্থায় তরল পদার্থকে আরও বেশি তাপ দিলে কণাগুলো তাপশক্তি গ্রহণ করে তাদের

গতিশক্তি বাড়াতে থাকে এবং এক সময় গতিশক্তি এত বেশি বেড়ে যায় যে, কণাগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি থেকে প্রায় মুক্ত (free) হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে শুরু করে। এই অবস্থায় তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় (চিত্র ৪.১)। আমরা জানি যে, গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আয়তন থাকে না, তাদেরকে যে পাত্রে রাখা হবে কণাগুলো সেই আয়তনের পাত্রে ছোটাছুটি করতে থাকে। গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর আরও তাপ প্রয়োগ করে হলে কণাগুলো তখন আরও বেশি জোরে ছুটতে থাকবে এবং কণাগুলোর গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

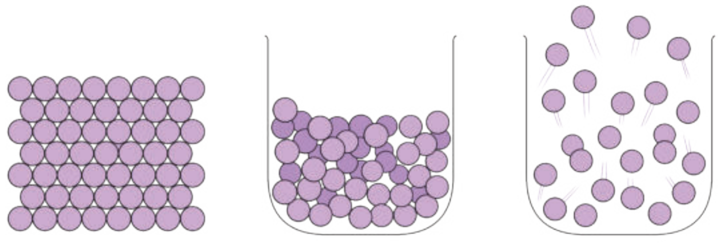
চিত্র ৪ .১: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়

৪.২ ব্যাপন (Diffusion)

কোনো পদার্থ যদি উচ্চ ঘনমাত্রায় থাকে, তখন সে পদার্থের কণাগুলো নিম্ন ঘনমাত্রার দিকে ধাবিত হতে চায়। কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের উচ্চ ঘনমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন ঘনমাত্রার স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে (চিত্র ৪.২)। ব্যাপন প্রক্রিয়ার জন্য পদার্থের ঘনমাত্রার পার্থক্য থাকতে হয়। ব্যাপন প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে আমরা পারফিউমের খোলা বোতলের কথা বলতে পারি। ঘরের এক কোনে একটি পারফিউমের খোলা বোতল রাখলে তার সুগন্ধ কিছুক্ষণের মাঝে ঐ ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাপনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তে যদি কম সময় লাগে তখন আমরা বলি তার ব্যাপন হার বেশি। আবার যদি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে তখন তার ব্যাপন হার কম। ব্যাপনের হার কণার আকার এবং ভরের উপরও নির্ভর করে। বড়ো আকারের কণার তুলনায় ছোটো কণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ছোটো কণার ব্যাপনের হার বড়ো কণার থেকে বেশি।

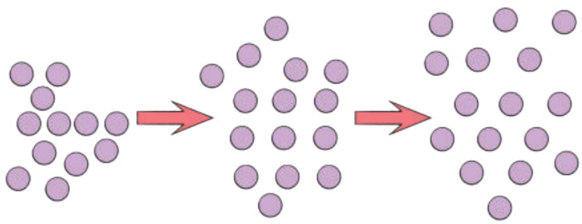
চিত্র ৪.২ : গ্যাসের ব্যাপন প্রক্রিয়া

কঠিন পদার্থের ব্যাপন প্রক্রিয়া :

তুমি যদি একটি কাপে গরম পানি নিয়ে তাতে টিব্যাগ ডুবাও, তাহলে দেখতে পাবে টিব্যাগ থেকে নির্গত কালচে লাল রঙের চায়ের নির্যাস বা লিকার বের হয়ে ধীরে ধীরে কাপের পানির মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। (চিত্র ৪.৩) কিছুক্ষণ পর তুমি যখন টিব্যাগটি কাপ থেকে তুলে আনবে, তখন দেখতে পাবে

যে, কাপের পুরো পানির রং কালচে-লালের মতো হয়েছে, অর্থাৎ টিব্যাগে থাকা চায়ের পাতার রং ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাপের পুরো পানির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কাপে গরম পানি ব্যবহার করার কারণে ব্যাপনের হার বেশি, তুমি যদি কাপে ঠান্ডা পানি নিয়ে তাতে টিব্যাগ ডুবিয়ে রাখ, তাহলে দেখবে লিকার অনেক আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে। গরম পানির ক্ষেত্রে চায়ের নির্যাসের কণাগুলো পানি থেকে তাপ গ্রহণ করে অধিক গতিশক্তি লাভ করে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কম তাপমাত্রায় যেটি অনেক ধীর গতিতে ঘটে।

চিত্র ৪.৩ : পানিতে চায়ের নির্যাসের ব্যাপন

তরল পদার্থের ব্যাপন প্রক্রিয়া :

তোমরা একটি গ্লাস, কিংবা স্বচ্ছ কোনো পাত্রে কিছু পরিমাণ পানি নিয়ে যদি ড্রপার দিয়ে এক দুই ফোঁটা নীল রঙের ফুড কালার দাও তাহলে দেখবে নীল রংটি গ্লাসের পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে (চিত্র ৪.৪)। ধীরে ধীরে সমস্ত পানির রং নীল রঙে পরিণত হবে, অর্থাৎ নীল ফুড কালারের কণাগুলো ব্যাপনের মাধ্যমে বিকারের সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়বে। শীতল পানিতে প্রক্রিয়াটি হবে ধীরে ধীরে কিন্তু গরম পানি নিলে সেটি ঘটবে খুব দ্রুত।

চিত্র ৪.৪ : পানিতে নীল রঙের দ্রবণের ব্যাপন

দুটি গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপন :

তোমাদের বলা হয়েছে যে গ্যাসের কণা যদি ছোটো হয় তাহলে ব্যাপনের হার বেশি হয়। প্রকৃত ল্যাবরেটরির নিরাপদ পরিবেশে একটি পরীক্ষায় এটি দেখানো হয়ে থাকে (চিত্র ৪.৫)। এই পরীক্ষাটির জন্য দুই মুখ খোলা একটি লম্বা কাচনল নেয়া হয়। তারপর ছবিতে দেখানো উপায়ে এক খণ্ড তুলাকে ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) দ্রবণে ভিজিয়ে লম্বা কাচনলের এক মুখে লাগানো অপর এক খণ্ড তুলা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) দ্রবণে ভিজিয়ে কাচনলটির অন্য মুখে লাগানো হয়। তখন HCl দ্রবণে ভেজানো তুলা থেকে HCl গ্যাস ও NH_4OH দ্রবণে ভেজানো তুলা থেকে NH_3 গ্যাস বের

চিত্র ৪.৫ : দুটি গ্যাসের (HCl ও NH3 গ্যাস) ব্যাপন

হবে এবং কাচনলের ভেতরে তাদের ব্যাপন শুরু হবে।

কিছুক্ষণ পর HCl গ্যাস ও NH_3 গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) উৎপন্ন করতে শুরু করবে যেটি কাচনলের ভেতর সাদা ধোঁয়া হিসেবে দেখা যাবে। তবে দেখা যাবে যে, সাদা ধোঁয়া কাচনলের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে নেই, এটি NH_4OH দ্রবণে ভেজানো তুলা থেকে দূরে এবং HCl দ্রবণে ভেজানো তুলার কাছাকাছি অবস্থান করছে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে NH_3 গ্যাস HCl গ্যাসের তুলনায় দ্রুত ছড়িয়ে বেশি দূরত্ব অতক্রম করেছে। NH_3 গ্যাসের আণবিক ভর 17 এবং HCl গ্যাসের আণবিক ভর 36.5 তাই NH_3 গ্যাসের ব্যাপন হার HCl গ্যাসের ব্যাপন হার থেকে বেশি এবং এই গ্যাস বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

৪.৩ নিঃসরণ (Effusion)

নিঃসরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো পাত্রে থাকা গ্যাস সরু ছিদ্রপথ দিয়ে পাত্রের ভিতরের উচ্চচাপের স্থান থেকে পাত্রের বাইরে নিম্নচাপের স্থানের দিকে সজোরে বেরিয়ে আসে (চিত্র ৪.৬)। এই ধরনের সরু ছিদ্রকে অনেক সময় পিনহোল (pinhole) বলা হয়। এভাবে পাত্র থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে পাত্রের ভিতরের এবং বাইরের চাপের পার্থক্য। ব্যাপনের বেলাতে এটি ঘটে গ্যাসের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে কিন্তু নিঃসরণের বেলায় এটি ঘটে গ্যাসের চাপের কারণে। অর্থাৎ ব্যাপনের ক্ষেত্রে চাপের কোনো প্রভাব নেই কিন্তু নিঃসরণের বেলায় চাপের প্রভাব আছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, ব্যাপনের ক্ষেত্রে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ উপযুক্ত মাধ্যমে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু নিঃসরণের ক্ষেত্রে শুধু গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় মাধ্যমে সরু ছিদ্রপথ দিয়ে বেশ বেগে বের হয়ে আসে।

এবার নিঃসরণের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। ফুলানো বেলুনে একটি সূক্ষ্ম ফুটো করতে পারলে বেলুনের ভেতরের উচ্চ চাপে থাকা বাতাস সেই ছিদ্রপথে নিঃসরণের মাধ্যমে সবেগে বের হয়ে আসবে। ফুলানো বেলুনে ফুটো করার চেষ্টা করলে টানটান হয়ে থাকা বেলুনটি ফুটোর চারপাশে খুব দ্রুত সরে

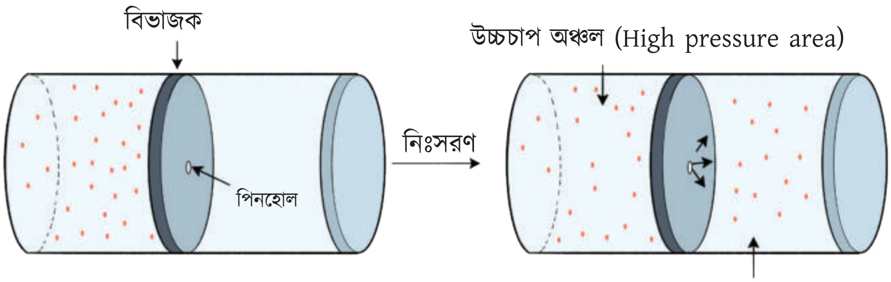

চিত্র ৪.৫ : দুটি গ্যাসের (HCl ও NH_3 গ্যাস) ব্যাপন

গিয়ে ফুটোটিকে বড়ো করে ফেলতে চায় বলে বেলুনটি ফেটে যায়। যেখানে ফুটো করা হবে সেখানে এক টুকরো স্কচ টেপ লাগিয়ে তার উপর আলপিন দিয়ে ফুটো করা হলে বেলুনটি আর ফেটে যাবে না। তখন বেলুন থেকে বাতাস ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে বেলুনটি চুপসে যাবে। বেলুনের ভেতর বাতাসের চাপ, বেলুনের বাইরের বাতাসের চাপ থেকে বেশি বলে উচ্চচাপের কারণে ফুটো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের বাতাস অপেক্ষাকৃত নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে নিঃসরণ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিঃসরণের আরও উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন- আমরা বিভিন্ন যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে সিএনজি (CNG: Compressed Natural Gas) ব্যবহার করে থাকি। সিএনজি হচ্ছে মূলত উচ্চচাপে সংকুচিত মিথেন (CH_4) গ্যাস। এক্ষেত্রে যানবাহন চালানোর সময় সিএনজি সিলিন্ডার থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরিত হয়ে গাড়ি বা যানবাহনের ইঞ্জিনে প্রবেশ করে। আবার আমরা আমাদের বাসাতেও অনেক সময় রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে সিলিন্ডারে রক্ষিত গ্যাস ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে, আসলে প্রোপেন (C_3H_8) ও বিউটেন (C_4H_{10}) গ্যাসকে উচ্চচাপে সংকুচিত করে তরল অবস্থায় সিলিন্ডারে ভর্তি করে রাখা হয়। গ্যাসের চুলা জ্বালানোর সময় সিলিন্ডারের মুখ খুলে দেওয়া হলে এটি গ্যাসে পরিণত হয়ে সবেগে বের হয়ে আসে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও নিঃসরণ ঘটে থাকে।

৪.৪ পাতন এবং ঊর্ধ্বপাতন (Distillation and Sublimation)

৪.৪.১ পাতন (Distillation):

তোমরা জানো যে, তরল পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই কেতলিতে পানি গরম করার সময় পানিকে বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যেতে দেখেছ। আবার, বাষ্পকে শীতল করলে তা তরলে পরিণত হয়, যাকে আমরা ঘনীভবন বলি। শীতল করে রাখা কোমল পানীয়ের বোতলের গায়ে আমরা ছোটো ছোটো জলকণা দেখি, এখানে জলীয় বাষ্প তার তাপশক্তি নির্গত করে ঠান্ডা হয়ে পানির কণায় পরিণত হয়। এটি ঘনীভবনের উদাহরণ।

অন্যদিকে পাতন হচ্ছে কোনো তরলকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করে তাকে পুনরায় শীতলীকরণের মাধ্যমে তরলে পরিণত করার প্রক্রিয়া (চিত্র ৪.৭)। সুতরাং, পাতনকে নিম্নোক্তভাবে বলা যায় :

পাতন = বাষ্পীভবন + ঘনীভবন = (Distillation = Vaporization + Condensation)

উল্লেখ্য যে, পাতন প্রক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না। কোনো মিশ্রণে একাধিক উপাদান থাকলে সে মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহকে বিশুদ্ধভাবে পেতে পাতন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, এটি হচ্ছে মিশ্রণ থেকে কোনো উপাদানকে পৃথকীকরণ পদ্ধতি।

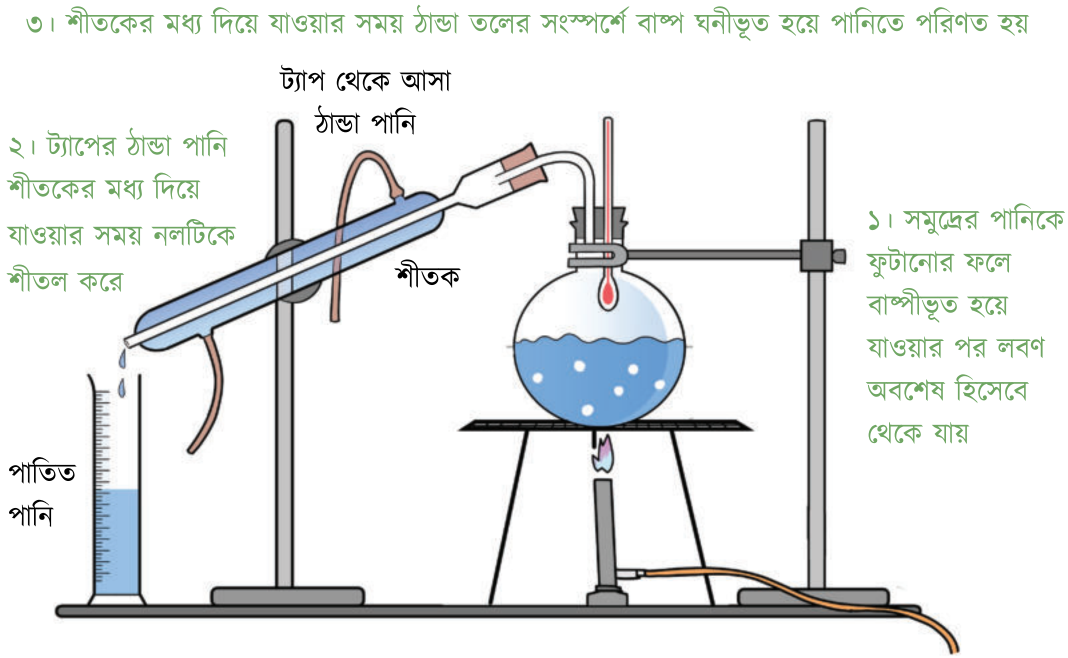

চিত্র ৪.৭ : ল্যাবরেটরিতে পাতনের পরীক্ষা

ল্যাবরেটরির নিরাপদ পরিবেশে যথাযথ পাত্র ব্যবহার করে পাতনের পরীক্ষা করা যায়। যেমন- পানিতে অপদ্রব্য মেশানো থাকলে পাতনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানিকে আলাদা করে নেওয়া যায়। রাসায়নিক শিল্প কলকারখানাতেও ব্যাপকভাবে পাতন ব্যবহার করা হয়। যেমন- তেলের খনি থেকে যে অপরিশোধিত তেল (Crude oil) উত্তোলন করা হয় সেগুলো পাতনের মাধ্যমে পরিশোধন করা হয় (চিত্র ৪.৮)। শুধু তাই নয় ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় অপরিশোধিত তেল থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যকে আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিকে আংশিক পাতন (fractional distillation) বলা হয়।

৪.৪.২ ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) :

ঊর্ধ্বপাতন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে সেটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। তোমরা হয়তো সবাই ন্যাপথালিনের নাম শুনেছ বা দেখেছ। কাপড়কে পোকা থেকে রক্ষা করতে ন্যাপথালিন ব্যবহার করা হয়। এই ন্যাপথালিনকে তাপ দিলে সেটি প্রথমে তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। ড্রাই আইস (Dry ice) হচ্ছে হিমায়িত কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি কঠিন রূপ। ড্রাই আইস বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় তার কঠিন অবস্থা থেকে অধিক স্থিতিশীল। এটি যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন সেটি কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এটিও ঊর্ধ্বপাতনের আরেকটি উদাহরণ।

এছাড়া, নিশাদল (NH_4Cl), কর্পূর ($C_{10}H_{16}O$), আয়োডিন (I_2), অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$), এই

পদার্থগুলোকে তাপ দিলে সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। এই পদার্থগুলোকে ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ বলা হয়। ল্যাবরেটরির যথাযথ নিরাপদ পরিবেশে নিচের এই সহজ পরীক্ষাটি দিয়ে খুব সহজে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায় (চিত্র ৪.৯)। একটি বিকারে কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) নিয়ে বিকারের খোলা মুখটি একটি কাচের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর কাচের ঢাকনার উপর কিছু বরফখণ্ড রাখা হয় যেন বাষ্পীকৃত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ঠান্ডা হয়ে ঢাকনার নিচে জমা হতে পারে। এবার বিকারে তাপ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে কঠিন অবস্থার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। এই বাষ্পীকৃত বা গ্যাসীয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উপরে উঠে কাচের ঢাকনায় গিয়ে শীতল হয়ে পুনরায় কঠিন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হিসেবে ঢাকনার নিচে জমা হতে থাকবে।

কোনো কঠিন পদার্থের মিশ্রণের মধ্যে যদি একটি ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহলে ঐ ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থকে মিশ্রণ থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। যেমন- খাবার লবণের ($NaCl$) সঙ্গে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) বা নিশাদল মিশ্রিত থাকলে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় নিশাদলকে আলাদা করা যাবে।

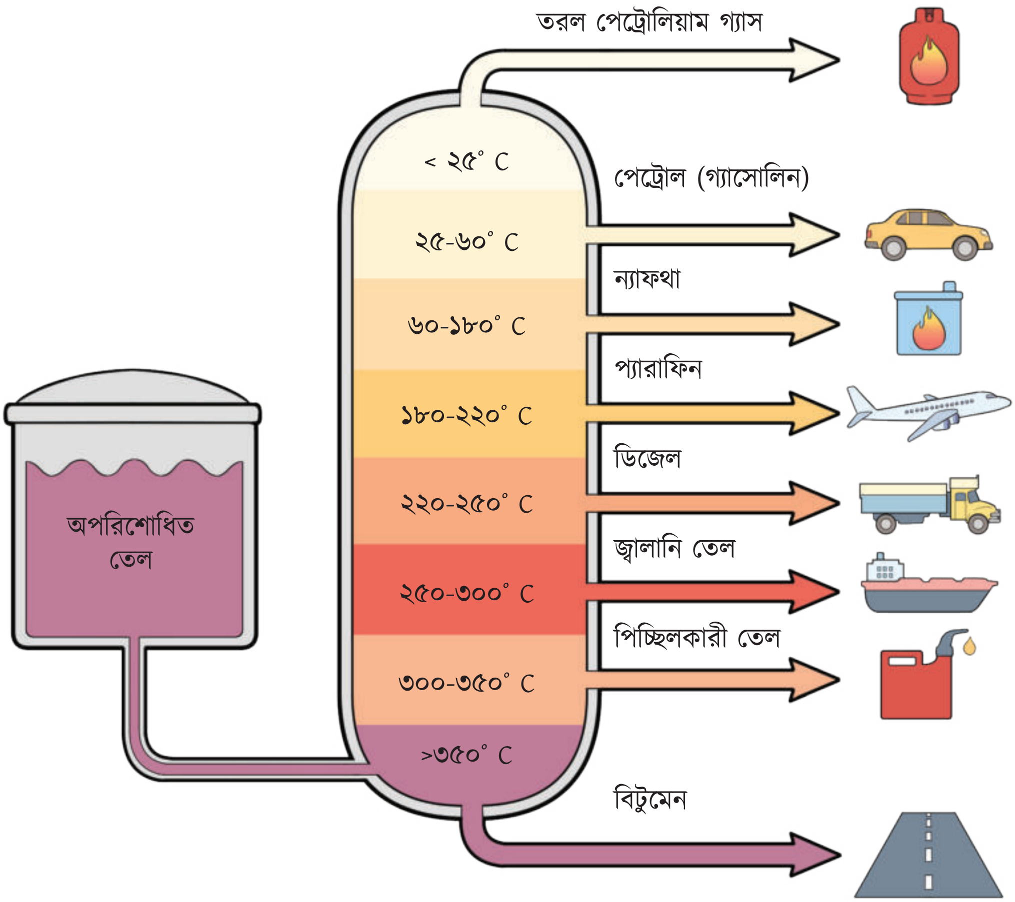

চিত্র ৪.৮ : তেল পরিশোধনাগারে আংশিক পাতনের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের নিষ্কাশন।

আবার, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ থেকে ঊর্ধ্বপাতন পদ্ধতিতে আয়োডিনকে আলাদা করা যায়। আমরা ইতিমধ্যে জানি যে, কঠিন অবস্থায় ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তা সহজেই বাষ্পীভূত বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কাজেই আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণে তাপ প্রয়োগ করলে আয়োডিন সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। আবার ঐ বাষ্পকে ঠান্ডা করলে তা কঠিন আয়োডিনে পরিণত হবে।

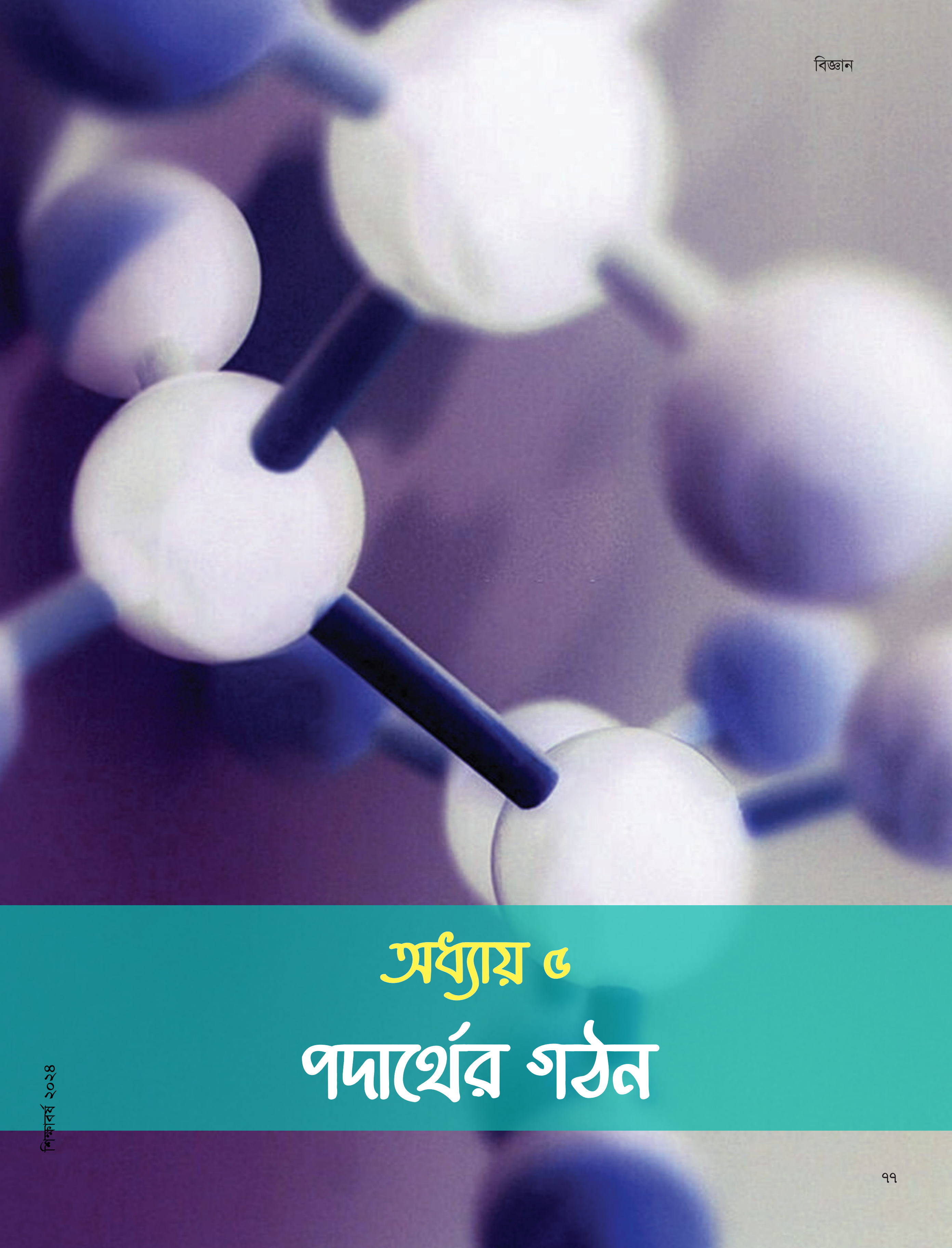

অধ্যায় ৫
পদার্থের গঠন

অধ্যায় ৫ পদার্থের গঠন

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ পরমাণুর কণাসমূহ, রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল, বোরের পরমাণু মডেল
- ☑ পরমাণুর শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস
- ☑ পারমাণবিক ভর অথবা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর
- ☑ আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ থেকে মৌলের আপেক্ষিক ভর নির্ণয়
- ☑ মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয়

৫.১ পরমাণুর কণাসমূহ

তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছু ধারণা পেয়েছ, তোমরা জানো যে, পরমাণু মূলত তিনটি কণা দিয়ে তৈরি, এই কণাগুলো হচ্ছে- ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রন। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন আর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান থাকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রন সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

ইলেকট্রন (Electron)

ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন হলো পরমাণুর একটি মূল কণিকা যার চার্জ -1.602×10^{-19} কুলম্ব (Coulombs)। জে জে থমসনকে (J. J. Thomson) ইলেকট্রন আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়, কারণ, তিনিই প্রথম ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ নির্ভুলভাবে বের করেছিলেন। নিচে ইলেকট্রনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১) একটি ইলেকট্রনের ভর 9.109×10^{-31} kg যা একটি প্রোটনের ভরের 1837 গুণ কম, তাই নিউট্রন ও প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর বিবেচনা না করলে খুব ক্ষতি হয় না।

২) ইলেকট্রনের আপেক্ষিক চার্জ -1 ধরা হয়। ইলেকট্রনকে সাধারণত e প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

প্রোটন (Proton)

প্রোটন হলো ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জযুক্ত পরমাণুর একটি মূল কণিকা যার চার্জ বা আধানের পরিমাণ $+1.602 \times 10^{-19}$ কুলম্ব। প্রোটন আবিষ্কারের কৃতিত্ব আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) কে দেওয়া হয়। নিচে প্রোটনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো :

১) একটি প্রোটনের ভর 1.673×10^{-27} kg।

২) হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে তার ইলেকট্রনটি অপসারণের মাধ্যমে প্রোটন পাওয়া যায়।

৩) প্রোটনের আপেক্ষিক চার্জ হলো +1 এবং আপেক্ষিক ভর +1 ধরা হয়। প্রোটনকে p প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

নিউট্রন (Neutron)

1932 সালে জেমস চ্যাডউইক (James Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। শুধু হাইড্রোজেন ছাড়া সকল মৌলের পরমাণুতেই নিউট্রন রয়েছে। নিউট্রন সম্বন্ধে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) একটি মৌলের দুটি ভিন্ন আইসোটোপের ভর তাদের নিজ নিজ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউট্রনের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে ভিন্ন হয়।

২) একটি নিউট্রনের ভর হলো 1.675×10^{-27}kg যা একটি প্রোটনের ভরের চেয়ে সামান্য বেশি।

৩) নিউট্রনের আপেক্ষিক আধান বা চার্জ 0 এবং আপেক্ষিক ভর 1 ধরা হয়। নিউট্রনকে n প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৪) নিউট্রনের একটি অত্যন্ত বিচিত্র ধর্ম আছে। এটি যখন নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটনের সঙ্গে থাকে তখন এটি স্থিতিশীল, কিন্তু যদি মুক্ত অবস্থায় থাকে তখন অস্থিতিশীল, 10 মিনিটের ভেতর এটি একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনোতে বিভাজিত হয়ে যায়।

৫.২ পরমাণুর মডেল (Atomic model)

পরমাণু মডেলের ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ধারণা পেয়েছ। কোয়ান্টাম মেকানিকস গড়ে ওঠার পর প্রথমবার পরমাণুর গঠন সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করা

সম্ভব হয়েছে। এটি বিজ্ঞানের অনেক বড়ো একটি সাফল্য কিন্তু এটি একদিনে হয়ে উঠেনি, অসংখ্য বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। দুটি প্রচেষ্টার কথা আলাদাভাবে বলা সম্ভব, তার একটি হচ্ছে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অন্যটি বোরের পরমাণু মডেল।

৫.২.১ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

পরমাণুর মাঝে বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন ও প্রোটন রয়েছে সেটি বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন কিন্তু সেটি কীভাবে রয়েছে জানতেন না। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রথম এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর দেওয়া মডেলটি রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল নামে পরিচিত (চিত্র ৫.১)। মডেলটি এরকম :

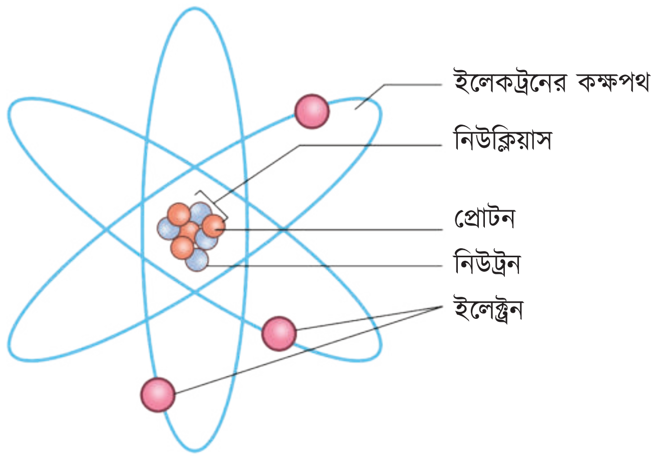

চিত্র ৫.১ : রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

১) একটি পরমাণুর ধনাত্মক চার্জ এবং পরমাণুটির অধিকাংশ ভর পরমাণুর কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত থাকে যাকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন ও নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন থাকে। যেহেতু আপেক্ষিকভাবে ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত কম, তাই নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের ভরই পরমাণুর ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২) নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পরমাণুর অভ্যন্তরে অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা।

৩) রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল প্রস্তাব করেছিল যে, কেন্দ্রের ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জের চারদিকে তার আকর্ষণ বলের কারণে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান থাকে। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনের এইভাবে ঘূর্ণনকে তিনি সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর ঘূর্ণায়মান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন। অর্থাৎ, ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে।

সৌরজগতের সঙ্গে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলকে তুলনা করার কারণে এই মডেলকে সোলার সিস্টেম মডেল বা সৌর মডেলও বলা হয়। আবার এই মডেলের মাধ্যমে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের ধারণা প্রবর্তন করেন, তাই এ মডেলকে নিউক্লিয়ার মডেলও বলা হয়।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা :

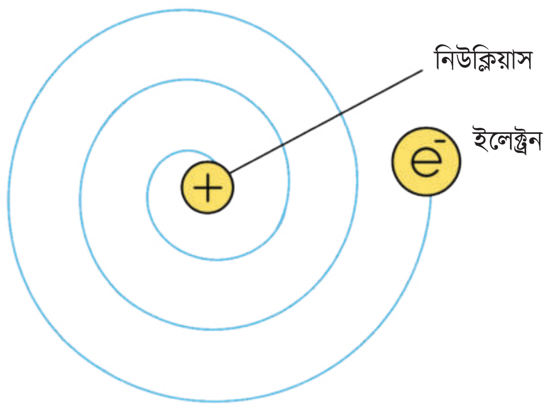

চিত্র ৫.২ : ইলেকট্রন শক্তি হারিয়ে নিউক্লিয়াসে পতিত হচ্ছে

পরমাণুর কেন্দ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি নিউক্লিয়াসের অস্তিত্বের ধারণাটি পরমাণুর গঠনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। তখন পর্যন্ত কোয়ান্টাম মেকানিক্স গড়ে উঠেনি বলে তার মডেল পরমাণুর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এই মডেলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান থাকে কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব (Maxwell's theory) অনুযায়ী ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনের সময় ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকবে। ফলে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনপথও ছোটো হতে থাকবে এবং এক সময় সেটি নিউক্লিয়াসে পড়ে যাবে (চিত্র ৫.২)। এ থেকে বুঝা যায় যে এই মডেলে পরমাণু স্থিতিশীল হবে না। তাছাড়া এই মডেলটি ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, আকৃতি কিংবা পরমাণুতে ইলেকট্রনের বিন্যাস সম্পর্কে সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারেনি।

৫.২.২ বোরের পরমাণু মডেল

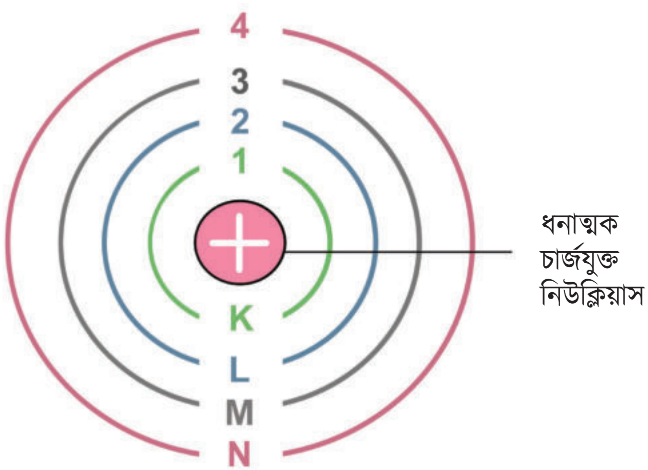

চিত্র ৫.৩ : বোরের পরমাণু মডেল : K, L, M, N শেল দেখানো হয়েছে।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নীলস বোর (Niels Bohr) রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো সমাধান করে একটি পরমাণু মডেল প্রস্তাব করেছিলেন। তখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রাথমিক ধারণাগুলো বিজ্ঞানীরা জানতে শুরু করেছিলেন এবং সেগুলো ব্যবহার করে এই মডেলটি দেওয়া হয়েছিল। বোরের পরমাণু মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১) পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইচ্ছেমতো যে কোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না, শুধু নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে থাকে। এই স্থিতিশীল কক্ষপথে ঘোরার সময় ইলেকট্রনগুলো কোনো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না।

২) এই স্থিতিশীল কক্ষপথকে n সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যেখানে n -এর মান 1, 2, 3, 4... ইত্যাদি। এই কক্ষপথগুলোকে K, L, M, N শেল (shell) হিসেবেও বলা বলা হয় (চিত্র ৫.৩)। এগুলোকে কক্ষপথ বা শক্তিস্তর হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়। উল্লেখ্য যে, শক্তিস্তরে n -এর মান কম সেটিকে নিম্ন শক্তিস্তর বলা হয়। আর n -এর মান বেশি হলে সেটি উচ্চ শক্তিস্তর হিসেবে পরিচিত।

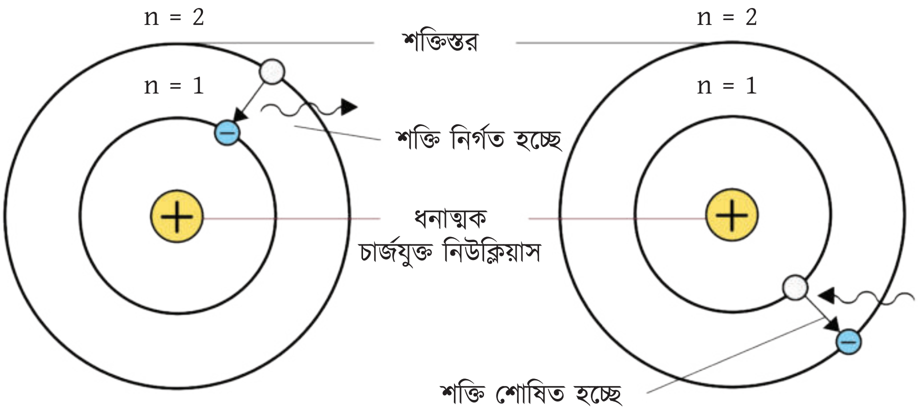

চিত্র ৫.৪ : বোরের পরমাণু মডেল। প্রধান শক্তিস্তর (n), ইলেকট্রন এক শক্তিস্তর থেকে আরেক শক্তিস্তরে যাওয়ার ফলে শক্তি শোষণ বা শক্তি নির্গমন দেখানো হয়েছে।

৩) কোনো প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের সময় কোনো শক্তি শোষিত বা বিকিরিত হয় না। বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করা হলে সেই শক্তি শোষণ করে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে যায় (চিত্র ৫.৪)। আবার যদি ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে যায়, তখন শক্তি বিকিরিত হয়। এই শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ (ΔE) যেটি দুটি শক্তিস্তরের (E_1, E_2) শক্তির মধ্যে পার্থক্যের সমান এবং এটি প্লাঙ্কের সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমীকরণটি এরকম :

$$\Delta E = E2 - E1 = h\nu$$

এখানে, ΔE হচ্ছে শোষিত বা নির্গত শক্তি, h হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক (6.626×10^{-34} m^2kg/s), ν হচ্ছে নির্গত বা শোষিত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সি। বোরের মডেল হাইড্রোজেন (H) মৌল থেকে নির্গত এই শক্তি দিয়ে সৃষ্ট আলোর পারমাণবিক বর্ণালি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল।

বোরের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা

বোর পরমাণু মডেলের অসামান্য সাফল্য থাকলেও তার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এটি এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারলেও একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। বোরের পরমাণু মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রন যদি এক শক্তিস্তর থেকে অন্য আরেকটি শক্তিস্তরে গমন করে, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির কারণে পারমাণবিক বর্ণালিতে একটিমাত্র রেখা পাওয়ার কথা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি রেখা আসলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমষ্টি, অর্থাৎ একটি মাত্র নির্গত শক্তি না থেকে কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন কিছু শক্তি রয়েছে যার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

৫.৩ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস (Electronic configuration of atoms)

রাদারফোর্ড এবং বোরের মডেল, তার সঙ্গে অসংখ্য বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে পরমাণুর গঠনে এবং পরমাণুতে কী কারণে কীভাবে ইলেকট্রনের বিন্যাস হয় সেই রহস্য উন্মোচিত হয়। তোমাদের আগেই বলা হয়েছে সেজন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্য নিতে হয়েছিল, তোমরা যারা বড়ো হয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা সেই রহস্যময় জগতে উঁকি দিয়ে পুরো বিষয়টি সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে। কিন্তু এখন নিয়মগুলো কীভাবে এসেছে না জেনে শুধু ব্যবহার করে পরমাণুতে ইলেকট্রন কীভাবে বিন্যস্ত হয় সেটি জেনে নিতে পারো।

পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়মসমূহ সম্পর্কে তোমরা আগের শ্রেণিতে কিছুটা ধারণা পেয়েছ। তোমরা জানো যে, বোরের পরমাণু মডেলে পরমাণুর যে শক্তিস্তরের কথা বলা হয়েছে তাকে প্রধান শক্তিস্তর বলে এবং একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রধান শক্তিস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হলো $2n^2$ (এখানে $n = 1, 2, 3, 4...$ইত্যাদি হলো কক্ষপথের ধারাবাহিক সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট কক্ষপথগুলো K, L, M, N নামেও পরিচিত) । অর্থাৎ $n = 1$ হলে, $2n^2 = 2 \times (1)^2 = 2$; তার মানে প্রথম কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে (K কক্ষপথ বা শেল) সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। সেভাবে $n = 2$ হলে, $2n^2 = 2 \times (2)^2 = 8$ তার মানে দ্বিতীয় কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে (L কক্ষপথ বা শেল) সর্বোচ্চ আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। এভাবে তোমরা পরের শক্তিস্তরগুলোতে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে সেটি বের করে ফেলতে পারবে। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিচের টেবিলে বিভিন্ন শক্তিস্তরে কিছু মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেওয়া হয়েছে।

ছক : মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	n = 1 K সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন	n = 2 L সর্বোচ্চ ৪টি ইলেকট্রন	n = 3 M সর্বোচ্চ 18টি ইলেকট্রন	n = 4 N সর্বোচ্চ 32টি ইলেকট্রন
1	H	1			
2	He	2			
3	Li	2	1		
11	Na	2	8	1	
18	Ar	2	8	8	
19	K	2	8	8	1
20	Ca	2	8	8	2
21	Sc	2	8	9	2
22	Ti	2	8	10	2
23	V	2	8	11	2
24	Cr	2	8	13	1
25	Mn	2	8	13	2
26	Fe	2	8	14	2
30	Zn	2	8	18	2

উপরের টেবিলটিতে তোমরা দেখেছ যে, হাইড্রোজেন (H) -এর পারমাণবিক সংখ্যা 1, ফলে এর ইলেকট্রন সংখ্যাও 1, সুতরাং, এই একটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথ বা শক্তিস্তর K তে প্রবেশ করছে। আবার লিথিয়াম (Li) -এর পারমাণবিক সংখ্যা 3, এক্ষেত্রে পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম কক্ষপথ বা শক্তস্তরে 2টি ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে। ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম অনুসারে যেহেতু প্রথম শক্তিস্তর K তে 2টির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, তাই তৃতীয় ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় কক্ষপথ বা L শক্তিস্তরে প্রবেশ করেছে। এভাবে সোডিয়াম (Na) -এর ক্ষেত্রেও নিয়ম অনুসারে প্রথম শক্তিস্তর K তে 2টি, দ্বিতীয় শক্তিস্তর L এ ৪টি, এবং তৃতীয় শক্তিস্তর M এ 1টি ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে।

টেবিলের উদাহরণগুলোর সবকটির ক্ষেত্রেই পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের $2n^2$ নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে অর্থাৎ কোনোক্ষেত্রেই শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা $2n^2$ থেকে বেশি হয়নি, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিচের শক্তিস্তর পূর্ণ না হতেই পরের শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত হতে শুরু করেছে। যেমন- টেবিলে

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পটাশিয়াম (K) ও ক্যালসিয়াম (Ca) -এর পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 19 ও 20 এই দুটিতে তৃতীয় শক্তিস্তর M -এর সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা 18 টি। কিন্তু পটাশিয়ামের 19তম ইলেকট্রন এবং ক্যালসিয়াম -এর 19 ও 20তম ইলেকট্রন দুটি তৃতীয় শক্তিস্তর M কে অপূর্ণ রেখেই চতুর্থ শক্তিস্তরে (N) প্রবেশ করেছে।

ইলেকট্রন কেন নিচের শক্তিস্তর অপূর্ণ রেখে উপরের শক্তিস্তরে যেতে থাকে এ বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের একটি নতুন বিষয় জানতে হবে। সেটি হচ্ছে ইলেকট্রনের উপশক্তিস্তর।

৫.৪ উপশক্তিস্তরের ধারণা (energy sublevel)

আমরা জানি যে, প্রধান শক্তিস্তরকে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই শক্তিস্তরগুলো আবার উপশক্তিস্তরে বিভক্ত থাকে এবং এই উপশক্তিস্তরকে ইংরেজি l বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। l -এর মান 0 থেকে n - 1 পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপশক্তিস্তরকে অরবিটাল (orbital) বলা হয়। এই উপশক্তিস্তর বা অরবিটালগুলোর 0, 1, 2, 3... মান এই সংখ্যাগুলো ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে এবং এরা s, p, d, এবং f নামে পরিচিত। নিচে প্রধান শক্তিস্তর (n) -এর মান অনুযায়ী উপশক্তিস্তরের (l) মান এবং অরবিটাল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো :

এখানে n = 1 হলে l -এর একটি মাত্র মান হওয়া সম্ভব, সেটি হচ্ছে n – 1 = (1 - 1) = 0; এক্ষেত্রে অরবিটাল হবে 1টি এবং সেটি প্রকাশ করা হবে 1s হিসেবে।

n = 2 হলে l -এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে n – 1 = (2 - 1) = 1;, কাজেই এবারে l -এর দুটি মান হতে পারে, l = 0, এবং l = 1 অর্থাৎ অরবিটাল হবে 2টি, এবং সেই অরবিটাল দুটি হচ্ছে 2s ও 2p।

n = 3 হলে l -এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে n – 1 = (3 - 1) = 2;, কাজেই এবারে l -এর তিনটি মান হতে পারে, l = 0, 1এবং 2 অর্থাৎ অরবিটাল হবে তিনটি, এবং সেই অরবিটাল তিনটি হচ্ছে 3s, 3p ও 3d । এভাবে আমরা দেখাতে পারি, n = 4 হলে l = 0, 1, 2, 3 হবে; এক্ষেত্রে অরবিটাল হবে ৪টি এবং সেগুলো হচ্ছে 4s, 4p, 4d, 4f।

n = 5 হলে অরবিটাল হবে 5 টি, কিন্তু যেহেতু 4s, 4p, 4d, এবং 4f এই চারটি অরবিটালেই পরমাণুর সবকটি ইলেকট্রন বিন্যাস করা সম্ভব, তাই পরবর্তী অরবিটাল অর্থাৎ পঞ্চম অরবিটালের আর প্রয়োজন হয় না। n = 6, 7, 8 -এর জন্যও এটি সত্যি।

আমরা প্রতিটি শক্তিস্তরকে তার উপশক্তিস্তর বা অরবিটালে ভাগ করে ফেলেছি, এখন শুধু বের করতে হবে একেকটি উপশক্তিস্তরে বা অরবিটালে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সমীকরণ সমাধান করে সেটি খুব সুন্দর করে দেখানো হয়, আমরা শুধু উত্তরটি বলে দিই। অরবিটালে

ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে $2(2l + 1)$।

অর্থাৎ $l = 0$ হলে যে কোনো n -এর জন্য s অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা $2(2 \times 0 + 1) = 2$

$l = 1$ হলে যে কোনো n -এর জন্য p অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা $2(2 \times 1 + 1) = 6$

$l = 2$ হলে যে কোনো n -এর জন্য d অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা $2(2 \times 2 + 1) = 10$

$l = 3$ হলে যে কোনো n -এর জন্য f অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা $2(2 \times 3 + 1) = 14$

এখন তোমরা খুব সহজেই দেখতে পাবে যে, যেকোনো n -এর জন্য তার সবকটি অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো যোগ করলে আমরা পাই $2n^2$।

ভাবনার খোরাক :

তুমি কি গাণিতিকভাবে দেখাতে পারবে যে, যে কোনো n -এর জন্য তার সবকটি অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো যোগ করলে আমরা $2n^2$ পাই। অর্থাৎ $\sum_0^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$?

নিচের টেবিলে প্রধান শক্তিস্তর ($n = 1$ থেকে 4 পর্যন্ত), নির্দিষ্ট শক্তিস্তরের জন্য সম্ভাব্য সবকটি উপশক্তিস্তরের মান, সংশ্লিষ্ট অরবিটালে নাম, অরবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা, এবং প্রধান শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা দেখানো হলো :

প্রধান শক্তিস্তর (n)	উপশক্তিস্তর l -এর মান	অরবিটালের নাম	অরবিটালের প্রতীক	অরবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2(2l+1)$	প্রধান শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2n^2$
1	0	s	1s	2	2
2	0	s	2s	2	2 + 6 = 8
	1	p	2p	6	
3	0	s	3s	2	2 + 6 + 10 = 18
	1	p	3p	6	
	2	d	3d	10	

প্রধান শক্তিস্তর (n)	উপশক্তিস্তর l -এর মান	অরবিটালের নাম	অরবিটালের প্রতীক	অরবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2(2l+1)$	প্রধান শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2n^2$
4	0	s	4s	2	2 + 6 + 10 + 14 = 32
	1	p	4p	6	
	2	d	4d	10	
	3	f	4f	14	

৫.৫ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি

পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১) পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি অনুযায়ী, ইলেকট্রন প্রথমে সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটাল পূর্ণ করবে, পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অরবিটাল পূর্ণ করতে শুরু করবে। আরও সহজভাবে বললে বলা যায়, যে অরবিটালের শক্তি কম (lower energy), সেই অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে এবং যে অরবিটালের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি, সে অরবিটালে পরে প্রবেশ করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটির শক্তি বেশি আর কোনটির শক্তি কম, সেটি কীভাবে বুঝা যাবে? সেটি বুঝার জন্য অরবিটাল দুটির প্রধান শক্তিস্তরের মান (n-এর মান) এবং উপশক্তিস্তরের মান (l -এর মানের) যোগফল বের করতে হবে। যে অরবিটালের $(n + l)$ -এর মান কম সেই অরবিটালের শক্তি কম এবং যে অরবিটালের $(n + l)$ -এর মান বেশি সেই অরবিটালের শক্তি বেশি।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা 3d এবং 4s এই দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটির মান বেশি সেটা বের করে দেখতে পারি :

3d: $(n + l) = (3 + 2) = 5$

4s: $(n + l) = (4 + 0) = 4$

এখানে দেখা যাচ্ছে চতুর্থ শক্তিস্তরের 4s অরবিটাল তৃতীয় শক্তিস্তরের 3d অরবিটালের চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন। তাই নিয়ম অনুযায়ী, ইলেকট্রন আগের অন্যান্য শক্তিস্তর পূর্ণ করার পর প্রথমে 4s অরবিটালে প্রবেশ করবে, পরে 3d অরবিটালে যাবে।

২) n + l -এর মান যদি দুটি অরবিটালে ক্ষেত্রে সমান হয়, তখন যে অরবিটালটিতে n -এর মান কম, সেই অরবিটালের শক্তি কম হবে এবং সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে। উদাহরণস্বরূপ, 3d ও 4p অরবিটাল দুটির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে :

3d: (n + l) = (3 + 2) = 5

4p: (n + l) = (4 + 1) = 5

এখানে দুটো অরবিটালেরই (n + l) -এর মান 5, কিন্তু যেহেতু 3d অরবিটালের জন্য n -এর মান 3 এবং 4p অরবিটালের জন্য n -এর মান 4 তাই n -এর মান কম হওয়ায় 3d অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে।

এই সহজ দুটি নিয়ম প্রয়োগ করে আমরা সবকটি অরবিটালকে তাদের শক্তিস্তরের মানের ক্রমানুসারে সাজাতে পারি :

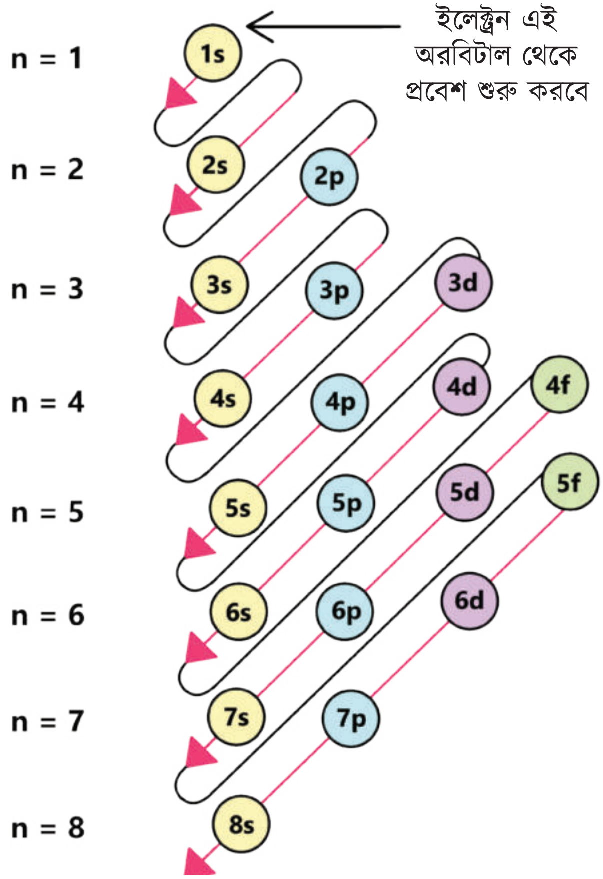

চিত্র ৫.৫ : অরবিটালের শক্তিক্রম

1s <2s <2p <3s <3p <4s <3d <4p <5s <4d <5p <6s <4f <5d <6p 7s 5f <6d <7p <8s

অরবিটালের শক্তিক্রমকে একটি রেখা দিয়ে পরপর সংযুক্ত করা হলে আমরা শক্তিক্রমের প্যাটার্নটি দেখতে পাই (চিত্র ৫.৫)।

৩) আমরা জানি যে, s অরবিটাল বা উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন, p উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 6টি ইলেকট্রন, d উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 10টি ইলেকট্রন, এবং f উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 14টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কাজেই কোনো মৌলের জন্য ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হলে আমাদের সবচেয়ে কম শক্তিস্তরের অরবিটাল থেকে শুরু করতে হবে এবং অরবিটালগুলো সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রন বসিয়ে যেতে হবে। অরবিটালটি পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী শক্তিস্তরে গিয়ে বাকি ইলেকট্রন বসানো শুরু করতে হবে ।

কাজেই এখন আমরা যে কোনো মৌলের জন্য ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখতে পারি। ইলেকট্রনের বিন্যাস আরও সহজবোধ্য করার জন্য প্রতিটি অরবিটালের প্রতীকের উপর সেই অরবিটালে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে সেটি লিখে রাখা হয়। উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে নিম্নে কয়েকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো :

O (8) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

Al (13) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

K (19) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

Ca (20) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

Sc (21) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছিলাম পটাশিয়াম (K) ও ক্যালসিয়াম (Ca) তাদের তৃতীয় স্তর ($n = 3$) অপূর্ণ রেখেই চতুর্থ শক্তিস্তর ($n = 4$) প্রবেশ করেছে, এখন তোমরা নিশ্চয়ই তার কারণটি বুঝতে পারছ। তৃতীয় স্তর পূর্ণ করতে হলে ইলেকট্রনগুলোকে 3d অরবিটালে প্রবেশ করতে হবে, কিন্তু 3d অরবিটালের শক্তি 4s অরবিটলের শক্তি থেকে বেশি। তাই ইলেকট্রনগুলো 3d অরবিটাল অপূর্ণ রেখে চতুর্থ শক্তিস্তরের 4s অরবিটলে প্রবেশ করেছে। আবার স্ক্যান্ডিয়াম (Sc) -এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি 19তম ও 20তম ইলেকট্রন 4s অরবিটাল পূর্ণ করার পরে 3d অরবিটালে তার 21তম ইলেকট্রনটি নিয়ে ফিরে এসেছে। স্ক্যান্ডিয়াম (Sc) -এর মতোই আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে Fe (26), সেটির ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে :

Fe (26) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$

যদি একটি প্রধান শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস শেষ করার আগেই মাঝে মাঝে পরের শক্তি স্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে আবার আগের শক্তিস্তর ফিরে আসে, তাই বোঝার সুবিধার প্রধান শক্তিস্তরের (n) উপশক্তিস্তর বা অরবিটালকে পাশাপাশি লেখা হয়। তাই স্ক্যান্ডিয়াম Sc (21) এবং Fe (26) -এর ইলেকট্রন বিন্যাসে সবকটি তৃতীয় উপস্তর পাশাপাশি লিখে চতুর্থ উপস্তর লেখা হয়।

Sc (21) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$

Fe (26) $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$

৫.৬ ইলেকট্রন বিন্যাসের সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম

যে কোনো নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। ইলেকট্রন বিন্যাসের বেলাতেও সাধারণ নিয়ম থেকে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় এবং এই ব্যতিক্রমের পিছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। যেমন- সাধারণত দেখা যায় যে, একই উপশক্তিস্তর যেমন- p কিংবা d অরবিটালগুলো অর্ধেক পূর্ণ (উদাহরণ : p^3, d^5) না হয়ে যদি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ (উদাহরণ : p^6, d^{10}) হয়, তাহলে সেই ইলেকট্রন বিন্যাস বেশি স্থিতিশীল (stable) হয়ে থাকে। যেমন- কপার Cu(29) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা নিম্নরূপ :

$$Cu\ (29) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^9\ 4s^2$$

কিন্তু 3d অরবিটাল বেশি স্থিতিশীল হবে (stable) হবে যদি অরবিটালটি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়। এটি করার জন্য 4s অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন 3d অরবিটালে আসে। ফলে, কপার (Cu) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস হয় এরকম :

$$Cu\ (29) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$$

এরকম ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাস ক্রোমিয়াম (Cr)- এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

ভাবনার খোরাক :

তোমরা Cr (24) -এর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস উপরের নিয়ম অনুযায়ী লিখতে চেষ্টা করো।

৫.৭ পারমাণবিক ভর এবং আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর (Atomic mass or relative atomic mass)

ধরা যাক তোমাকে একটি পরমাণুর ভর বের করতে বলা হয়েছে। আমরা জানি একটি পরমাণুর ভর বা পারমাণবিক ভর বলতে ঐ পরমাণুতে অবস্থিত ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরের সমষ্টিকে বুঝায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে ইলেকট্রন (9.109×10^{-31} kg), প্রোটন (1.673×10^{-27} kg) এবং নিউট্রনের ভর (1.675×10^{-27} kg) দেওয়া আছে কাজেই আমরা নিশ্চয়ই এখন যে কোনো পরমাণুর ভর বের

করতে পারব। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এই ভরগুলো খুবই ছোটো, কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য আমরা সব সময়ই একটি মানানসই একক ঠিক করে নেই। নক্ষত্রের ভর সাধারণত আমরা সূর্যের ভরের সাপেক্ষে মেপে থাকি, ট্রেনের ইঞ্জিনের ভর মাপতে হলে আমরা টন ব্যবহার করি, হাতির ওজন হাজার কিলোগ্রামে প্রকাশ করা হয়, আমাদের ওজন মাপি কিলোগ্রামে, কোমল পানীয়তে কতটুকু চিনি থাকে সেটা বলা হয় গ্রামে, ওষুধে কার্যকরী রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ বলা হয় মিলিগ্রামে। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীরা অণু-পরমাণুর ভর প্রকাশ করার জন্য একটি মানানসই একক বের করে নিয়েছেন। সেটিকে amu (atomic mass unit) বা সংক্ষেপে শুধু u বলা হয়। একটি কার্বন 12 (^{12}C) আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে u বা পারমাণবিক ভর একক হিসেবে ধরা হয়। এর পরিমাণ

$$1 \text{ u} = 1.661 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

অর্থাৎ, অন্যভাবে বলা যায় এই নতুন এককে

^{12}C পরমাণুর ভর = 12u

এবং

ইলেকট্রনের ভর = 0.00054858 u

প্রোটনের ভর= 1.007276 u

নিউট্রনের ভর= 1.008664 u

তোমাদের মনে হতে পারে যেহেতু পরমাণুগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে তৈরি এবং আমরা আলাদা আলাদাভাবে এগুলোর ভর জানি কাজেই আমরা এখন যে কোনো পরমাণুর ভর বের করে ফেলতে পারব। কিন্তু আসলে এটি পুরোপুরি সত্যি নয়, এই ভর ব্যবহার করে আমরা পরমাণুর ভরের কাছাকাছি বের করতে পারব, কিন্তু প্রকৃত ভর ব্যবহার করতে পারব না। যেমন- আমরা এই নতুন এককে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরের সমষ্টি থেকে ^{12}C পরমাণুর ভর বের করে দেখতে পারি, এটি 12u আসা উচিত। যেহেতু ^{12}C পরমাণুতে 6টি ইলেকট্রন, 6টি প্রোটন এবং 6টি নিউট্রন তাই প্রথমে এই পরমাণুর ভর:

^{12}C পরমাণুর ভর = $6 \times (0.00054858 + 1.007276 + 1.008664)$ u = 12.09893148 u

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটি হুবহু 12u না এসে প্রায় 0.8% বেশি এসেছে। শুধু 12C -এর জন্য নয় যে কোনো পরমাণুর জন্যই যদি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরের সমষ্টি থেকে পরমাণুর ভর বের করা হয়, দেখা যাবে সেই ভর প্রকৃত পরমাণুর ভর থেকে বেশি। যেহেতু প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের তুলনায় ইলেকট্রনের ভর নগণ্য এবং পরমাণুর ভর বের করার সময় এই ভরটিকে বিবেচনা না করলেও কোনো পার্থক্য হয় না, তাই আমরা অনুমান করতে পারি প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে নিউক্লিয়াস

গঠন করার সময় অন্য কোনো কারণে সম্মিলিত ভর কমে যায়। তোমরা আগে নিউক্লিয়ার বলের কথা জেনেছ, নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন এবং নিউট্রন এই নিউক্লিয়ার বলে একে অন্যকে আকর্ষণ করে এবং যেটুকু ভর কমে যায় সেটি আপেক্ষিক সূত্রের $E = mc^2$ হিসেবে শক্তিতে পরিণত হয়, এবং এই শক্তিতে নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রন আটকে থাকে। কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ একটি পরমাণুতে শুধু নিউট্রন ও পরমাণুর সংখ্যা জানলে তাদের আনুমানিক পারমাণবিক ভর বের করা যায়, কিন্তু প্রকৃত পারমাণবিক ভর কত সেটি জানা সম্ভব হয় না। এজন্য বিজ্ঞানীরা অনেক পরিশ্রম করে সকল মৌলের ভিন্ন ভিন্ন সকল আইসোটোপের পারমাণবিক ভর নির্ণয় করে রেখেছেন।

কয়েকটি মৌলের আইসোটোপের পারমানবিক ভর

মৌল	আইসোটোপ	পারমানবিক ভর
C	12C	12 u
কার্বন	13C	13.003355
Cl	35Cl	34.968 u
ক্লোরিন	37Cl	36.956 u
Cu	63Cu	62.9295975(6)
কপার	65Cu	64.9277895(7)
Ag	107Ag	106.9050915(26)
সিলভার	109Ag	108.9047558(14)
U	235U	235.0439299(20)
ইউরেনিয়াম	238U	238.0507882(20)

এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রশ্ন। ধরা যাক তোমার কাছে ক্লোরিন (Cl)- এর পারমাণবিক ভর কত সেটি জানতে চাওয়া হলো। কিন্তু ক্লোরিনের আইসোটোপ দুটি, একটি Cl(35) আরেকটি Cl(37), তাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 34.968u এবং 36.956u তাহলে তুমি ক্লোরিন (Cl) -এর পারমাণবিক ভর কোনটি বলবে? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নটিরও একটি যৌক্তিক উত্তর প্রস্তুত করেছেন। যখন কোনো মৌলের একাধিক আইসোটোপ থাকে, তখন তাদের প্রাপ্ত শতকরা পরিমাণের উপর গড় (weighted average) করে মৌলটির পারমাণবিক ভর নির্ণয় করা হয়। যেহেতু

প্রকৃতিতে Cl (35) -এর প্রাপ্ত পরিমাণ (75.77%) এবং তার পারমাণবিক ভর 34.968u এবং

প্রকৃতিতে Cl (37) -এর প্রাপ্ত পরিমাণ (24.23%) এবং তার পারমাণবিক ভর 36.956u

কাজেই ক্লোরিন মৌলের গড় পারমাণবিক ভর = (75.77 x 34.968 + 24.23 x 34.956)/100=35.45u

অর্থাৎ তুমি যদি কোনো পাত্রে রাখা কিছু ক্লোরিন মৌলের ভেতর থেকে যে কোনো একটি পরমাণুর পারমাণবিক ভর বের কর তাহলে সেটি হবে 34.968u কিংবা 36.956u, কখনোই 35.45 u হবে না, কিন্তু ক্লোরিন মৌলের পারমাণবিক ভর হিসেবে ধরা হয় 35.45u। পরবর্তী অধ্যায়ের পর্যায় সারণিতে তোমরা দেখবে ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর হিসেবে এই সংখ্যাটিই লেখা আছে।

রসায়নবিজ্ঞানে পারমাণবিক ওজন (atomic weight) বলে একটি রাশি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, যদিও পদার্থবিজ্ঞানে ওজন কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে (ওজন হচ্ছে বল, ভরের সঙ্গে 9.8m/s^2 গুণ করে ওজন পাওয়া যায় যার একক নিউটন (N) কিন্তু রসায়নে পারমাণবিক ওজন বলতে এককবিহীন গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ মৌলের পারমাণবিক ভরকে 1u দিয়ে ভাগ দিলে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের হয়ে যায়, দুটি ভরের তুলনা বলে এটি একটি সংখ্যা, এর কোনো একক নেই।

মৌলের ভরসংখ্যা এবং তার শতকরা পরিমাণ জানা থাকলে গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কীভাবে বের করতে হয় তা তোমরা জেনে গেছ। এর উল্টোটা কি করা সম্ভব? অর্থাৎ যদি কোনো মৌলের দুটি আইসোটোপ থাকে এবং তুমি ঐ মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর জানো, তাহলে এ তথ্যগুলো থেকে তুমি কীভাবে ঐ মৌলের আইসোটোপ দুটির প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরা পরিমাণ বের করবে?

ভাবনার খোরাক :

প্রকৃতিতে কপারের দুটি আইসোটোপ হচ্ছে ^{63}Cu এবং ^{65}Cu এবং তার গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হচ্ছে 63.5। তুমি কি ^{63}Cu এবং ^{65}Cu -এর প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরা পরিমাণ বের করতে পারবে?

ভাবনার খোরাক :

তিনটি আইসোটোপ রয়েছে এরকম একটি মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যদি তুমি জানো তাহলে কি তুমি তাদের প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরা পরিমাণ বের করতে পারবে?

৫.৮ আপেক্ষিক আণবিক ভর

আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ব্যবহার করে অণুর ভর বের করা হলে তাকে আপেক্ষিক আণবিক ভর বলা হয়। অর্থাৎ অণুর ভেতর যে পরমাণুগুলো রয়েছে সেই পরমাণুগুলোর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে পরমাণু সংখ্যা দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে যোগ করে অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করা হয়।

উদাহরণ : CO_2 -এর আপেক্ষিক আণবিক ভর কত?

সমাধান : CO_2 অণুতে রয়েছে 1টি কার্বন (C) ও 2টি অক্সিজেন (O) পরমাণু। কার্বন পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 12 এবং অক্সিজেন পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 16। কাজেই CO_2 -এর আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে $12 + 2 \times 16 = 44$

অধ্যায় ৬

পর্যায় সারণি

অধ্যায় ৬

পর্যায় সারণি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ পর্যায় সারণির ধারণা
- ☑ পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়
- ☑ মৌলের পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম
- ☑ পর্যায় সারণির বিভিন্ন গ্রুপের মৌলের বিশেষ নাম
- ☑ পর্যায় সারণির সুবিধা

পর্যায় সারণিতে অবস্থিত 118টি মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ধারণা থাকলে রসায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বুঝতে সুবিধা হয়। কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে। তাই, একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে পদার্থসমূহকে একই গ্রুপে রেখে সকল মৌলিক পদার্থের জন্য একটি ছক তৈরি করার চেষ্টা বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরেই করে আসছিলেন। বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে এই ছকের বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে, যা আজকে আধুনিক পর্যায় সারণি (Periodic Table) হিসেবে পরিচিত। সুতরাং, এই পর্যায় সারণি বিজ্ঞানীদের এক অসামান্য অবদান। এই অধ্যায়ে পর্যায় সারণির ধারণা ও পর্যায় সারণিতে অবস্থিত মৌলসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.১ পর্যায় সারণির ধারণা ও পটভূমি

পদার্থ ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধারণার সম্মিলিত প্রকাশ হচ্ছে পর্যায় সারণি। এই পর্যায় সারণি একজন বিজ্ঞানীর কোনো একক প্রচেষ্টা বা গবেষণার ফলে তৈরি হয়নি, এটি অনেক বিজ্ঞানীর অনেক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে আধুনিক পর্যায় সারণিতে রূপ নিয়েছে। নিচে এই আধুনিক পর্যায় সারণি তৈরি হওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

1989 সালে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে (Lavoisier) কিছু মৌলিক পদার্থসমূহকে ধাতু ও অধাতু এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এই মৌলিক পদার্থগুলো হচ্ছে- অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), হাইড্রোজেন (H), ফসফরাস (P), মার্কারি (Hg), জিঙ্ক (Zn), সালফার (S), ইত্যাদি। সুতরাং, বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের সময়

থেকেই মৌলসমূহকে আলাদা আলাদা ভাগে সাজানোর চেষ্টা করা হয়। এই আলাদা ভাগে ভাগ করার চিন্তা করা হয় যেন একই রকমের মৌলিক পদার্থগুলো একটি নির্দিষ্ট ভাগে থাকে।

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার (Dobereineir) একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে এরকম মৌলিক পদার্থসমূহকে তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী তিনটি করে মৌল দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি লক্ষ করেন যে, দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম ও তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি হয় এবং একে 'ডোবেরাইনারের সূত্র' বলা হয়। এভাবে, ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br), এবং আয়োডিন (I) কে প্রথম ত্রয়ী মৌল হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন।

এরপর, 1829 সাল পর্যন্ত যে সকল মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব মৌলের জন্য ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড (John Newland) একটি সূত্র প্রদান করেন যা 'নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র' নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করেন যে, যখন মৌলসমূহকে পারমাণবিক ভর কম থেকে বেশি অনুযায়ী সাজানো হয়, তখন এখানে একটি মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম তার অষ্টম মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এরপর 1869 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ (Mendeleev) সকল মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম পর্যালোচনা করে একটি পর্যায় সূত্র প্রদান করেন যা মৌলসমূহের ধর্মগুলোর সঙ্গে তাদের পারমাণবিক ভর সম্পর্কিত। সূত্রটি এরকম : "মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়"। এ সূত্র অনুযায়ী তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত 63টি মৌলকে তিনি সাজিয়ে ছিলেন। মৌলসমূহকে 12টি আনুভূমিক সারি (horizontal) এবং 8টি খাড়া কলাম (vertical) -এর একটি ছকে তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধি অনুসারে সাজান এবং দেখেন যে, একই কলামের সকল মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম একই রকম। আবার, একই সারির প্রথম থেকে শেষ মৌল পর্যন্ত মৌলসমূহের ধর্মের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়। এই ছকটির নাম দেওয়া হয় পর্যায় সারণি (Periodic table)।

মেন্ডেলিফের এই পর্যায় সারণির গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের মধ্যে রয়েছে কিছু মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা। উল্লেখ্য, তখন মাত্র 63টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল। ফলে পর্যায় সারণির কিছু ঘর ফাঁকা রয়ে যায় এবং পরবর্তী কালে এই ফাঁকা ঘরগুলোর জন্য মেন্ডেলিফ যে সব মৌল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো প্রমাণিত হয় বা মিলে যায়।

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির সাফল্য যেমন- রয়েছে, তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। যেমন- পারমাণবিক ভর অনুযায়ী মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সারণিতে যেভাবে মৌলসমূহকে বসিয়েছিলেন, সেই নিয়ম অনুযায়ী কম পারমাণবিক ভরের মৌল অধিক পারমাণবিক ভরের মৌলের আগে বসার কথা। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন- মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে আর্গন (Ar) -এর পারমাণবিক ভর 40 হওয়া সত্ত্বেও কম পারমাণবিক ভরের (39) পটাশিয়াম (K) -এর আগে বসিয়েছিলেন। এটা করা হয়েছিল শুধু একই গ্রুপের মৌলসমূহের ধর্মের মিল করানোর জন্য। এছাড়া হাইড্রোজেনকে পর্যায় সারণিতে সঠিক অবস্থান দিতে পারেননি।

গ্রুপ সংখ্যা 6

পারমাণবিক সংখ্যা	পারমাণবিক ভর
24	32

পর্যায় সংখ্যা 4

প্রতীক: Cr

মৌলের নাম: Chromium ক্রোমিয়াম

পর্যায়	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 1 **H** Hydrogen হাইড্রোজেন								
2	3 7 **Li** Lithium লিথিয়াম	4 9 **Be** Beryllium বেরিলিয়াম							
3	11 23 **Na** Sodium সোডিয়াম	12 24 **Mg** Magnesium ম্যাগনেসিয়াম							
4	19 39 **K** Potassium পটাশিয়াম	20 40 **Ca** Calcium ক্যালসিয়াম	21 45 **Sc** Scandium স্ক্যানডিয়াম	22 48 **Ti** Titanium টাইটানিয়াম	23 51 **V** Vanadium ভ্যানাডিয়াম	24 52 **Cr** Chromium ক্রোমিয়াম	25 55 **Mn** Manganese ম্যাঙ্গানিজ	26 56 **Fe** Iron আয়রন	27 58 **Co** Cobalt কোবাল্ট
5	37 85.5 **Rb** Rubidium রুবিডিয়াম	38 88 **Sr** Strontium স্ট্রোনসিয়াম	39 89 **Y** Yttrium ইট্রিয়াম	40 91 **Zr** Zirconium জিরকোনিয়াম	41 93 **Nb** Niobium নিওবিয়াম	42 96 **Mo** Molybdenum মলিবডেনাম	43 98 **Tc** Technetium টেকনেসিয়াম	44 101 **Ru** Ruthenium রুথেনিয়াম	45 103 **Rh** Rhodium রোডিয়াম
6	55 133 **Cs** Caesium সিজিয়াম	56 137 **Ba** Barium বেরিয়াম	পারমাণবিক সংখ্যা 57 থেকে 71	72 178.5 **Hf** Hafnium হাফনিয়াম	73 181 **Ta** Tantalum ট্যান্টালাম	74 184 **W** Tungsten ট্যাংস্টেন	75 186 **Re** Rhenium রেনিয়াম	76 190 **Os** Osmium অসমিয়াম	77 192 **Ir** Iridium ইরিডিয়াম
7	87 223 **Fr** Francium ফ্রানসিয়াম	88 226 **Ra** Radium রেডিয়াম	পারমাণবিক সংখ্যা 89 থেকে 103	104 261 **Rf** Rutherfordium রাদারফোর্ডিয়াম	105 262 **Db** Dubnium ডুবনিয়াম	106 263 **Sg** Seaborgium সিয়াবর্গিয়াম	107 262 **Bh** Bohrium বোরিয়াম	108 265 **Hs** Hassium হাসিয়াম	109 266 **Mt** Metrenium মিটরেনিয়াম

ল্যানথানাইড সারির মৌল	57 139 **La** Lanthanum ল্যান্থানাম	58 140 **Ce** Cerium সিরিয়াম	59 141 **Pr** Praseodymium প্রাসিওডিমিয়াম	60 144 **Nd** Neodymium নিওডিমিয়াম	61 145 **Pm** Promethium প্রোমেথিয়াম	62 150 **Sm** Samarium সামারিয়াম	63 152 **Eu** Europium ইউরোপিয়াম
অ্যাকটিনাইড সারির মৌল	89 227 **Ac** Actinium অ্যাকটিনিয়াম	90 232 **Th** Thorium থোরিয়াম	91 231 **Pa** Protactinium প্রোটেকটিনিয়াম	92 238 **U** Uranium ইউরেনিয়াম	93 237 **Np** Neptunium নেপচুনিয়াম	94 244 **Pu** Plutonium প্লুটোনিয়াম	95 243 **Am** Americium আমেরিসিয়াম

চিত্র ৬.১ : আধুনিক পর্যায় সারণি

আধুনিক পর্যায় সারণি

10	11	12	13	14	15	16	17	18
								2 4 **He** Helium হিলিয়াম
			5 11 **B** Boron বোরন	6 12 **C** Carbon কার্বন	7 14 **N** Nitrogen নাইট্রোজেন	8 16 **O** Oxygen অক্সিজেন	9 19 **F** Fluorine ফ্লোরিন	10 20 **Ne** Neon নিয়ন
			13 27 **Al** Aluminium অ্যালুমিনিয়াম	14 28 **Si** Silicon সিলিকন	15 31 **P** Phosphorus ফসফরাস	16 32 **S** Sulfur সালফার	17 35.5 **Cl** Cholorine ক্লোরিন	18 40 **Ar** Argon আর্গন
28 59 **Ni** Nickel নিকেল	29 63.5 **Cu** Copper কপার	30 65 **Zn** Zinc জিংক	31 70 **Ga** Gallium গ্যালিয়াম	32 73 **Ge** Germenium জার্মেনিয়াম	33 75 **As** Arsenic আর্সেনিক	34 79 **Se** Selenium সেলেনিয়াম	35 80 **Br** Bromine ব্রোমিন	36 84 **Kr** Krypton ক্রিপটন
46 106 **Pd** Palladium প্যালাডিয়াম	47 108 **Ag** Silver সিলভার	48 112 **Cd** Cadmium ক্যাডমিয়াম	49 115 **In** Indium ইন্ডিয়াম	50 119 **Sn** Tin টিন	51 122 **Sb** Antimony এন্টিমনি	52 128 **Te** Tellurium টেলুরিয়াম	53 127 **I** Iodine আয়োডিন	54 131 **Xe** Xenon জেনন
78 195 **Pt** Platinum প্লাটিয়াম	79 197 **Au** Gold গোল্ড	80 201 **Hg** Mercury মার্কারি	81 204 **Tl** Thallium থ্যালিয়াম	82 207 **Pb** Lead লেড	83 209 **Bi** Bismuth বিসমাথ	84 209 **Po** Polonium পোলোনিয়াম	85 210 **At** Astatine অ্যাস্টাটাইন	86 222 **Rn** Radon রেডন
110 269 **Ds** Darmstadtiun ডার্মস্টেডসিয়াম	111 272 **Rg** Roentgenium রন্টজেনিয়াম	112 285 **Cn** Copernicium কোপারনেসিয়াম	113 284 **Nh** Nihonium নিহোনিয়াম	114 285 **Fl** Flerovium ফ্লেরেভিয়াম	115 288 **Mc** Moscovium মস্কোভিয়াম	116 293 **Lv** Livermorium লিভারমোরিয়াম	117 294 **Ts** Tennessine টেনেসাইন	118 294 **Og** Oganesson ওগানেসন

64 157 **Gd** Gadolinium গ্যাডোলিনিয়াম	65 159 **Tb** Terbium টার্বিয়াম	66 163 **Dy** Dysprosium ডিসপ্রোসিয়াম	67 165 **Ho** Holmium হলমিয়াম	68 167 **Er** Erbium আর্বিয়াম	69 169 **Tm** Thulium থুলিয়াম	70 173 **Yb** Ytterbium ইটারবিয়াম	71 175 **Lu** Lutetium লুটেসিয়াম
96 247 **Cm** Curium কুরিয়াম	97 247 **Bk** Berkelium বার্কেলিয়াম	98 251 **Cf** Californium ক্যালিফোর্নিয়াম	99 252 **Es** Einsteinium আইনস্টেনিয়াম	100 257 **Fm** Fermium ফার্মিয়াম	101 258 **Md** Mendelevium মেন্ডেলেভিয়াম	102 259 **No** Nobelium নোবেলিয়াম	103 262 **Lr** Lawrencium লরেনসিয়াম

এরপর 1913 সালে বিজ্ঞানী মোসলে (Moseley) মৌলসমূহকে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায় সারণিতে সাজানোর জন্য প্রস্তাব করেন। এ অনুযায়ী যখন পর্যায় সারণিকে সাজানো হলো তখন দেখা যায় যে, আর্গন (পারমাণবিক সংখ্যা 18) পটাশিয়ামের (পারমাণবিক সংখ্যা 19) আগে বসেছে। ফলে পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায় সারণিতে মৌলসমূহকে স্থান দেওয়া হলে মেন্ডেলিফের ত্রুটিগুলো সংশোধিত হয়। আমরা জানি যে, আন্তর্জাতিক রসায়ন ও ফলিত রসায়ন সংস্থা IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry এখন পর্যন্ত মোট 118টি মৌলের সন্ধান পেয়েছে। এই 118টি মৌলের মধ্যে বেশির ভাগ মৌলই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, আর কিছু মৌল গবেষণাগারে তৈরি হয়েছে।

কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে মাত্র 33টি মৌল নিয়ে ছক তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। মেন্ডেলিফ কাজ করেছিলেন 63টি আবিষ্কৃত এবং 4টি অনাবিষ্কৃত মৌল নিয়ে। বর্তমানে সেটি 118টি মৌল নিয়ে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক পর্যায় সারণি (চিত্র ৬.১)।

৬.২ পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য

৬.২ চিত্রে পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো হয়েছে।

৬.৩ পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

যেহেতু পর্যায় সারণিতে মৌলগুলো তার পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে তাই শুধু এই সংখ্যাটি জানা থাকলেই আমরা পর্যায় সারণিতে মৌলটির অবস্থান বের করে ফেলতে পারব। তারপরেও পর্যায় সারণি সম্পর্কে আরেকটু গভীরভাবে জানার জন্য এবং মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমরা কোনো একটি মৌল পর্যায় সারণির কোন গ্রুপ এবং কোন পিরিয়ডে রয়েছে তা বের করার জন্য মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্য নিতে পারি। নিচে একটি মৌলের পর্যায় সারণিতে অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক) মৌলের পর্যায় নম্বর নির্ণয় করার নিয়ম বা পদ্ধতি

কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি লক্ষ করি, তাহলে মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের বা সর্বোচ্চ প্রধান শক্তিস্তরের নম্বরই হচ্ছে ঐ মৌলটির পর্যায় নম্বর। যেমন- লিথিয়াম (Li) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $Li(3) \longrightarrow 1s^2\ 2s^1$। এখানে Li -এর ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তর হচ্ছে 2। সুতরাং, লিথিয়াম 2 নম্বর পর্যায়ে অবস্থান করছে।

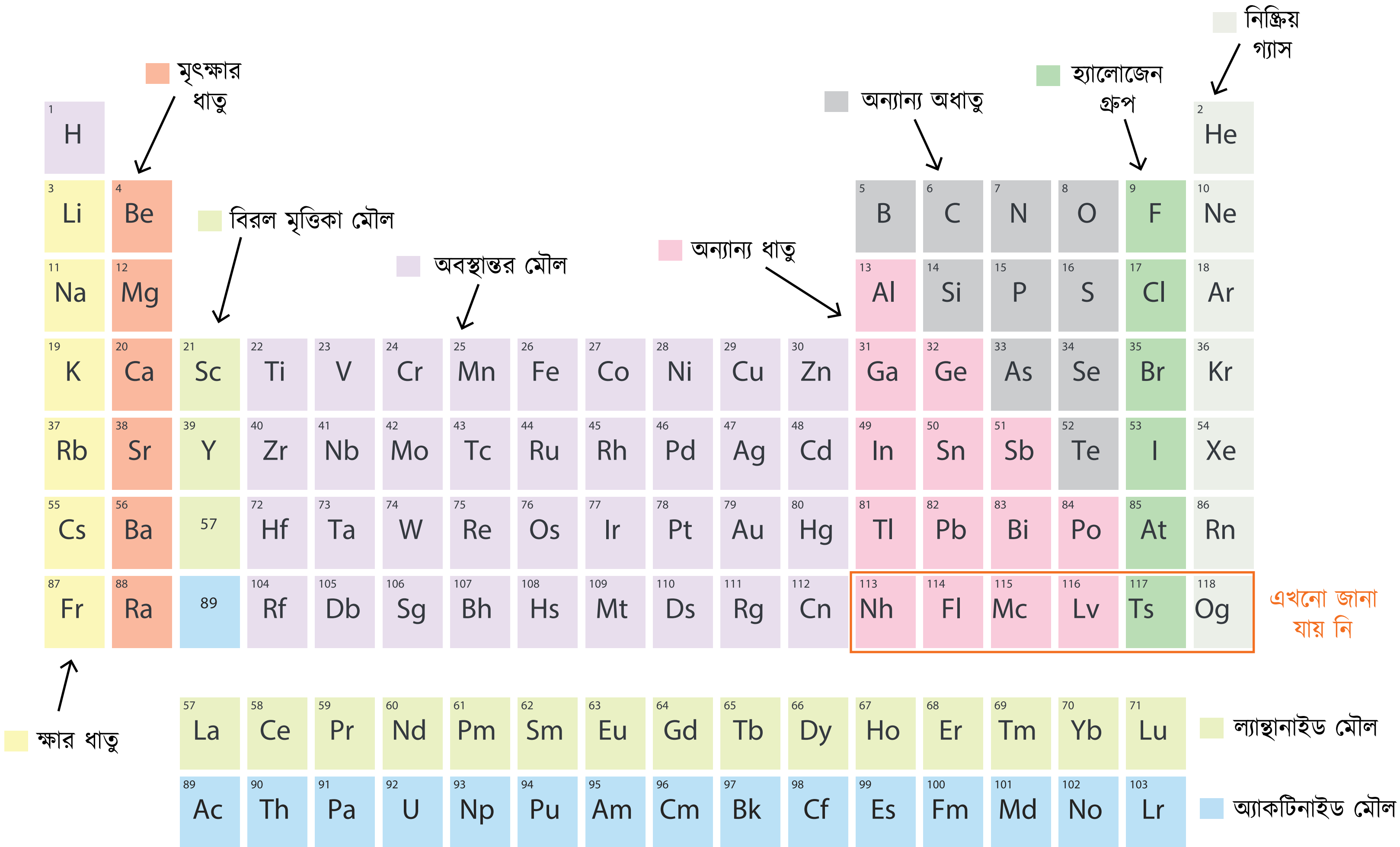

চিত্র ৬.২ : পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য

আবার পটাশিয়াম (K) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস এরকম: K(19) ⟶ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^1$। এক্ষেত্রে, K -এর ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তর 4; সুতরাং, K পর্যায় সারণির 4 নম্বর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

খ) মৌলের গ্রুপ নম্বর নির্ণয় করার নিয়ম

পর্যায় সারণিতে মৌলের গ্রুপ নম্বর বের করার জন্য কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। সেগুলো হলো :

নিয়ম 1 : কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের বা সর্বোচ্চ প্রধান শক্তিস্তরে যদি শুধু s অরবিটাল থাকে, তাহলে ঐ s অরবিটালে বিদ্যমান মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হচ্ছে মৌলটির গ্রুপ নম্বর।

উদাহরণ : হাইড্রোজেন (H) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: H(1) ⟶ $1s^1$ । এখানে s অরবিটালে 1টি ইলেকট্রন রয়েছে। সুতরাং, নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর হচ্ছে 1।

নিয়ম 2 : কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে s ও p অরবিটাল থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে, এই s ও p অরবিটালে থাকা মোট ইলেকট্রনের সঙ্গে 10 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাটিই হবে ঐ মৌলের জন্য গ্রুপ নম্বর।

উদাহরণ : বোরন (B) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: B(5) ⟶ $1s^2$ $2s^2$ $2p^1$। এক্ষেত্রে, বোরনের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে s ও p অরবিটালদ্বয়ে যথাক্রমে 2 ও 1টি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং, বোরনের গ্রুপ নম্বর হবে (2 + 1 + 10) = 13 ।

নিয়ম 3 : কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে s অরবিটালে কয়টি ইলেকট্রন থাকে সেটি লক্ষ করতে হবে। আর তার আগের প্রধান শক্তিস্তরে যদি d অরবিটাল থাকে এবং এই d অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যাও গণনায় নিতে হবে। এখন উক্ত s ও d অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেটিই হচ্ছে ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর।

উদাহরণ : আয়রন (Fe) ইলেকট্রন বিন্যাস হলো Fe(26) ⟶ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^6$ $4s^2$। এক্ষেত্রে, আয়রন (Fe) -এর বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে s অরবিটাল আছে এবং তার আগের প্রধান শক্তিস্তরে d অরবিটাল আছে। এখানে d অরবিটালে 6টি এবং s অরবিটালে 2টি ইলেকট্রন রয়েছে। সুতরাং, আয়রন (Fe) -এর গ্রুপ নম্বর হবে 6 + 2 = 8 ।

নিচের ছকে কিছু মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো যেখান থেকে মৌলের পর্যায় নম্বর ও গ্রুপ নম্বর সহজেই বের করা যাবে।

মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস, পর্যায় নম্বর ও গ্রুপ নম্বর

মৌল	মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস	পর্যায় নম্বর	গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর
H(1)	$1s^1$	1	1 (নিয়ম 1)
He(2)	$1s^2$	1	18 (ব্যতিক্রম)
B(5)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	2	2 + 1 + 10 = 13 (নিয়ম 2)
N(7)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	2	2 + 3 + 10 = 15 (নিয়ম 2)
Ne(10)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	2	2 + 6 + 10 = 18 (নিয়ম 2)
Mg(12)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$	3	2 (নিয়ম 1)
Ti(22)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$	4	2 + 2 = 4 (নিয়ম 3)

উপরোল্লিখিত ছকে বাইরের স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসকে লাল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে সেটি কত নম্বর পিরিয়ডে এবং কত নম্বর গ্রুপে অবস্থান করছে তা বের করা সম্ভব। অর্থাৎ, ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি, এই কথাটি বলা যায়।

৬.৪ পর্যায় সারণির কিছু ব্যতিক্রম

পর্যায় সারণির কিছু মৌলের তাদের ধর্ম অনুযায়ী ব্যতিক্রমী অবস্থান লক্ষ করা যায়। নিচে এরকম কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হলো :

১) হাইড্রোজেন (H) -এর অবস্থান

হাইড্রোজেন মৌল হচ্ছে অধাতু। হাইড্রোজেনের কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তীব্র ধনাত্মক ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে আবার হ্যালোজেন মৌলসমূহের সঙ্গেও মিলে যায়। কিন্তু পর্যায় সারণিতে হাইড্রোজেনকে ক্ষারীয় ধাতু

যেমন- Na, K, Rb, Cs, Fr -এর সঙ্গে গ্রুপ-1 এ রাখা হয়েছে। এখানে ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেন মৌলের মিল হলো ক্ষার ধাতুর মতো হাইড্রোজেনের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে (যেমন- H (1) $\longrightarrow 1s^1$; Na(11) $\longrightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$। অন্যদিকে, হ্যালোজেন মৌলসমূহের (যেমন- F, Cl, Br, I) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের একটি পরমাণু অন্য মৌল থেকে 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে; তেমনিভাবে হাইড্রোজেনও 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে যা হ্যালোজেন মৌলসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। উল্লেখ্য, হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ ধর্মসমূহ ক্ষার ধাতুসমূহের ধর্মের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে, হাইড্রোজেনকে ক্ষার ধাতুর সঙ্গে গ্রুপ-1 এ রাখা হয়েছে।

২) ল্যান্থানাইড (Lanthanides) এবং অ্যাকটিনাইড (Actinides) মৌলসমূহের অবস্থান

পর্যায় সারণিতে ল্যান্থানাইড (Lanthanides) এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোর অবস্থান যথাক্রমে 6 নম্বর পর্যায় ও 3 নম্বর গ্রুপ এবং 7 নম্বর পর্যায় ও 3 নম্বর গ্রুপে। আসলে, উক্ত অবস্থানগুলোতে এই মৌলগুলোকে বসালে পর্যায় সারণির প্রস্থ অহেতুক অনেক দীর্ঘ হয়। তাই এই মৌলসমূহকে পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

৬.৫ মৌলের পর্যায়ভিত্তিক ধর্মসমূহ (Periodic properties of elements)

পর্যায় সারণিতে দেখা যায় যে, মৌলগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের পারমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ, এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়মিত বিরতিতে পুনরায় দেখা যায় বা একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা অনুসরণ করে। এই বিষয়গুলো মৌলসমূহের পর্যায়ক্রমিকতা (periodicity) হিসেবে পরিচিত। পর্যায় সারণিতে মৌলসমূহের বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ধাতব ধর্ম, অধাতব ধর্ম, পরমাণু আকার, তড়িৎ ঋণাত্মকতা, আয়নিকরণ শক্তি, ইলেকট্রন আসক্তি ইত্যাদি। এই ধর্মসমূহ হলো মৌলগুলোর পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম এবং এ ধর্মগুলো ৬.৩ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ক) ধাতব ধর্ম (Metallic properties)

ধাতব মৌলসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা চকচকে হয়, আঘাত করলে ধাতব শব্দ করে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। কোনো মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা দিয়ে ওই মৌলটির ধাতব ধর্ম বোঝা যায়। যেসব মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে এবং ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়, তাদেরকে ধাতু বলা হয়। যেমন- সোডিয়াম (Na) একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়নে (Na+) পরিণত হয় , তাই সোডিয়াম একটি ধাতু।

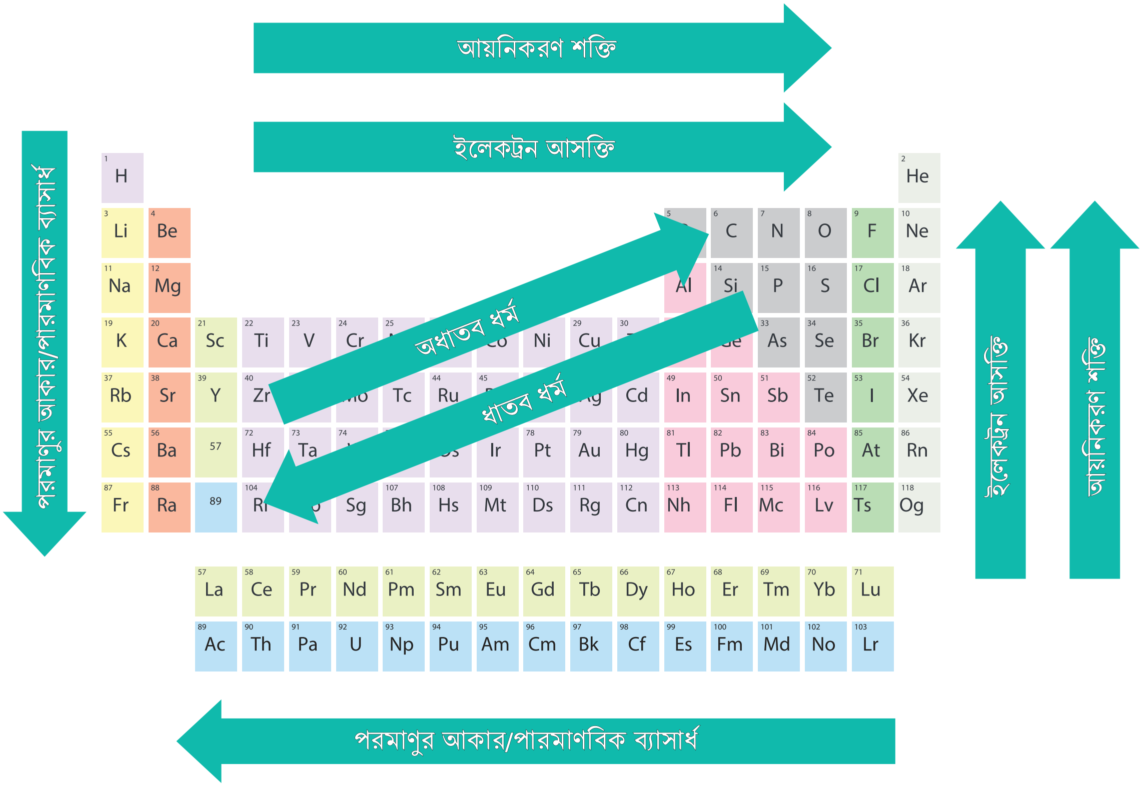

চিত্র ৬.৩ : পর্যায় সারণিতে মৌলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম

$$Na \longrightarrow Na^{+} + e^{-}$$

অন্যভাবে বলা যায় কোনো মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে তার ধাতব ধর্ম তত বেশি। পর্যায় সারণি অনুসারে, পর্যায় সারণির যে কোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে গেলে মৌলগুলোর ধাতব ধর্ম হ্রাস পায়।

খ) অধাতব ধর্ম (Non-metallic properties)

কোনো মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা দিয়ে ওই মৌলটি অধাতব কি না তা বোঝা যায়। অর্থাৎ কোনো মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে, তার অধাতব ধর্ম তত বেশি হবে। যেসব মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে এবং ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়, তাদেরকে অধাতু বলে। যেমন- ক্লোরিন (Cl) একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন (Cl-) -এ পরিণত হয়। তাই, ক্লোরিন (Cl) একটি অধাতু।

$$Cl + e^{-} \longrightarrow Cl^{-}$$

পর্যায় সারণির যে কোনো পর্যায়ে যখন বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া হয় তখন মৌলগুলোর অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়।

পর্যায় সারণি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কিছু মৌল আছে যারা কোনো কোনো সময় ধাতুর মতো আচরণ করে, আবার কোনো কোনো সময় অধাতুর মতো আচরণ করে, এদেরকে অপধাতু বলা হয়। এই অপধাতুসমূহ অবস্থা অনুযায়ী ইলেকট্রন ত্যাগ ও গ্রহণ দুটোই করতে পারে। আর্সেনিক (As) হচ্ছে এরকম একটি অপধাতু।

গ) পরমাণুর আকার/পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Size of atoms/Atomic radius)

পর্যায় সারণির যে কোনো একটি পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার কমতে থাকে, অর্থাৎ পরমাণুর ব্যাসার্ধ কমে যায়। আবার, যে কোনো একটি গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে পরমাণুর আকার বাড়তে থাকে অর্থাৎ পরমাণুর ব্যাসার্ধ বেড়ে যায়। একটি পরমাণুর আকার মূলত নির্ধারিত হয় তার প্রধান শক্তিস্তর দিয়ে। পর্যায় সারণি লক্ষ করলে দেখা যায়, একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক সংখ্যা বা ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে কিন্তু প্রধান শক্তি স্তরের সংখ্যা বাড়ে না। পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে অবস্থিত ইলেকট্রন সংখ্যার সঙ্গে নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায়। সে কারণে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বেশি হয়। তখন ইলেকট্রনগুলোর শক্তিস্তর নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে, ফলস্বরূপ, পরমাণুর আকার ছোটো হয়ে যায় বা তার ব্যাসার্ধ ছোটো হয়ে যায় (চিত্র ৬.৪)।

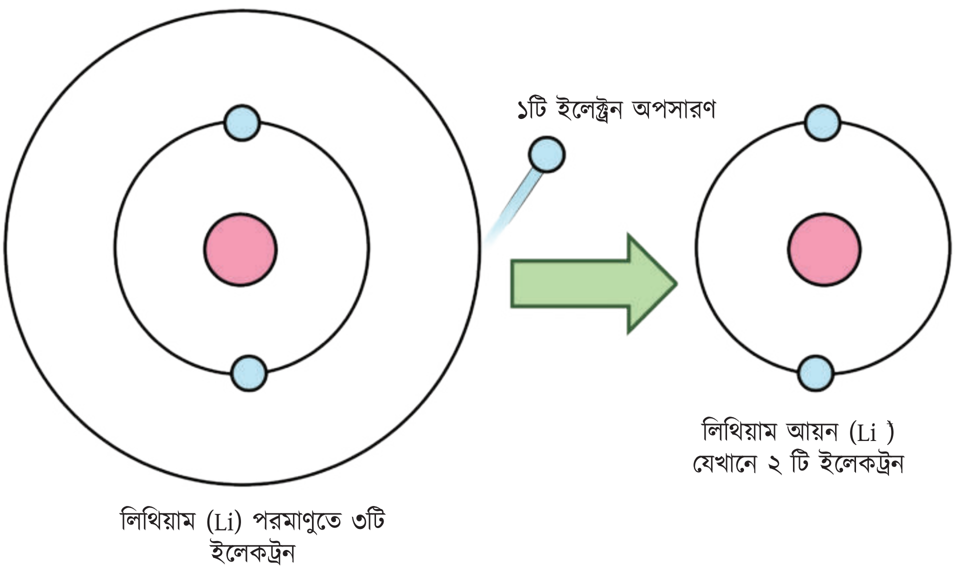

চিত্র ৬.৪ : মৌলের আয়নিকরণ

আবার, পর্যায় সারণির একই গ্রুপের যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া হয়, পরমাণুতে ততই বাইরের দিকে একটি করে নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হয়। নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হলে পরমাণুর আকারও বৃদ্ধি পায় বা ব্যাসার্ধ বেড়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য, একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন সংখ্যার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে পরমাণুর আকার যতটুকু হ্রাস পায়, পরমাণুতে একটি নতুন শক্তিস্তর যোগ হলে পরমাণুর আকার তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে একই গ্রুপের উপরের দিকের মৌলের চেয়ে নিচের মৌলের আকার বড়ো হয়।

ঘ) আয়নিকরণ শক্তি (Ionization energy)

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন অপসারণ করে সেটিকে ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে মৌলের নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটনগুলো আরও বেশি বলপ্রয়োগ করে ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করতে পারে, তাই ইলেকট্রনগুলোকে অপসারণ করতে আরও বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেজন্য পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে আয়নিকরণ শক্তির মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে আয়নিকরণ শক্তির মান কমে।

তোমরা দেখেছ পর্যায় সারণির কোনো গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়, কাজেই তার আয়নিকরণ শক্তি হ্রাস পায়। আবার অন্যদিকে একটি পর্যায়ের বাম থেকে ডানদিকে গেলে যেহেতু পরমাণুর আকার হ্রাস পায় তাই তার আয়নিকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ : পর্যায়-3 এ লক্ষ করলে দেখা যায়, সোডিয়াম (Na), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), অ্যালুমিনিয়াম (Al), সিলিকন (Si) -এর মধ্যে সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় সিলিকনের আয়নিকরণ শক্তি বেশি হবে। আবার, গ্রুপ-1 এ লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na), পটাশিয়াম (K), রুবিডিয়াম (Rb) সিজিয়াম (Cs), ফ্রানসিয়াম (Fr) -এর মধ্যে লিথিয়ামের পারমাণবিক ব্যসার্ধ সবচেয়ে কম, সুতরাং লিথিয়ামের আয়নিকরণ শক্তির মান এই মৌলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

ঙ) ইলেকট্রন আসক্তি (Electron affinity)

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের পরমাণুতে একটি বাড়তি ইলেকট্রন সংযুক্ত করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করা হলে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, সেটিই হচ্ছে ওই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি। আয়নীকরণ শক্তির মতোই মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে ইলেকট্রন আসক্তি বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে ইলেকট্রন আসক্তির মান কমে।

চ) তড়িৎ ঋণাত্মকতা (Electronegativity)

একটি অণুতে যখন দুটি পরমাণু বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন ওই বন্ধনের জন্য দু'টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়। দুটি পরমাণুই ইলেকট্রন দুটিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট রাখতে চায়। যে পরমাণু যত বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে, ইলেকট্রন দুটি সেই পরমাণুর তত কাছে থাকবে। এই আকৃষ্ট করা বা আকর্ষণকে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলে। একই মৌলের দুইটি পরমাণু হলে দুটি পরমাণুই ইলেকট্রন দুটিকে সমান পরিমাণ আকর্ষণ করবে, তাই ইলেকট্রন পরমাণু দুইটির ঠিক মাঝখানে থাকবে। একটি মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা অন্যটি থেকে বেশি হলে ইলেকট্রন দুটি সেই পরমাণুর কাছাকাছি থাকবে। পর্যায় সারণিতে একই পর্যায়ের বামদিকের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ডানদিকের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ থেকে বেশি হওয়ায় তাদের মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা অপেক্ষাকৃত কম হয়। সবচেয়ে কম (0.7) তড়িৎ ঋণাত্মকতা সর্ববামে এবং সর্বনিচের 85Fr মৌলটির। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি (4.0) তড়িৎ ঋণাত্মকতা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত সর্বডানে এবং সবচেয়ে উপরের ফ্লোরিন (9F) মৌলের।

উদাহরণ : 3 নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত সোডিয়াম (Na) -এর তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান ক্লোরিন (Cl) -এর থেকে কম। অর্থাৎ ক্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা বেশি। এখানে আমরা ইলেকট্রন দুটিকে সোডিয়াম থেকে সবচেয়ে দূরে ক্লোরিনের সবচেয়ে কাছে দেখে থাকি। প্রকৃতপক্ষে সেটি দুটি পরমাণুরই আয়নিত অবস্থা।

৬.৬ পর্যায় সারণির গুরুত্ব

পর্যায় সারণির নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। সবকটি মৌল এক সারণিতে থাকার কারণে একটি সামগ্রিক ছবি পাওয়া যায়। যে কোনো মৌলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব দ্রুত ধারণা নেওয়া যায়। এমনকি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি এমন কোনো মৌলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অনুমান করা যায়। নিচে পর্যায় সারণির গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুবিধা আলোচনা করা হলো।

ক) রসায়ন অধ্যয়ন সহজতর হওয়া

তোমরা জানো যে, এখন পর্যন্ত 118টি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মৌলগুলোর গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, অ্যাসিড ও ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া ইত্যাদিসহ এরও অনেক ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। এ ধর্মসমূহকে একসঙ্গে জানা বা মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি যদি পর্যায় সারণির কোনো একটি গ্রুপের সাধারণ ধর্ম জানো, তাহলে ওই গ্রুপের সকল মৌল সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। সুতরাং, পর্যায় সারণিতে যে 18টি গ্রুপ ও 7টি পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে অবস্থিত সকল মৌল সম্বন্ধে সহজে ধারণা পেতে পর্যায় সারণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া, পর্যায় সারণি সম্পর্কে

ভালো ধারণা থাকলে সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন মৌল নিয়ে গঠিত তাদের যৌগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা সহজতর হয়।

খ) নতুন মৌলের ধারণা ও আবিষ্কার

পর্যায় সারণিতে যে 7টি পর্যায় ও 18টি গ্রুপ রয়েছে একটি সময় পর্যন্ত সেখানে কিছু ঘর ফাঁকা ছিল। পরবর্তী কালে সে ফাঁকা ঘরের মৌলগুলো আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তার আগেই এই ফাঁকা ঘরের আবিষ্কৃত মৌলগুলোর ধর্ম কেমন হবে তা পর্যায় সারণি থেকে অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ তাঁর সময়ে আবিষ্কৃত 63টি মৌল পর্যায় সারণিতে স্থান দিতে গিয়ে কিছু মৌলের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গ) গবেষণায় ভূমিকা

আমরা জানি যে, নতুন কোনো পদার্থ গবেষণার মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয়। এই নতুন পদার্থের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা আগে থেকেই কিছু ধারণা থাকলে গবেষণায় সুবিধা হয়। কারণ, সেইসব ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সংবলিত পদার্থ তৈরি করতে কি ধরনের মৌল প্রয়োজন হবে তা পর্যায় সারণি থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

পর্যায় সারণির উপরোল্লিখিত সুবিধাসমূহ ছাড়া আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে যা তোমরা উচ্চতর শ্রেণিতে জানতে পারবে।

ভাবনার খোরাক :

ধরা যাক, তোমরা 119 পারমাণবিক নম্বর মৌলটি আবিষ্কার করেছ। তোমরা এর নাম কী দেবে? এই মৌলটির ধর্ম কী হতে পারে সেটি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে? এর ইলেকট্রন বিন্যাস কী হতে পারে?

অধ্যায় ৭

রাসায়নিক বন্ধন

অধ্যায় ৭ রাসায়নিক বন্ধন

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ যোজ্যতা, যৌগমূলক ও যোজনী
- ☑ যৌগের রাসায়নিক সংকেত লেখার পদ্ধতি
- ☑ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও তাদের স্থিতিশীলতা
- ☑ রাসায়নিক বন্ধন ও বন্ধন গঠনের কারণ
- ☑ আয়নিক, সমযোজী ও ধাতব বন্ধন,
- ☑ ধাতু নিষ্কাশন ও আকরিক, বিভিন্ন সংকর ধাতু

আমরা জানি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 118টি মৌলের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুগুলো যুক্ত হয়েই বিভিন্ন অণু গঠন করে। সুতরাং, আমরা যত রকম পদার্থের কথাই বলি না কেন সকল পদার্থই এই অণু এবং পরমাণু দিয়ে গঠিত। অণুতে থাকা পরমাণুগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে। অণুতে পরমাণুগুলো যুক্ত থাকার কারণ হচ্ছে আকর্ষণ বল বা শক্তি; যাকে আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলি। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বন্ধন রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

৭.১ যোজনী বা যোজ্যতা, যৌগমূলক

তোমরা আগের শ্রেণিতে যোজনী ও যৌগমূলক কী, এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছ। এখানে, যোজ্যতা, যৌগমূলক ও যোজনী সম্পর্কে আরেকটু বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কোনো মৌলের পরমাণুর যোজ্যতা সম্পর্কে জানার আগে ঐ পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন বলতে কী বোঝায় সেটি জানতে হবে।

যোজ্যতা ইলেকট্রন (Valence electron):

কোনো মৌলের পরমাণুর সর্বোচ্চ শক্তিস্তর বা সর্বশেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেই ইলেকট্রন সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় যে, বোরন (B) ও অক্সিজেন (O)-এর ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায়, এদের সর্বশেষ কক্ষপথে যথাক্রমে 3টি ও 6টি ইলেকট্রন রয়েছে। সুতরাং বোরন (B) ও অক্সিজেন (O) -এর যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা যথাক্রমে 3 ও 6। ৭.১ চিত্রে বোরন (B) এবং অক্সিজেন(O) -এর যোজ্যতা ইলেকট্রন দেখানো হলো।

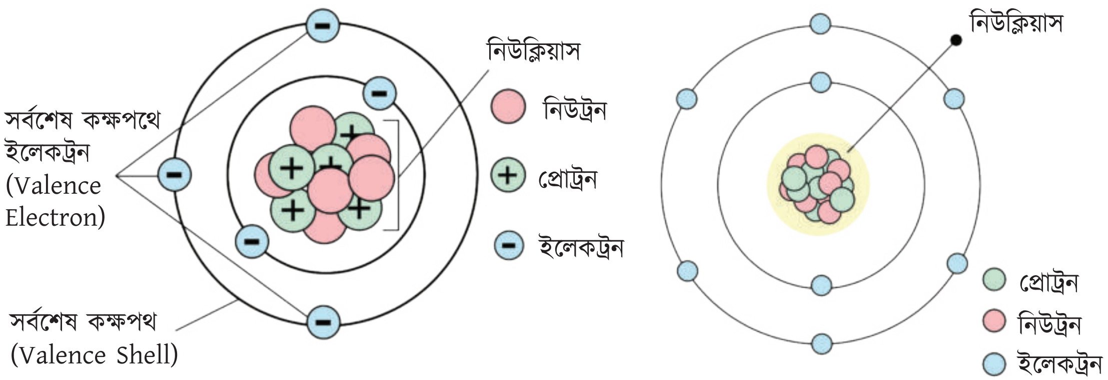

চিত্র ৭.১ : বোরন ও অক্সিজেনের পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন

বোরন (B) ও অক্সিজেন (O) -এর ইলেকট্রন বিন্যাস নিচে দেখানো হলো-

$B\ (5) \rightarrow 1S^2\ \boxed{2s^2 2p^2}$

$O\ (8) \rightarrow 1S^2\ \boxed{2s^2 2p^4}$

সর্বশেষ শক্তিস্তর

তোমরা নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), ও ক্লোরিনের (Cl) ইত্যাদি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে তাদের যোজ্যতা ইলেকট্রন কত বের করার চেষ্টা করতে পারো।

যোজনী বা যোজ্যতা (Valency)

তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে, মৌলের পরমাণুসমূহ সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন গ্রহণ, ত্যাগ বা ভাগাভাগি করতে পারে। এভাবে, পরমাণুসমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ বা ভাগাভাগি করার মাধ্যমে অণু গঠন করে। আর অণু গঠনের সময় কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে আরেকটি পরমাণুর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে যোজনী বা যোজ্যতা (valency)। যোজনী বা যোজ্যতাকে এভাবেও বলা যায় :

কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন (H) পরমাণু বা ক্লোরিন (Cl) পরমাণু যুক্ত হতে পারে, সেই সংখ্যাটিই হচ্ছে ঐ মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা। আবার কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যত সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হতে পারে, সেই সংখ্যাটির দ্বিগুণ হচ্ছে ঐ মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়,

অ্যামোনিয়া (NH3) : নাইট্রোজেনের (N) 1টি পরমাণুর সঙ্গে হাইড্রোজেনের (H) 3টি পরমাণু যুক্ত হয়েছে। সুতরাং, নাইট্রোজেনের যোজনী 3।

সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) : সোডিয়ামের (Na) 1টি পরমাণুর সঙ্গে ক্লোরিনের (Cl) 1টি পরমাণু যুক্ত

হয়েছে। সুতরাং, সোডিয়ামের যোজনী 1।

ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) : ক্যালসিয়ামের (Ca) 1টি পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের 1টি পরমাণু যুক্ত হয়েছে। সুতরাং, ক্যালসিয়ামের যোজনী 2।

আবার, কিছু মৌলের একাধিক যোজনী থাকে। যেমন- আয়রন (Fe) -এর দুটি যোজনী আছে।

$FeCl_2$: আয়রনের (Fe) 1টি পরমাণুর সঙ্গে 2টি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু যুক্ত হয়েছে। আয়রনের যোজনী 2।

FeCl3 : আয়রনের (Fe) 1টি পরমাণুর সঙ্গে 3টি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু যুক্ত হয়েছে। আয়রনের যোজনী 3 ।

কোনো মৌলের একাধিক যোজনী থাকলে ঐ মৌলের যোজনীকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলা হয়। সুতরাং, আয়রনের পরিবর্তনশীল যোজনী 2 ও 3।

যৌগমূলক (Radicals)

কোনো মৌলের একাধিক পরমাণুর একটি গ্রুপ বা পরমাণুগুচ্ছ যখন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জসহ একটি মৌলের আয়নের মতো আচরণ করে, তখন ঐ পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বলা হয়। যৌগমূলকের একটি চার্জ থাকে, সেটি ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক দুইই হতে পারে। এই চার্জের সংখ্যাটিই হচ্ছে তাদের যোজনী। চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে, কিন্তু যোজনী সব সময়ই একটি সংখ্যা।

উদাহরণ : যৌগমূলক

যৌগমূলকের নাম	সংকেত	চার্জ	যোজনী
কার্বনেট	CO_3^{2-}	-2	2
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	+1	1
সালফেট	SO_4^{2-}	-2	2
ফসফেট	PO_4^{3-}	-3	3

উদাহরণ : একটি ফসফরাস (P) পরমাণু, 3টি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু, ও 1টি H^+ যুক্ত হয়ে ফসফোনিয়াম আয়ন (PH_4^+) নামক যৌগমূলক তৈরি করে। যেহেতু এই PH_4^+ যৌগমূলকের চার্জের সংখ্যা +1, সুতরাং এর যোজনী হবে 1। সাধারণত, ধনাত্মক চার্জের যৌগমূলককে ক্ষারীয় যৌগমূলক (যেমন- NH_4^+) আর ঋণাত্মক চার্জের যৌগমূলককে অম্লীয় যৌগমূলক বলা হয় (যেমন- NO_3^-)।

৭.২ যৌগের রাসায়নিক সংকেত (Chemical formula of a compound)

তোমরা পর্যায় সারণিতে দেখেছ, প্রত্যেকটা মৌলের পরমাণুর জন্য একটি এক কিংবা দুই ইংরেজি অক্ষরের সুনির্দিষ্ট প্রতীক রয়েছে। কোনো যৌগের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে যেসব মৌল দিয়ে ঐ যৌগটির রাসায়নিক গঠন হয়েছে তার একটি প্রতীকী উপস্থাপনা। অর্থাৎ এখানে কোনো যৌগের অণুতে যেসব পরমাণু থাকে, সেসব পরমাণুর প্রতীক এবং সংখ্যার মাধ্যমে অণুটিকে প্রকাশ করা যায়। যেমন- H_2O হচ্ছে পানির একটি অণু, এখানে দুইটি হাইড্রোজেন (H) ও একটি অক্সিজেন (O) আছে, সুতরাং পানির রাসায়নিক সংকেত হলো H_2O ।

নিচে রাসায়নিক সংকেত লেখার নিয়মগুলো উল্লেখ করা হলো :

১) কোনো মৌলের অণুর রাসায়নিক সংকেত লিখতে হলে ঐ অণুতে বিদ্যমান পরমাণুর প্রতীকটি লিখে মৌলটির প্রতীকের ডানপাশের নিচে ছোটো করে (subscript) অণুতে মৌলের সংখ্যা লিখতে হবে। যেমন- নাইট্রোজেন অণুতে 2টি নাইট্রোজেন পরমাণু (N) থাকে। সুতরাং, নাইট্রোজেনের সংকেত N_2।

কিছু মৌল আছে যারা অণু গঠন করে না, তাদেরকে শুধু প্রতীক দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন- সকল ধাতু অণু গঠন করে না, কাজেই আয়রনকে বোঝাতে বা লিখতে হলে শুধু Fe লেখা হয়। আবার, নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলোও অণু গঠন করে না বলে এদেরকে লিখতেও শুধু তাদের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। যেমন- হিলিয়াম লেখা হয় He হিসেবে।

২) কোনো যৌগের অণু যদি দুটি ভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় তাহলে যৌগটির অণুতে বিদ্যমান মৌল (কিংবা যৌগমূলক) দুটির প্রতীক পাশাপাশি লিখে একটি মৌলের পাশে নিচের দিকে ছোটো করে অপর মৌলটির যোজনী লিখতে হবে। যেমন- আমরা জানি, অ্যালুমিনিয়াম (Al) -এর যোজনী 3 এবং অক্সিজেন (O) -এর যোজনী 2। এই দুটি মৌল দিয়ে গঠিত যৌগ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এর সংকেত Al_2O_3। এখানে, Al -এর পাশে নিচের দিকে ছোটো করে O -এর যোজনী (2) লেখা হয়েছে এবং O -এর পাশে নিচের দিকে ছোটো করে Al -এর যোজনী (3) লেখা হয়েছে। একইভাবে ক্যালসিয়াম (Ca) -এর যোজনী 2 এবং ক্লোরিন (Cl) -এর যোজনী 1, সুতরাং, উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী ক্যালসিয়াম (Ca) ও ক্লোরিন (Cl) দিয়ে গঠিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হলো $CaCl_2$।

তবে যৌগে উপস্থিত মৌলসমূহ বা যৌগমূলকের যোজনী একই হলে সংকেতে যোজনী লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন- ক্যালসিয়াম (Ca) -এর যোজনী 2 এবং অক্সিজেন (O) -এর যোজনী 2 এই দুটি মৌল দিয়ে গঠিত যৌগ ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে Ca_2O_2 না লিখে CaO লেখা হয়।

আবার, কোনো মৌলের সঙ্গে কোনো যৌগমূলক থাকলে এবং তাদের যোজনী জানা থাকলে উপরের

নিয়ম অনুযায়ী তাদের দিয়ে গঠিত যৌগের সংকেত লেখা যাবে। যেমন- ম্যাগনেসিয়াম (Mg) একটি মৌল এবং এর যোজনী 2 এবং ফসফেট (PO_4^{3-}) একটি যৌগমূলক যার যোজনী 3। সুতরাং, নিয়ম অনুযায়ী এদের দিয়ে গঠিত ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের সংকেত হবে $Mg_3(PO_4)_2$। এক্ষেত্রে, কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ না রাখার জন্য যৌগমূলকটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রেখে লিখতে হয়।

৩) যদি মৌল দুটির যোজনী কোনো সাধারণ সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হয়, তাহলে মৌল দুটির যোজনীকে সাধারণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মৌল দুটির পাশে প্রাপ্ত ভাগফলদ্বয় নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু কার্বন (C) ও অক্সিজেন (O) এই দুটি মৌল দিয়ে গঠিত। এখানে, কার্বনের যোজনী 4 এবং অক্সিজেনের যোজনী 2, কিন্তু এটিকে আমরা C_2O_4 লিখি না। যেহেতু কার্বন ও অক্সিজেনের যোজনীকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় যথাক্রমে 2 এবং 1। সুতরাং, নিয়ম এক অনুযায়ী কার্বন (C) -এর ডানপাশে নিচে 1 এবং অক্সিজেন (O) -এর ডানপাশে নিচে 2 লেখার কথা, যেহেতু সংকেত লেখার সময় 1 সংখ্যাটি লেখা প্রয়োজন হয় না, তাই কার্বনডাইঅক্সাইড -এর সংকেত হচ্ছে CO_2 ।

৭.৩ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং স্থিতিশীলতা (Inert gas and stability)

তোমরা ইতোমধ্যে জানো যে, নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ পর্যায় সারণির 18 নম্বর গ্রুপে অবস্থিত। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর এই নিষ্ক্রিয়তা বা স্থিতিশীলতার কারণ হচ্ছে এদের সর্বশেষ শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে। হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 2, কাজেই তার একটি মাত্র শক্তিস্তর সেটি হচ্ছে 1s, সেটি পূর্ণ করতে মাত্র 2টি ইলেকট্রনের প্রয়োজন এবং হিলিয়ামের সর্বশেষ কক্ষপথ বা শক্তিস্তরে রয়েছে সেই দুটি ইলেকট্রন। অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সর্বশেষ শক্তিস্তরে 8টি ইলেকট্রন দিয়ে s এবং p অরবিটাল পূর্ণ থাকে। নিচে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো-

He (2) → $\boxed{1S^2}$

Ne (10) → $1S^2\ \boxed{2s^2 2p^6}$ ← সর্বশেষ শক্তিস্তর

Ar (18) → $1S^2\ 2s^2 2p^6\ \boxed{3s^2 3p^6}$

Kr (36) → [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$

Xe (54) → [Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$

কাজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হিলিয়ামের সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2টি এবং অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে 8 (আট)টি ইলেকট্রন থাকায় তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে আর ইলেকট্রনের প্রয়োজন নেই। তাই এরা স্থিতিশীলতা অর্জন করে। কোনো মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরে 8 (আট)টি ইলেকট্রন থাকলে এরা সর্বাধিক স্থিতিশীল হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ অধিক স্থিতিশীল হওয়ার

দরুন তারা অন্য মৌলকে ইলেকট্রন প্রদান করে না আবার গ্রহণও করে না। ফলে, এরা রাসায়নিকভাবে আসক্তিহীন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

অষ্টক -এর নিয়ম (Octet Rule) : আমরা জানি যে, যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল তাই প্রতিটি মৌলই তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে (valence shell) নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় অর্থাৎ তাদের সর্বশেষ শক্তি স্তরে ৪টি ইলেকট্রন অর্জন করার প্রবণতা দেখায়। একমাত্র হিলিয়াম (He) ছাড়া বাকি সব নিষ্ক্রিয় গ্যাসেরই সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন আছে। তাই মৌল বা পরমাণুসমূহ যখন অণু গঠন করে তখন তারা ইলেকট্রন গ্রহণ, ত্যাগ বা ভাগাভাগি (sharing) করার মাধ্যমে তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪ (আট) টি ইলেকট্রন ধারণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। একেই 'অষ্টক' নিয়ম (Octet rule) বলা হয়।

উদাহরণ : মিথেন (CH_4) অণুতে কার্বন (C) পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪(আট)টি ইলেকট্রন আছে। এই ৪(আট) টি ইলেকট্রনের মধ্যে 4টি কার্বনের আর 4টি ইলেকট্রন হাইড্রোজেন (H) পরমাণু থেকে আসে। ৭.২ চিত্রে সেটি দেখানো হয়েছে।

৭.৪ রাসায়নিক বন্ধন (Chemical Bond

কোনো রাসায়নিক যৌগ গঠন করতে দুই বা ততোধিক পরমাণু, অণু বা আয়নের মধ্যে বন্ধনই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন। এই রাসায়নিক বন্ধন যৌগের পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে রাখে বা ধরে রাখে। যেমন- দুটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে বন্ধনে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অণু (H_2) গঠন করে। অর্থাৎ, এখানে বন্ধন গঠনের জন্য দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল কাজ করেছে এবং এই আকর্ষণ বলই হচ্ছে মূলত রাসায়নিক বন্ধন। অতএব, অণু গঠনের জন্য পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে যুক্ত থাকে, তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে।

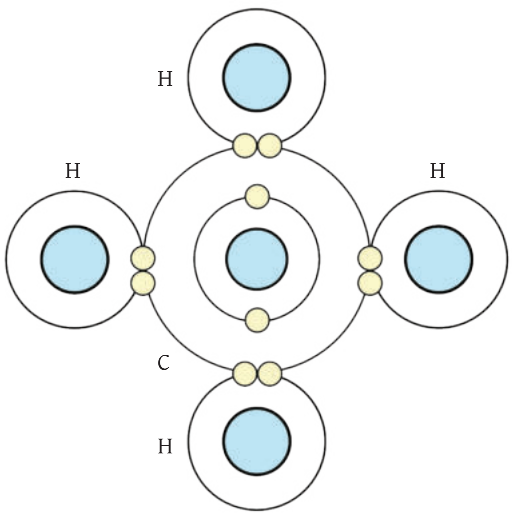

চিত্র ৭.২ : মিথেন (CH_4) অণুতে অষ্টক নিয়ম

বন্ধন গঠনের কারণ হচ্ছে, আসলে প্রত্যেক মৌলই তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে স্থিতিশীল হতে চায়। তাই যখন একই মৌল বা ভিন্ন মৌলের দুটি পরমাণু কাছাকাছি আসে তারা তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ বা ভাগাভাগি করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। ফলে,

পরমাণুগুলোর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়। আর এই আকর্ষণের কারণেই রাসায়নিক বন্ধন গঠিত হয়।

৭.৪.১ আয়নিক বন্ধন (Ionic Bond)

পর্যায় সারণি পড়ার সময় তোমরা দেখেছ ধাতুগুলোর আয়নিকরণ শক্তির মান অনেক কম। ফলে, এরা অতি সহজেই তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট আয়ন বা ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারে। আবার, অধাতুগুলোর ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হওয়ায় তারা তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট আয়ন বা অ্যানায়নে পরিণত হতে পারে। এভাবে সৃষ্ট হওয়া ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের তড়িত আকর্ষণ বল কাজ করে তাদের নিজেদের ধরে রেখে বন্ধন তৈরি করতে পারে। এই বন্ধনই হচ্ছে আয়নিক বন্ধন।

উদাহরণ : এখানে, উদাহরণ দেওয়ার জন্য সোডিয়াম আয়ন (Na^+) এবং ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) -এর মধ্যে সৃষ্ট বন্ধনের ফলে তৈরি সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) কথা বলা যেতে পারে। এই NaCl -এ আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান।

সোডিয়াম (Na) -এর সর্বশেষ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস (সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪(আট) টি ইলেকট্রন) অর্জন করে সোডিয়াম আয়ন (Na^+)- এ পরিণত হয় যা আমরা ইতোমধ্যে জানি। আবার ক্লোরিন (Cl) ও তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস (সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪ (আট)টি ইলেকট্রন) অর্জন করে ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) -এ পরিণত হয়।

সুতরাং, এভাবে তৈরিকৃত সোডিয়াম আয়ন (Na^+) এবং ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) পরস্পরের সঙ্গে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর, এভাবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে সৃষ্ট বন্ধনই হচ্ছে আয়নিক বন্ধন। আর, যে যৌগে এ বন্ধন বিদ্যমান থাকে তাকে আয়নিক যৌগ বলে। ৭.৩ চিত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) -এর আয়নিক বন্ধন তৈরি দেখানো হলো।

এখানে উল্লেখ্য, পর্যায় সারণির 1 ও 2 নম্বর গ্রুপের ধাতব মৌলগুলো এবং গ্রুপ-16 ও গ্রুপ-17 -এর অধাতু মৌলগুলো সাধারণত আয়নিক বন্ধন তৈরি করে।

৭.৪.২ সমযোজী বন্ধন (Covalent bond)

আমরা জানি যে, অধিক আয়নিকরণ শক্তিসম্পন্ন মৌলগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না, আবার কম ইলেকট্রন আসক্তিসম্পন্ন মৌলসমূহ সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে না। যেমন- ক্লোরিন (Cl) -এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 7টি ইলেকট্রন আছে। ফলে, ক্লোরিন তার শক্তিস্তর থেকে 7টি ইলেকট্রন ত্যাগ

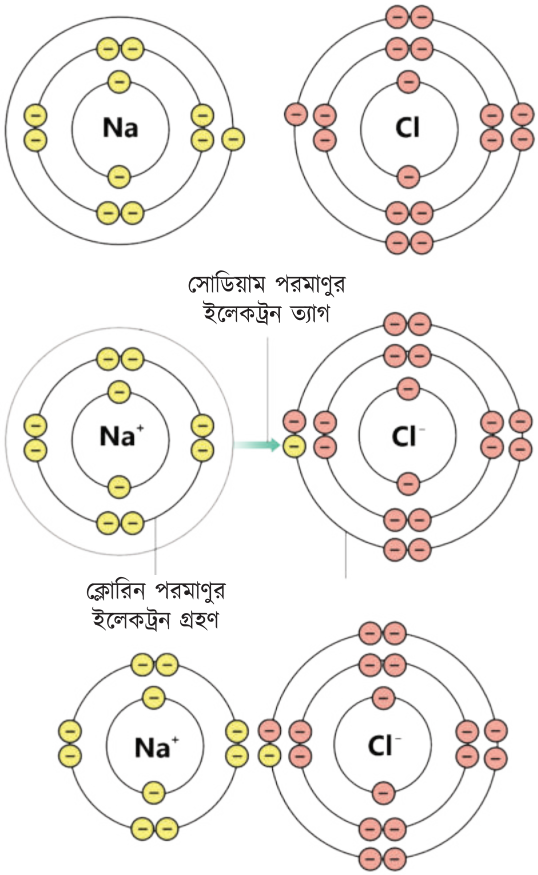

সোডিয়াম পরমাণুর আয়নিকরণ শক্তির মান অনেক কম। ফলে, এরা অতি সহজেই তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চায়

ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হওয়ায় এটি নিজের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায়। ফলে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের দুইটি পরমাণু যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট আয়নে (ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন) পরিণত হয়

এভাবে সৃষ্ট হওয়া ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তড়িত আকর্ষণ বলের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যৌগ হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন করে

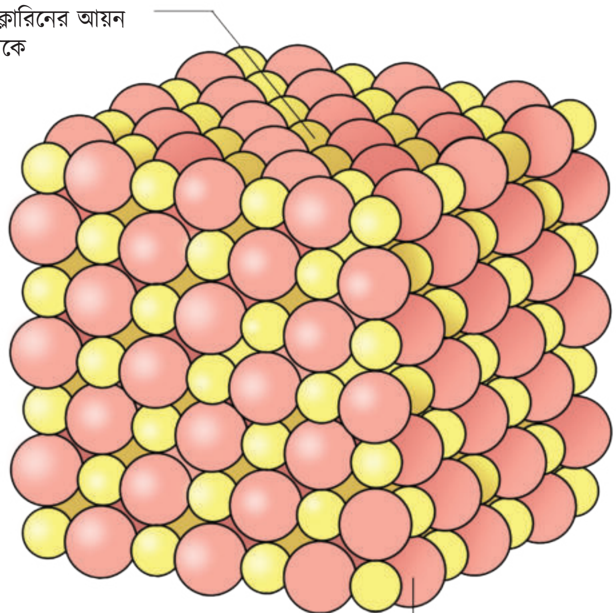

চিত্র ৭.৩ : সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) -এর আয়নিক বন্ধন গঠন

করতে চাইবে না বরং একটি বা দুইটি গ্রহণের প্রবণতা দেখাবে। এক্ষেত্রে, দুটি ক্লোরিন পরমাণু যখন নিজেদের কাছাকাছি আসবে, তখন প্রত্যেকটি ক্লোরিন পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তর থেকে একটি করে ইলেকট্রন এসে জোড়বদ্ধ হয়ে উভয় পরমাণুই ইলেকট্রন দুটি ভাগাভাগি করে নেবে। একে ইলেকট্রন শেয়ারিং (Sharing of electron) বলে।

ফলস্বরূপ, দুটি ক্লোরিন পরমাণুই তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪(আট) টি করে ইলেকট্রন লাভ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করবে। যে কারণে দুটি ক্লোরিনের পরমাণুই একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে পারে না এবং এরা এক ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয় (চিত্র ৭.৪)। এ ধরনের বন্ধনকে সমযোজী বন্ধন (Covalent bond) বলে। সমযোজী বন্ধন দিয়ে যে যৌগ তৈরি হয় তাকে সমযোজী যৌগ বলে।

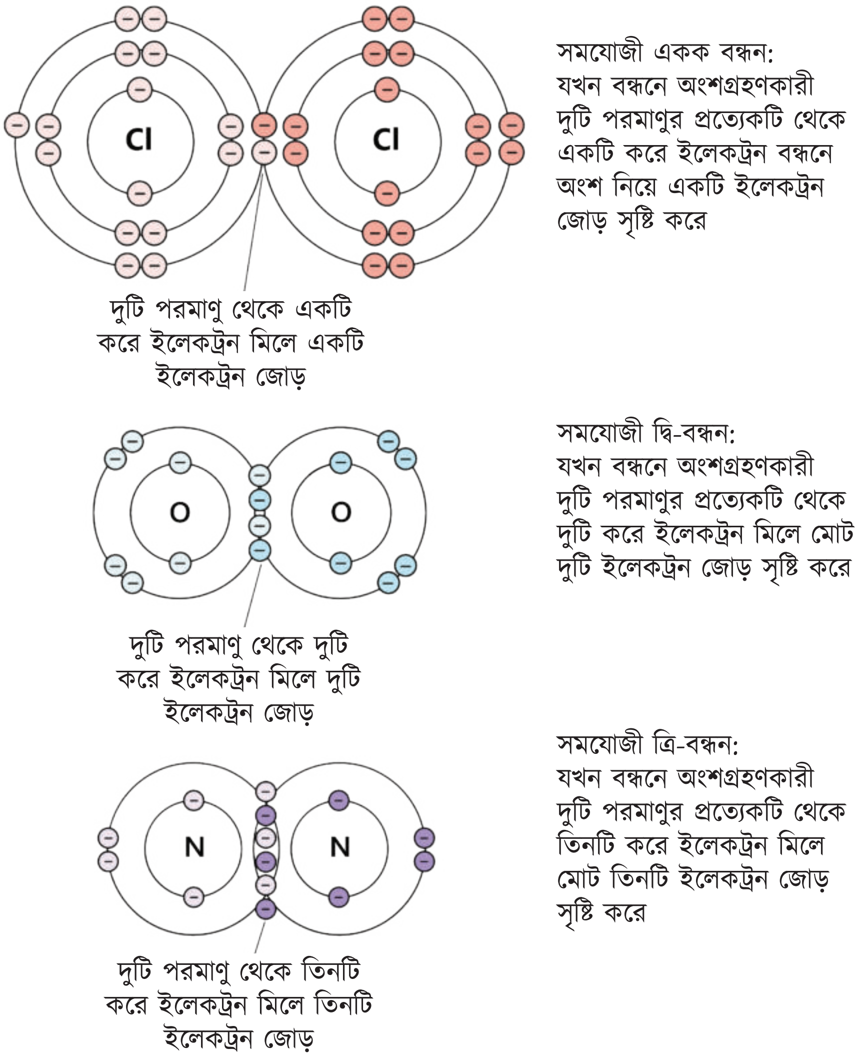

চিত্র ৭.৪ : সমযোজী বন্ধন

পানি

পানি (H_2O) একটি সমযোজী যৌগ। এখানে, একটি অক্সিজেন (O) পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক হওয়ায় পানির অণুর সমযোজী বন্ধনে ব্যবহৃত ইলেকট্রন দুটি অক্সিজেনের দিকে সামান্য সরে যায়, সে কারণে অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক চার্জপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো সরে যাওয়ার কারণে সেগুলো আংশিক ধনাত্মক চার্জপ্রাপ্ত হয় (চিত্র ৭.৫)। উল্লেখ্য, পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে দুটি সমযোজী বন্ধন থাকে এবং এই বন্ধনের জন্য দুটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয়।

এভাবে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের সমযোজী যৌগকে পোলার সমযোজী যৌগ (Polar covalent compound) বলে। সুতরাং, পানি হচ্ছে পোলার সমযোজী যৌগ এবং পোলার দ্রাবক।

যেমন: পানিতে যখন আয়নিক যৌগ যোগ করা হয়, তখন পানির অণুর ধনাত্মক প্রান্ত আয়নিক যৌগের ঋণাত্মক প্রান্ত বা অ্যানায়নকে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে, পানির ঋণাত্মক প্রান্ত আয়নিক যৌগের ধনাত্মক প্রান্তকে আকর্ষণ করে। যখন এ আকর্ষণ বলের মান আয়নিক যৌগের ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যকার আকর্ষণ বল থেকে বেশি হয়, তখন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির অণু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। আর এভাবেই আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

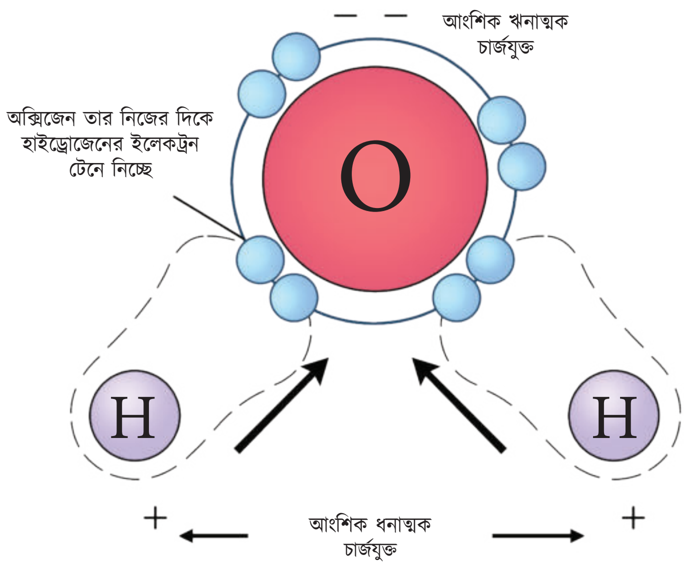

পানির অণুতে আংশিক ধনাত্মক আধান ও আংশিক ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি

অন্যদিকে, সমযোজী যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে না। ফলে, এসব যৌগ পানির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কাজ করে না। তাই, সমযোজী যৌগ পানিতে পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে না।

৭.৪.৩ ধাতব বন্ধন (Metallic bond)

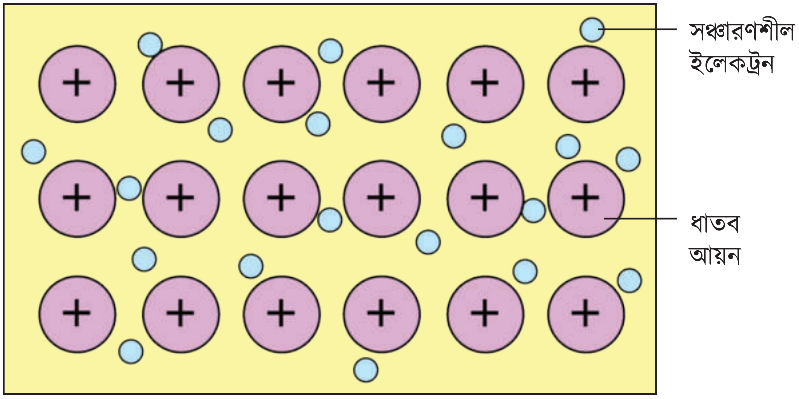

চিত্র ৭.৬ : ধাতব বন্ধন

আমরা আয়নিক বন্ধনে একটি ধাতু ও অপর একটি অধাতুর মধ্যে বন্ধন দেখেছি। আবার, সমযোজী বন্ধনে দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে বন্ধন দেখেছি। কিন্তু, যখন দুটি ধাতব পরমাণু একসঙ্গে বা কাছাকাছি আসে তখন কী ঘটে? আসলে, দুটি ধাতব পরমাণু কাছাকাছি এলে তাদের পরমাণুর মধ্যে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে ধাতব বন্ধন (Metallic bond) বলে। যেমন- তামা, লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিসপত্র, রুপা বা সোনার অলংকার, ইত্যাদিতে ধাতব বন্ধন বিদ্যমান।

আমরা জানি যে, ধাতব পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাধারণত 1টি, 2টি বা 3টি ইলেকট্রন থাকে। এসব ধাতুর আকার একই পর্যায়ে অবস্থিত অধাতুর চেয়ে বড়ো হয়। ফলে, তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম হয় এবং এরা সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হতে পারে। এই ধনাত্মক আয়নকে পারমাণবিক শাঁস (Atomic core) বলা হয়।

ধাতব পরমাণু থেকে ত্যাগ করা ইলেকট্রনগুলো পারমাণবিক শাঁসের মধ্যবর্তী স্থানে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা বা চলাচল করতে পারে। এ ধরনের ইলেকট্রনকে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন (Delocalized electron) বলে (চিত্র ৭.৬)। আসলে, এই ইলেকট্রনগুলো কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর অধীনে না থেকে পুরো ধাতব খণ্ডের সবকটি ধাতব আয়নের হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সব ধাতব আয়নই এই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের প্রতি এক ধরনের স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণে আকর্ষিত হয়। এ কারণে, দুটি ধাতব আয়ন তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং এটিই হচ্ছে ধাতব বন্ধনের কারণ। আবার, ধাতুর মধ্যে এ সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনই ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, নমনীয়তা, ইত্যাদি ধর্মের জন্য দায়ী।

৭.৫ আকরিক, ধাতু নিষ্কাশন ও সংকর ধাতু

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের ধাতু ব্যবহার করি। এসব ধাতুকে খনি থেকে আকরিক হিসেবে উত্তোলন করে লাভজনক উপায়ে সংগ্রহ বা নিষ্কাশন (extract) করে ব্যবহারোপযোগী করা হয়। এ সম্পর্কে জানতে হলে তোমাদের আকরিক ও ধাতু নিষ্কাশন সম্পর্কে জানতে হবে।

আকরিক

মাটির তলদেশ বা উপরিভাগে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান যেসব পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাতু বা অধাতু সংগ্রহ করা হয়, তা খনিজ হিসেবে পরিচিত। আর যেসব খনিজ থেকে লাভজনক উপায়ে ধাতু বা অধাতু সমূহকে সংগ্রহ বা নিষ্কাশন করা যায়, সে সকল খনিজকে আকরিক (ore) বলে।

উদাহরণ : গ্যালেনা (লেড সালফাইড, PbS) হচ্ছে লেড (Pb) ধাতুর আকরিক। কারণ, গ্যালেনা থেকে লাভজনকভাবে লেড (Pb) ধাতু সংগ্রহ বা নিষ্কাশন করা যায়। হেমাটাইট থেকেও লাভজনক উপায়ে আয়রন বা লোহাকে নিষ্কাশন করা যায় তাই হেমাটাইট (Haematite, Fe2O3) হলো আয়রন বা লোহার (Fe) আকরিক।

ধাতু নিষ্কাশন

আমরা জানি যে, সব ধাতুর সক্রিয়তা (reactivity) একরকম নয়। কিছু ধাতু কম সক্রিয়, কিছু মোটামুটি সক্রিয়, আবার কিছু ধাতু অধিক সক্রিয়। সে কারণে বিভিন্ন ধাতুর ধর্মও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এসব ধাতুর মধ্যে কিছু ধাতু মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং কিছু ধাতু তাদের সংশ্লিষ্ট আকরিকের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। যে পদ্ধতিতে ধাতুকে তার সংশ্লিষ্ট আকরিক থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাকে ধাতু নিষ্কাশন বলে।

এই ধাতুগুলোকে আকরিক থেকে পৃথক করতে নির্দিষ্ট কোনো একটি প্রক্রিয়া নেই। সেই কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন প্রক্রিয়াও ভিন্ন। যে সমস্ত ধাতু খুব কম সক্রিয়, যেমন- সোনা (Au), প্লাটিনাম (Pt), রুপা (Ag)- এদেরকে কখনো কখনো প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আবার অধিক সক্রিয় ধাতুগুলোকে তাদের অক্সাইড, সালফাইড, নাইট্রেট, কার্বনেট, ইত্যাদি যৌগ হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এসব সক্রিয় ধাতুগুলোকে আকরিক থেকে পৃথক করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যেমন- বিজারণ (reduction) পদ্ধতি, তড়িৎ বিশ্লেষণ (electrolysis) পদ্ধতি ইত্যাদি। ধাতুগুলোকে তাদের আকরিক থেকে পৃথক বা নিষ্কাশন করার জন্য আকরিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ, ঘনীকরণ, বিশুদ্ধকরণ ইত্যাদি বেশ কিছু ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। প্রত্যেক ধাতুর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সেই ধাতুরগুলোর জন্য উপযোগী ধাপসমূহ অনুসরণ করে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট আকরিক

থেকে পৃথক বা নিষ্কাশন করা হয়।

সংকর ধাতু

সংকর ধাতু হচ্ছে দুই বা ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণ থেকে তৈরি একটি পদার্থ। ধাতুগুলোর সংমিশ্রণ করার জন্য সাধারণত নির্ধারিত কতগুলো ধাতুকে একত্রে গলানো হয়। এই গলিত মিশ্রণকে ঠান্ডা করলে যে ধাতব মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে সংকর ধাতু বলে। প্রাচীন তাম্র যুগে মানুষ গয়না, বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে তামা (Cu) ব্যবহার করত। এই তামা বা কপার নরম ধাতু বলে সেগুলো বেশিদিন কার্যকর থাকত না। সেজন্য, সেই প্রাচীনকাল থেকেই কপার (Cu) -এর সঙ্গে টিন (Sn)-কে গলিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে, পরবর্তী কালে সে মিশ্রণকে ঠান্ডা করে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়। ব্রোঞ্জ হচ্ছে এক প্রকার সংকর ধাতু, এই ব্রোঞ্জ দিয়ে বিভিন্ন রকমের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে ব্যবহার করা হতো।

একইভাবে, লোহার (Fe) সঙ্গে কার্বন (C) মিশিয়ে যে সংকর ধাতু তৈরি করা হয় যাকে আমরা স্টিল বলি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করে করি তা স্টিল দিয়ে তৈরি। এছাড়া, স্টিল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হয়। আবার লোহার সঙ্গে কার্বন (C), নিকেল (Ni), ম্যাঙ্গানিজ (Mn) ও ক্রোমিয়াম (Cr) মিশিয়ে স্টেইনলেস স্টিল (Stainless steel) তৈরি করা হয় যা মরিচাবিহীন থাকে। রান্নার পাত্র ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অস্ত্র পচারের সরঞ্জাম তৈরিতে স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়। পাশের টেবিলে কয়েকটি পরিচিত সংকর ধাতুতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান ও পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

কয়েকটি সংকর ধাতুর বিভিন্ন উপাদান ও তাদের পরিমাণ

সংকর ধাতু	উপাদান ও পরিমাণ
ব্রোঞ্জ	কপার (Cu) 80-88% টিন (Sn): 5-12%
স্টিল	লোহা (Fe): 80-99% কার্বন (C): 1-2%
স্টেইনলেস স্টিল	লোহা (Fe): 72-74% ক্রোমিয়াম (Cr): 17-19% নিকেল (Ni): 7-9% এছাড়া খুব অল্প পরিমাণে কার্বন (C), সিলিকন (Si) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) রয়েছে।

অধ্যায় ৮

জিনতত্ত্ব ও বংশগতিবিদ্যা

অধ্যায় ৮
জিনতত্ত্ব ও বংশগতিবিদ্যা

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ জিনতত্ত্ব কী?
- ☑ জিনতত্ত্ব ও ও বংশগতিবিদ্যার সম্পর্ক
- ☑ মেন্ডেল, তার গবেষণা এবং বংশগতিবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পাঠ
- ☑ জীবে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ
- ☑ বংশগতিবিদ্যার নীতি ব্যবহার করে জীবের বৈশিষ্ট্য নির্বাচন (সংকরায়ন, জেনেটিক সিলেকশন)

৮.১ জিনতত্ত্ব

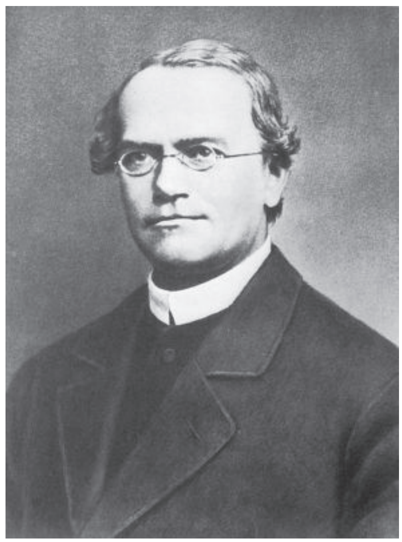

চিত্র ৮.১ : গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল

আমাদের জীবজগৎ অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে বিদ্যমান। আদিকাল থেকেই মানুষ তার জন্য উপকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে। তোমরা ইতোমধ্যে হরিপদ কাপালীর আবিষ্কৃত হরিধানের নাম শুনেছ, তিনি তার ধানক্ষেতে অজানা প্রজাতির ধান দেখতে পেয়ে সেখান থেকে বীজ তৈরি করেন যা পরবর্তী কালে উচ্চফলনশীল জাত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জেনেই ধানের উচ্চফলনশীল বৈশিষ্ট্যটি তার পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করেছিলেন। আবহমানকাল জুড়েই আমাদের দেশের কৃষকেরা এরূপ করে আসছে।

প্রজনন জীবের একটি স্বাভাবিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রজননের মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় এবং জীব তার নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখে। এভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরের প্রক্রিয়া বংশগতি (heredity) নামে পরিচিত। বংশগতির মৌলিক একক হলো জিন। তোমরা কোষের ক্রোমোজোমে যে ডিএনএ সম্পর্কে জেনেছ সেখানে জীবের জিনগুলো সজ্জিত থাকে। সাধারণত জিন দ্বারাই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের

গঠন, নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশ, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক সঞ্চালন পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জিনতত্ত্ব (Genetics) বলে। এই অধ্যায়ে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৮.২ গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল ও তার গবেষণা

গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1822–1884) তার গবেষণায় সর্বপ্রথম জীবের বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে স্থানান্তরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানী (চিত্র ৮.১) ছিলেন বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রবাসী একজন ধর্মযাজক। দীর্ঘ সাত বছর তিনি মটরশুঁটি গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বংশগতি সম্পর্কিত তার মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু মেন্ডেলের প্রকাশিত নিবন্ধটি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচরেই রয়ে যায়। মেন্ডেলের মৃত্যুর ১৬ বছর পর হিউগো দ্য ভ্রিস, কার্ল করেন্স এবং এরিক স্কেরমেক নামে তিনজন বিজ্ঞানী পৃথকভাবে কিন্তু একই সময়ে মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো এ বিজ্ঞানীরা তাঁদের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করার পর মেন্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। এভাবে মেন্ডেলের গবেষণার মাধ্যমে বংশগতির মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার ও প্রকাশের মাধ্যমে যে ভিত্তি রচিত হয় তার উপর নির্ভর করে জীববিজ্ঞানে বংশগতিবিদ্যা বা জিনতত্ত্ব নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার বিকাশ ঘটে। এ কারণে মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক (Father of Genetics) বলে অভিহিত করা হয়।

মেন্ডেলের গবেষণা ও জীবের বৈশিষ্ট্য নির্বাচন

জোহান গ্রেগর মেন্ডেল ব্যক্তি জীবনে একজন ধর্মযাজক হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন খাঁটি বিজ্ঞানী ছিলেন। বংশগতিবিদ্যা পরীক্ষার জন্য তিনি তার মঠের বাগানে নিয়ন্ত্রিত-পরাগায়নের মাধ্যমে সংকরায়ণ (Hybridization) করার জন্য মটরশুঁটি উদ্ভিদকে নির্বাচন করেন এবং 1856 সাল থেকে তাঁর গবেষণা শুরু করেন। মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার জন্য মটরশুঁটি গাছকে নমুনা হিসেবে মনোনীত করার পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। যেমন- (১) মটরশুঁটি গাছ একবর্ষজীবী হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যেই সংকরায়ণ পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়। (২) এটি একটি উভলিঙ্গী উদ্ভিদ এবং স্বপরাগায়নের মাধ্যমে যৌন প্রজনন সম্পন্ন করে। (৩) ফুলগুলো আকারে বড়ো হওয়ায় মটরশুঁটি গাছে অতি সহজেই সংকরায়ণ ঘটানো যায়। (৪) পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবককে ঘিরে দলমণ্ডল (Corolla) এমনভাবে সাজানো থাকে যে পরনিষেকের (Cross fertilization) কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ফলে বিভিন্ন জাতের মটরশুঁটি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো খাঁটি বা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। (৫) মটরশুঁটি গাছে একাধিক সুস্পষ্ট তুলনামূলক বিপরীত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই অপত্য বংশে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রকাশ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। (৬) সংকরায়ণে সৃষ্ট বংশধরগুলো উর্বর (fertile) প্রকৃতির হওয়ায় সেগুলো নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

মেন্ডেল বিভিন্ন উৎস থেকে 34 ধরনের মটরশুঁটি উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করে আশ্রমের বাগানে প্রায় এক বৎসর প্রত্যেক ধরনের বীজের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা শেষে তিনি কাণ্ডের

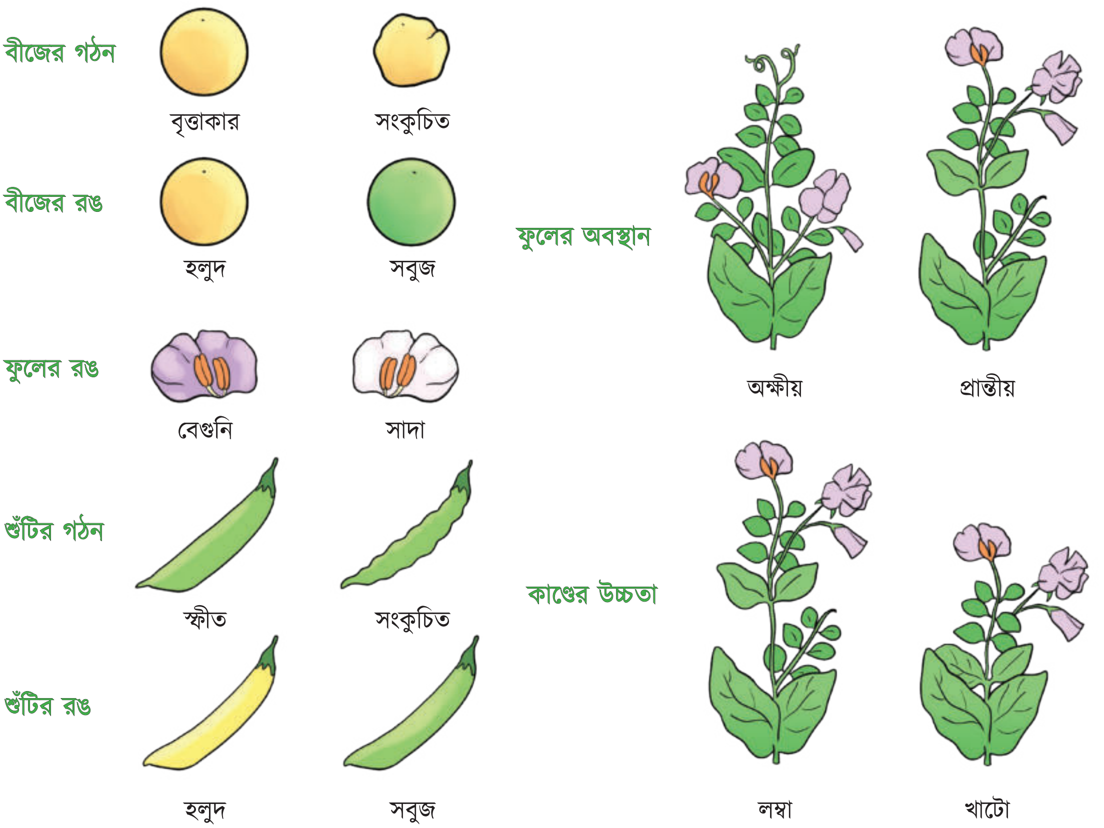

চিত্র ৮.২ : মটরশুঁটি গাছের সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য

দৈর্ঘ্য, ফুলের অবস্থান, ফুলের রং, ফলের বর্ণ, ফলের আকৃতি, বীজের বর্ণ এবং বীজের আকৃতি এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের (trait) প্রত্যেকটির জন্য দুটি করে বিপরীত লক্ষণসম্পন্ন মোট 14টি খাঁটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেন। অর্থাৎ কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্যের জন্য লম্বা ও খাটো এই দুটি বিপরীত লক্ষণ, ফুলের বর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য সাদা ও বেগুনি এই দুটি লক্ষণ, বীজের আকৃতির জন্য গোলাকার ও কুঞ্চিত এই দুটি লক্ষণ ইত্যাদি (চিত্র ৮.২)। শুরুতে মেন্ডেল লম্বা এবং খাটো এই বিপরীত লক্ষণযুক্ত দুধরনের মটরশুঁটি গাছ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এটি যেহেতু শুধু কান্ডের দৈর্ঘ্য, এই একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা ছিল তাই এটিকে মনোহাইব্রিড ক্রস (monohybrid cross) বলা হয়ে থাকে (mono অর্থ একটি)।

পরীক্ষা শুরু করার আগে তিনি মটরশুঁটি গাছের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে নেন। এরপর শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত একটি লম্বা উদ্ভিদের সঙ্গে শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত একটি খাটো উদ্ভিদের কৃত্রিম পরাগসংযোগ ঘটান অর্থাৎ লম্বা উদ্ভিদের পরাগরেণু নিয়ে খাটো উদ্ভিদের গর্ভমুন্ডে স্থাপন করেন। লম্বা ও খাটো উদ্ভিদের মাঝে সংকরায়ণের পরেও সবকটি উৎপন্ন বীজ থেকে শুধু লম্বা উদ্ভিদ পাওয়া যায়। প্রথম সংকরায়ণের ফলে পাওয়া এই উদ্ভিদগুলোকে মেন্ডেল প্রথম প্রজন্ম বা F_1 বলে নামকরণ করেন। এবারে তিনি F_1 প্রজন্মের

উদ্ভিদগুলোর নিজেদের মধ্যে পরাগসংযোগ করে সংকরায়ণ ঘটান। দ্বিতীয়বার সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় প্রজন্ম F_2 তে 3:1 অনুপাতে লম্বা এবং খাটো উদ্ভিদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ F_1 বংশধরের দৃশ্যমান লম্বা উদ্ভিদের মাঝে কোনোভাবে খাটো উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত ছিল, যেটি দ্বিতীয়বার সংকরায়ণের সময় বের হয়ে এসেছে।

পরবর্তী কালে মেন্ডেল বীজের বর্ণ (লক্ষণ হলুদ কিংবা সবুজ) এবং বীজের আকার (লক্ষণ গোলাকার কিংবা কুঞ্চিত) এই দুটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন, দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষার কারণে এটিকে ডাইহাইব্রিড ক্রস (dihybrid cross, di অর্থ দুই) বলা হয়। একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত হলুদ বর্ণ এবং গোলাকার বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদের সঙ্গে অপর একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত সবুজ বর্ণ এবং কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদের সংকরায়ণে দেখা গেল F_1 প্রজন্মের সবকটি উদ্ভিদই হলুদ বর্ণের এবং গোলাকার বীজ উৎপন্ন করে। F_1 প্রজন্মের উদ্ভিদগুলোর নিজেদের মধ্যে সংকরায়ন করে F2 প্রজন্মের মাঝে দেখা গেল, 16টি বংশধরের মধ্যে 9টি হলুদ-গোল, 3টি হলুদ-কুঞ্চিত, 3টি সবুজ-গোল ও 1টি সবুজ-কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদ (ছবি দ্রষ্টব্য)।

প্রথম দৃষ্টিতে তোমাদের কাছে মেন্ডেলের পর্যবেক্ষণগুলোকে যথেষ্ট জটিল মনে হলেও ম্যান্ডেলের দুটি সূত্র ব্যবহার করে তুমি খুব সহজেই এই পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। তার আগে তোমাকে জীবে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত দু-একটি বিষয় জেনে নিতে হবে।

৮.৩ জীবে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

মেন্ডেলের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জীবে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে জীবদেহে প্রাথমিক স্তরে জিনের মাধ্যমে বংশ হতে বংশান্তরে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয়। ফুলের রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় মেন্ডেল লক্ষ করেন যে মটরশুঁটি ফুলের রং হয় সাদা নয়তো বেগুনি হয়, এদের মাঝামাঝি কিছু হয় না। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জিন ফুলের রং নির্ধারণ করে থাকে। প্রতিটি স্বতন্ত্র উদ্ভিদের প্রত্যেকটি জিনের দুটি করে প্রতিরূপ আছে যার একটি পিতা এবং অন্যটি মাতার কাছ থেকে এসেছে। জিনের এই প্রতিরূপ দুটিকে অ্যালিল (Allele) বলা হয়। ডিপ্লয়েড জীবের দুটি অ্যালিল একই রকম বা ভিন্ন হতে পারে। যদি অ্যালিল দুটি একই রকম হয় তখন তাকে হোমোজাইগাস বলে, আর ভিন্ন হলে হেটারোজাইগাস বলা হয়। কোনো নির্দিষ্ট জীবের অ্যালিলগুলোকে তার জিনোটাইপ এবং দৃশ্যমান বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তার ফিনোটাইপ বলে।

হেটারোজাইগাস জীবের ভিন্ন অ্যালাইল দুটির যে অ্যালাইলটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ ফিনোটাইপে প্রাধান্য বিস্তার করে) সেটি প্রকট জিন নামে পরিচিত। মেন্ডেলের লম্বা ও খাটো উদ্ভিদের পরীক্ষায় F_1 প্রজন্মের সবকটি উদ্ভিদ লম্বা হয়েছিল কারণ উদ্ভিদের লম্বা লক্ষণের অ্যালিলটি ছিল প্রকট। অপরদিকে যে জিনটি জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে (বা ফিনোটাইপে) প্রকাশিত হয় না তাকে প্রচ্ছন্ন জিন বলে। আগের উদাহরণে সেটি ছিল খাটো উদ্ভিদের জিন।

মেন্ডেল-এর মতবাদ

মেন্ডেল নিজে কোনো মতবাদ প্রবর্তন করেননি, তিনি শুধু তাঁর গবেষণাপত্রে সংকরায়ণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের তত্ত্বীয় ও পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে কার্ল করেন্স, যিনি মেন্ডেলের গবেষণার পুনরাবিষ্কার প্রকাশ করেছিলেন, মেন্ডেলের আবিষ্কারকে বংশগতির মৌলিক দুটি সূত্র হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য বলে প্রচার করেন। যেহেতু সূত্রদুটি মেন্ডেলের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত, তাই সূত্রদুটি মেন্ডেলের সূত্র নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, মেন্ডেলের সময় আধুনিক জিনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি বলে জিনের ভূমিকাটিকে 'ফ্যাক্টর' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। নিচে মেন্ডেল-এর সূত্র দুটি বর্ণনা করা হলো।

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation) :

সংকর (hybrid) জীবে বিপরীত লক্ষণের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জননকোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

আধুনিক জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

আমরা এখন এই সূত্র দিয়ে মেন্ডেলের লম্বা ও খাটো বৃক্ষের সংকরায়নের বেলায় F2 বংশধরের 3:1 অনুপাতকে ব্যাখ্যা করতে পারব।

ধরে নিই, লম্বা (tall) মটরশুঁটির জন্য দায়ী জিন হচ্ছে T এবং খাটো মটরশুঁটির জন্য দায়ী জিন হচ্ছে t; কাজেই বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি গাছের অ্যালিল দুটি হবে TT এবং বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি গাছের অ্যালিল দুটি হবে tt। যেহেতু দুটি অ্যালিলই হুবহু একরকম তাই এই দুটি হোমোজাইগাস। আগের মতো আমরা ধরে নিই F_1 হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম এবং F_2 দ্বিতীয় প্রজন্ম।

বিশুদ্ধ লম্বা (TT) মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে অপর একটি বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি গাছের (tt) সংকরায়ণ ঘটালে দুটি গাছের পরাগায়নের সময় লম্বা গাছের T অ্যালিল খাটো গাছের t অ্যালিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপত্য গাছের অ্যালিলদুটি হবে Tt এবং আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু লম্বা গাছের অ্যালিল T প্রকট গুণসম্পন্ন তাই F_1 বংশধরের সকল অপত্য মটরশুঁটি গাছের কাণ্ড হবে লম্বা। উভয় জিন দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকলেও বিনষ্ট বা একীভূত হয়ে যায় না বরং স্বকীয়তা বজায় রেখে অক্ষুণ্ন থাকে।

F_1 প্রজন্মের গাছগুলো নিজেদের ভেতর পরাগায়ন করা হলে F_2 প্রজন্মের সম্ভাব্য জিনোটাইপগুলো হবে TT, Tt, tT এবং tt (চিত্র ৮.৩)। T প্রকট অ্যালিল হওয়ার কারণে TT, Tt, tT গাছগুলো হবে লম্বা এবং tt গাছটি হবে খাটো। অন্যভাবে বলা যায় প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য বা ফিনোটাইপের ভিত্তিতে F_2 প্রজন্মের মাঝে লম্বা এবং খাটো গাছের অনুপাত যথাক্রমে 3:1।

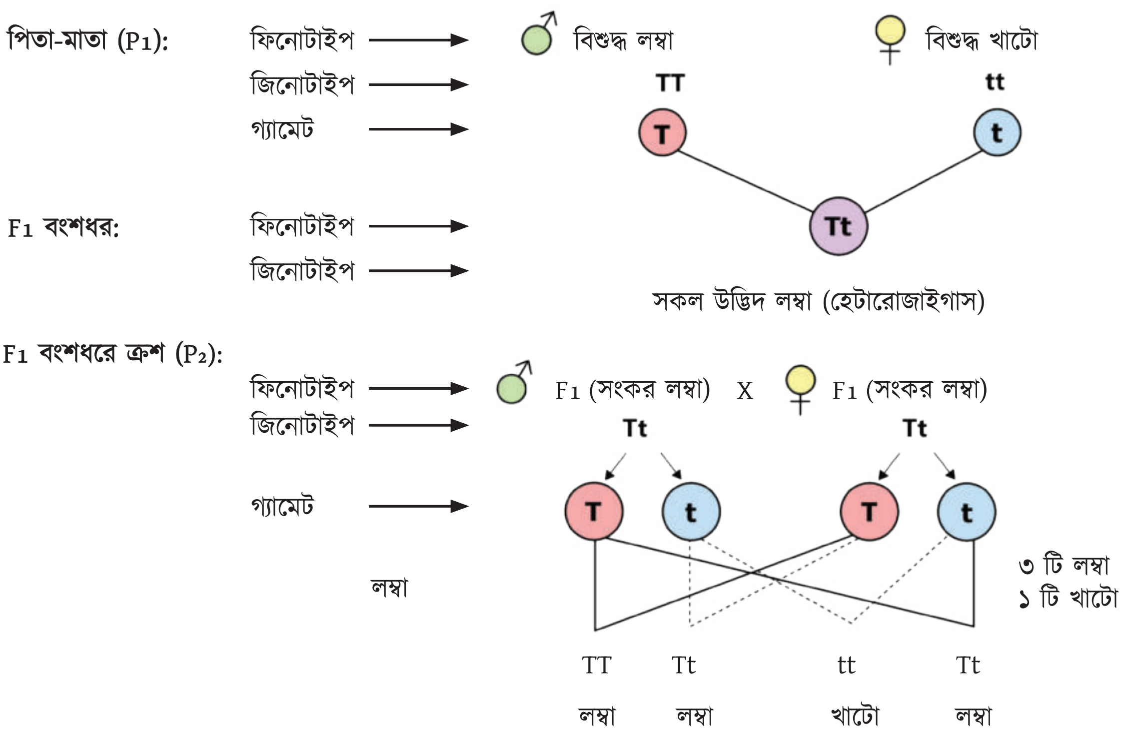

চিত্র ৮.৩ : মনোহাইব্রিড ক্রসে দুই প্রজন্ম

F_2 প্রজন্মের সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 3টি প্রকট লক্ষণধারী (লম্বা) গাছের মধ্যে 1টি হোমোজাইগাস (TT), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস (Tt, tT)। যে খাটো লক্ষণটি (t) F_1 প্রজন্মে অপ্রকাশিত ছিল, F_2 প্রজন্মে হোমোজাইগাস (tt) হিসেবে তার প্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে, যে শুদ্ধ হোমোজাইগাসটি (TT) F_1 প্রজন্মে অনুপস্থিত ছিল, সেটিও F_2 প্রজন্মে ফিরে এসেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে প্রথম F_1 প্রজন্মে T ও t একসঙ্গে থাকলেও পরস্পরের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়নি, শুধু গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে গেছে।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট গাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে প্রথম প্রজন্মে (F_1) কেবল প্রকট লক্ষণগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় লক্ষণগুলো জোড়া ভেঙে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করবে।

আধুনিক জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

এ সূত্র প্রমাণের জন্য মেন্ডেল দু জোড়া বিপরীতধর্মী লক্ষণসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটান। এমন দুটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) মটরশুঁটি গাছ নেওয়া হলো যার একটি গোল ও হলুদ বর্ণের বীজ এবং অন্যটি কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

ধরা যাক, হলুদ লক্ষণের জিনের প্রতীক হচ্ছে Y (বড়ো অক্ষরের), সবুজ লক্ষণের জিনের প্রতীক হচ্ছে y (ছোটো অক্ষরের), বীজের গোল লক্ষণের জিনের প্রতীক হচ্ছে R, কুঞ্চিত লক্ষণের জিনের প্রতীক হচ্ছে r, এবং আগের মতো প্রথম প্রজন্ম হচ্ছে F_1, দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছে F_2।

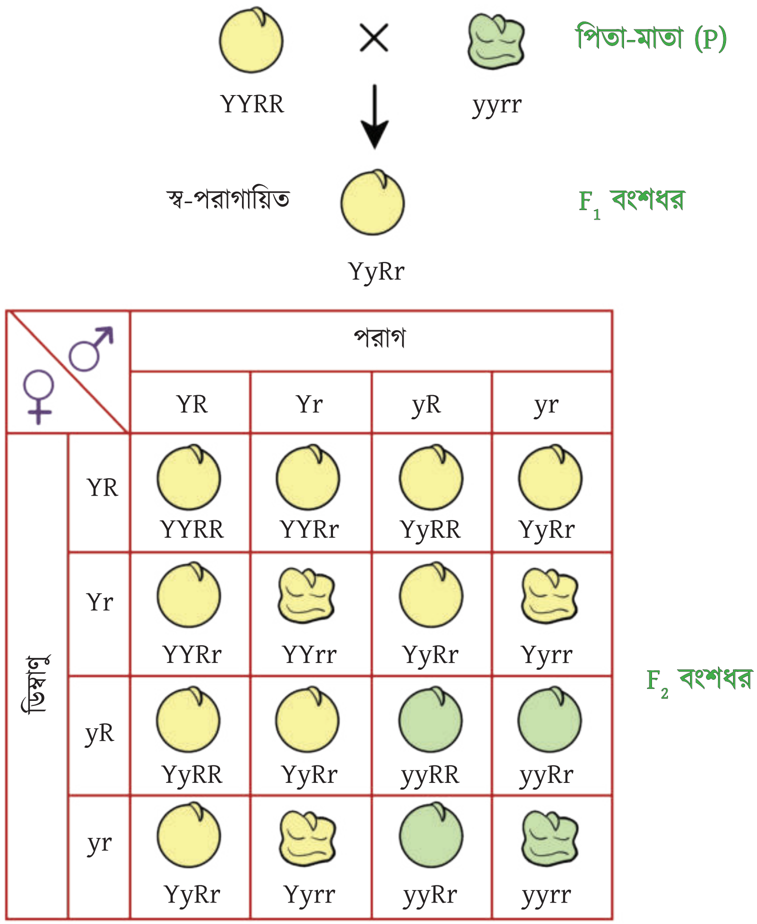

চিত্র ৮.৪ : ডাইহাইব্রিড ক্রসে দুই প্রজন্ম

মেন্ডেল-এর মতে, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে জিন দায়ী। অতএব প্রতি জিনের জন্য দুটি করে অ্যালিল হিসেবে হলুদ (YY) বর্ণের ও গোল (RR) বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে YYRR এবং সবুজ (yy) ও কুঞ্চিত (rr) বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে yyrr। কাজেই শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত দুইটি বীজের আকার এবং বর্ণের জন্য YYRR এবং yyrr জিনোটাইপের দুটি গাছের সংকরায়ণ করে যে অপত্য গাছ পাওয়া যাবে তার F_1 প্রজন্মের জিনোটাইপ হবে YyRr। যেহেতু হলুদ বর্ণের (Y) এবং গোলাকার (R) অ্যালিল, সবুজ (y) এবং কুঞ্চিত (r) বর্ণের অ্যালিলের উপর প্রকট তাই F_1 বংশধরের সবকটি গাছের বীজ হবে গোলাকৃতির এবং হলুদ বর্ণের।

দ্বিতীয় সংকরায়ণের সময় F_1 বংশধরের YyRr জিনোটাইপের পুং ও স্ত্রী জনকোষ হতে পারে YR, Yr, yR এবং yr, এগুলো পরাগায়নের মাধ্যমে মিলিত হয়ে 4 × 4 = 16 ধরনের জিনোটাইপ তৈরি করতে পারে (চিত্র ৮.৪)। এরমাঝে গোল-হলুদ, কুঞ্চিত-হলুদ, গোল-সবুজ এবং কুঞ্চিত-সবুজ এই চার ধরনের বৈশিষ্ট্য বা ফিনোটাইপ হওয়া সম্ভব। যেহেতু গোলাকার (R) এবং হলুদ বর্ণের (Y) অ্যালিল, কুঞ্চিত (r) এবং সবুজ (y) বর্ণের অ্যালিলের উপর প্রকট তাই আমরা দেখতে পাই 16 ধরনের জিনোটাইপের ভেতর ফিনোটাইপ গোল-হলুদ 9 বার, কুঞ্চিত-হলুদ 3 বার, গোল-সবুজ 3 বার এবং কুঞ্চিত-সবুজ 1 বার পাওয়া যায়। অর্থাৎ এদের অনুপাত 9:3:3:1, ঠিক যেমনটি মেন্ডেল দেখেছিলেন।

৮.৪ জিনতত্ত্ব ও বংশগতিবিদ্যার সম্পর্ক

ইতোমধ্যেই তোমরা জেনেছ যে বংশগতি বা হেরিডিটি (Heredity) হলো বাবা-মা হতে বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে জিনগত বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হওয়া। এর ফলে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানের জিনতত্ত্ব (Genetics) শাখায় বংশগতি সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়াদির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানী উইলিয়াম বেটসন (William Bateson) 1906 সালে প্রথম Genetics শব্দটি ব্যবহার করেন যা গ্রিক শব্দ Genno থেকে উদ্ভূত, যার ইংরেজি অর্থ to give birth।

গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল তাঁর সংকরায়ণ পরীক্ষার ফল থেকে বুঝতে পারেন যে কোনো জীবের প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি উপাদান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উপাদান জীবদেহে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট গঠনকালে ঐ উপাদান সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু উপাদানটি কী, গ্যামেটের কোথায় এটি অবস্থিত এবং এসব উপাদান কীভাবে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে—এসব বিষয়ে মেন্ডেল অবগত ছিলেন না। 1900 সালে মেন্ডেল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারের পর ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা এবং দেহকোষে সেগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে। জোড়ার একটি পিতার কাছ থেকে, অপরটি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। মানুষের বেলায় দেহকোষের 46টি ক্রোমোজোমের 23টি আসে পিতার কাছ থেকে, বাকি 23টি মায়ের কাছ থেকে। শুধু শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে 46টি বা 23 জোড়ার পরিবর্তে 23টি ক্রোমোজোম থাকে। এই দুটি কোষের মিলনে 46টি ক্রোমোজোম নিয়ে জাইগোট কোষের সৃষ্টি হয়, যেটি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়।

মেন্ডেল একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া ফ্যাক্টর বা উপাদানের কথা বলেছিলেন, যার একটি পিতা ও একটি মাতার কাছ থেকে আসে, যেমনটি ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। 1902 সালে বিজ্ঞানী সাটন (S.W. Sutton) ও বোভেরি (T. Bovery) পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে মিলের কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। এ নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন জীবজন্তুর উপর গবেষণা

চলেছে। পরে দেখা গেল যে মেন্ডেলের উপাদান বা জিনের অবস্থান ক্রোমোজোমে, তাই বংশানুক্রমিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে ক্রোমোজোম আর উপাদানের মধ্যে এত সাদৃশ্য। গবেষণার ফলাফল থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জিন ও ক্রোমোজোম অনেক দিক দিয়ে একই রকম আচরণ করে। তাছাড়া বংশগতি নির্ধারণের সময় জিন ও ক্রোমোজোম অভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে। একেই বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব বলা হয়।

অধ্যায় ৯
জৈব অণু

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ৯ জৈব অণু

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ জৈব অণু কী
- ☑ প্রধান প্রধান জৈব অণু
- ☑ কার্বোহাইড্রেট
- ☑ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড
- ☑ প্রোটিন
- ☑ লিপিড
- ☑ জৈব অণুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহাবস্থানে আমাদের এই সুন্দর জীবজগৎ গঠিত। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে কোথা থেকে এদের সবার উৎপত্তি হয়েছে। সব প্রাণী কি একই জিনিস দিয়ে সৃষ্টি কিংবা উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে কি কোনো উৎপত্তিগত পার্থক্য রয়েছে? আবার মানুষ সবুজ শাকসবজি খেতে পারে, কিন্তু ঘাস হজম করতে পারে না। অথচ গরুর প্রধান খাদ্যই হচ্ছে ঘাস। তার মানে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিশ্চয়ই গঠনগত কিছু পার্থক্য রয়েছে যা তাদেরকে আলাদা করে। সাধারণত জীবদেহ গঠনে অসংখ্য অণু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এদেরকে জৈব অণু বলে। এই অধ্যায়ে আমরা জৈব অণু নিয়ে আলোচনা করব।

৯.১ জৈব অণু (biomolecule)

সজীব কোষ অসংখ্য অণু দিয়ে গঠিত। এই অণুগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র অণু এবং বৃহৎ অণু যেগুলো একত্রে জৈব অণু বলে পরিচিত। সাধারণত 25 টিরও বেশি মৌলিক পদার্থ নিয়ে এসব জৈব অণু গঠিত এদের ভিতরে ছয়টি মৌলিক পদার্থ জৈব অণুর সাধারণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O), ফসফরাস (P) ও সালফার (S)। এসব মৌলিক পদার্থের ইংরেজি বানানের আদ্যাক্ষর নিয়ে যে শব্দসংক্ষেপ করা হয়েছে, তা হলো CHNOPS। তোমরা ইতোমধ্যে কোষ সম্বন্ধে বিস্তারিত পড়েছ, এই জৈব অণু দিয়েই সকল কোষ তৈরি হয়। জীবজগতের গঠনের প্রেক্ষিতে CHNOPS-এর ছয়টি পরমাণুর ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু হচ্ছে কার্বন, এ কারণে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে জীবনের ভিত্তি হচ্ছে কার্বন।

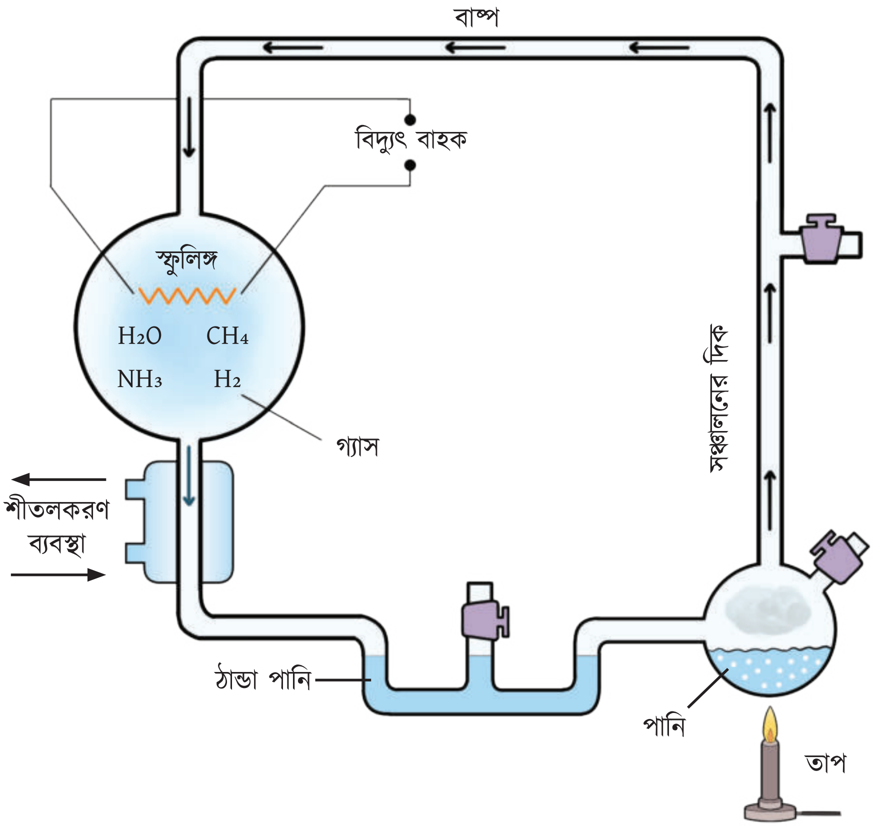

চিত্র ৯.১ : মিলার-উরের অজৈব অণু থেকে জৈব অণু সংশ্লেষণ করার পরীক্ষা।

জীবদেহ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড এবং লিপিড নামে চার ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। এদের ভেতর প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড এই দুটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া সজীব বস্তু তৈরি হয় না। এর থেকে ধারণা করা যায়, সৃষ্টির শুরু থেকেই জৈব অণুগুলো তৈরি হয়েছিল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সেগুলো সংযুক্ত হয়ে প্রথম কোষ তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে বজ্রপাত অথবা ঘন ঘন বৈদ্যুতিক ঝড়, এবং শক্তিশালী সৌর বিকিরণ ইত্যাদি কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে যার ফলে আদি-পৃথিবীতে অজৈব অণু থেকে এই জৈব অণুগুলো তৈরি হয়েছিল। এ ধারণাকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে 1953 সালে বিজ্ঞানী স্ট্যাইনলি মিলার এবং হ্যারল্ড উরে পরীক্ষাগারে একটি আদি পৃথিবীর কৃত্রিম রূপ তৈরি করেছিলেন (চিত্র ৯.১)। যেখানে পুরোপুরি আবদ্ধ একটি সিস্টেমে প্রাচীন পৃথিবীতে যেসব উপাদান ছিল, অর্থাৎ পানি, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণকে ক্রমাগত পরিচলন করেছিলেন। সেই সময়কার বজ্রপাতের অনুকরণে সেখানে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ করা হয়েছিল। এক সপ্তাহ পর সেখানে তাঁরা অ্যামিনো অ্যাসিড নামক জৈব অণুকে সংশ্লেষিত হতে দেখেন, অর্থাৎ তারা প্রমাণ করেন প্রাকৃতিক পরিবেশে অজৈব অণু থেকে জৈব অণু তৈরি হওয়া সম্ভব।

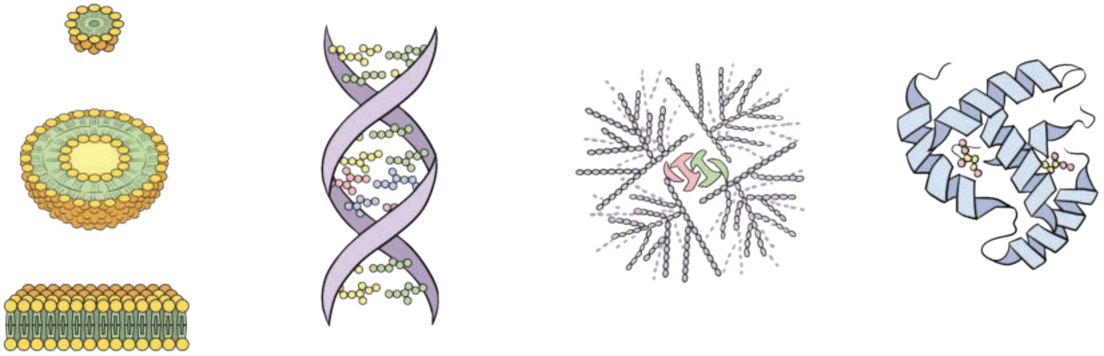

লিপিড নিউক্লিক এসিড কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন

চিত্র ৯.২ : চার ধরনের জৈব অণু

জীবদেহের মূল উপাদান, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও লিপিড যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় তাদেরকে কোষের জীবজ পলিমার বলে। যেমন- কার্বোহাইড্রেট সরল সুগারের, প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডের, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড মনোনিউক্লিওটাইডের এবং লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিডের জীবজ পলিমার। এই অধ্যায়ে আমরা এই চার ধরনের জৈব অণু (চিত্র ৯.২) সম্পর্কে আলোচনা করব।

৯.২ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা

জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক, সঞ্চয়ী উপাদান ও শক্তির ভান্ডার হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট এক ধরনের জটিল প্রাকৃতিক জৈব যৌগ যা প্রধানত কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O) মৌল নিয়ে গঠিত। কার্বোহাইড্রেটে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু 1:2:1 অনুপাতে যুক্ত থাকে। উদ্ভিদের সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে

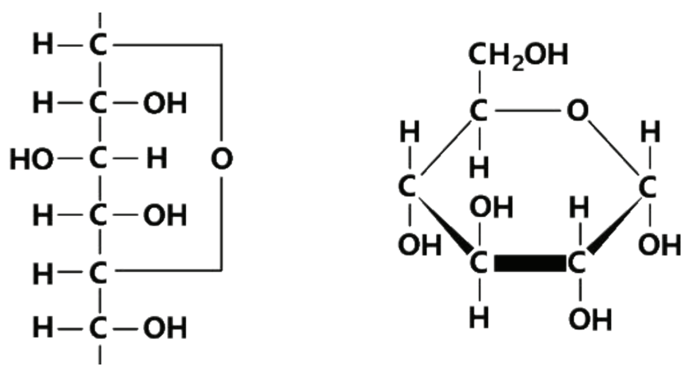

চিত্র ৯.৩ : গ্লুকোজের $C_nH_{2n}O_n$ ধরনের অণু $C_6H_{12}O_6$

ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়। আমাদের প্রতিদিনের খাবারের একটি বড়ো অংশ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। আমাদের শরীরে পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত মূল 7টি পুষ্টি উপাদানের (পানি, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন এবং

মিনারেলস) একটি হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা। শর্করা আমাদের শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকলে তা শরীরে ফ্যাট বা চর্বি হিসেবে জমিয়ে রাখে। শরীরে শর্করার ভাঙনের পর নানা রকম ক্ষুদ্র সুগার অণুতে বিভক্ত হয় এবং পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতম অংশে এসে পৌঁছালে সেটি শরীরের নানা স্থানে শোষিত হয়।

কয়েকভাবে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়, একটি তোমরা সবাই জানো। এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়—যেটি সুগার নামে পরিচিত। গ্লুকোজ (চিত্র ৯.৩) সুগারের একটি উদাহরণ। অন্যটি স্টার্চ, যেটি মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়। আমাদের পরিচিত উদ্ভিদ থেকে পাওয়া চাল, ময়দা, আলু ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ রয়েছে।

কার্বোহাইড্রেটের আণবিক গঠন, আণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এদের ভেতর সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং সরলতম এককের নাম মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides)। এটি অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক একক হিসেবে কাজ করে। এদের সাধারণ সংকেত হলো $C_nH_{2n}O_n$। এদের অণুতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা 5টি হলে তাকে পেন্টোজ সুগার বলে। ৯.৪ চিত্রে দুটি পেন্টোজ সুগারের অণু দেখানো হয়েছে, এর একটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার এবং অন্যটি রাইবোজ সুগার। রাইবোজ এবং ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার গঠনগত দিক থেকে একই কিন্তু পার্থক্য শুধু এই যে, ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের একটি কার্বনে অক্সিজেন নেই।

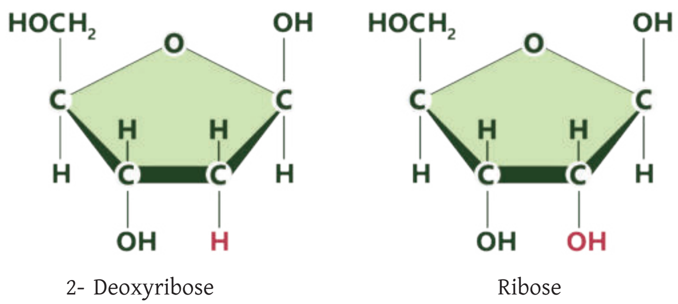

চিত্র ৯.৪ : দুই ধরনের পেন্টোজ সুগার

তোমরা নিউক্লিয়িক অ্যাসিড পড়ার সময় দেখতে পাবে এই পেন্টোজ সুগার জীবজগতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক অণু নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

কার্বোহাইড্রেটের শরীরবৃত্তীয় ভূমিকা :

১। কার্বোহাইড্রেট শরীরে শক্তি সরবরাহের প্রধান উৎস। খাদ্য হিসেবে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করা হলে সেটি ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় এবং বেশিরভাগ কোষ শক্তির জন্য এই গ্লুকোজ ব্যবহার করে থাকে অথবা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে।

২। কার্বোহাইড্রেট থেকে পাওয়া গ্লুকোজ মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একমাত্র শক্তি সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে।

৩। কার্বোহাইড্রেট শরীরের পেশিতে শক্তি সরবরাহ করে থাকে। গ্লাইকোজেন, হৃৎপেশির শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস।

৪। প্রোটিনকে যেন তার নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ শরীরবৃত্তীয় কাজ থেকে বিরত থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে না হয় কার্বোহাইড্রেট তার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৫। অপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এবং সেলুলোজ, পেকটিন জাতীয় জটিল শর্করা মল তৈরিতে এবং নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৬। খাদ্যে যথেষ্ট ফাইবারসমৃদ্ধ জটিল কার্বোহাইড্রেড রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৯.৩ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (nucleic acid)

নিউক্লিয়িক অ্যাসিড আসলে বৃহৎ জৈব অণু, যা প্রত্যেক জীবের জন্য অপরিহার্য। নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজম ও রাইবোজোমে যে জৈব অণু থাকে, তাকে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বলে। নিউক্লিয়াস ও রাইবোজোম ছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থাকে। নিউক্লিয়িক অ্যাসিড পেন্টোজ সুগার, নাইট্রোজেন বেস বা ক্ষারক, এবং ফসফোরিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব অণু, যা জীবের বংশগতির ধারাসহ সব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়িক অ্যাসিড দুই প্রকার- ডিএনএ এবং আরএনএ।

৯.৩.১ ডিএনএ (DNA)

ডিএনএ বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড কোষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থায়ী রাসায়নিক অণু। এটি কোষের বা সামগ্রিকভাবে জীবের সমস্ত জৈবিক কাজ ও বংশগত বৈশিষ্ট্য ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কয়েক ধরনের ভাইরাস ছাড়া সব রকমের সজীব কোষেই ডিএনএ থাকে। ক্রোমোজোম ডিএনএ ও কিছু প্রোটিন দ্বারা তৈরি। ডিএনএ এই প্রোটিনের সঙ্গে পেঁচিয়ে লম্বা সুতার মতো তৈরি করে, যেটি ক্রোমোজোম নামে পরিচিত। এছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়া, ও প্লাস্টিডের মধ্যেও ডিএনএ থাকতে পারে। নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবকোষে ডিএনএ -এর পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। DNA এক ধরনের রাসায়নিক জৈব যৌগের অণুগুলো নিউক্লিওটাইড নামক অনেকগুলো ছোটো অণু দ্বারা গঠিত। ৯.৫ চিত্রে ডিএনএ-এর গঠন দেখানো হয়েছে।

চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছ যে প্রতিটি নিউক্লিওটাইড একটি পেন্টোজ সুগার, একটি ফসফেট গ্রুপ এবং একটি নাইট্রোজেনাস ক্ষারক বা বেস দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়িক অ্যাসিডে দু ধরনের পেন্টোজ সুগার থাকে। এর একটি রাইবোজ সুগার এবং অন্যটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। ডিএনএ-এর পেন্টোজ সুগার হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। ডিএনএ-এর চারটি নাইট্রোজেনাস বেস রয়েছে যেগুলো হচ্ছে অ্যাডেনিন (adenine), গুয়ানিন (guanine), সাইটোসিন (cytosine) ও থাইমিন (thymine)।

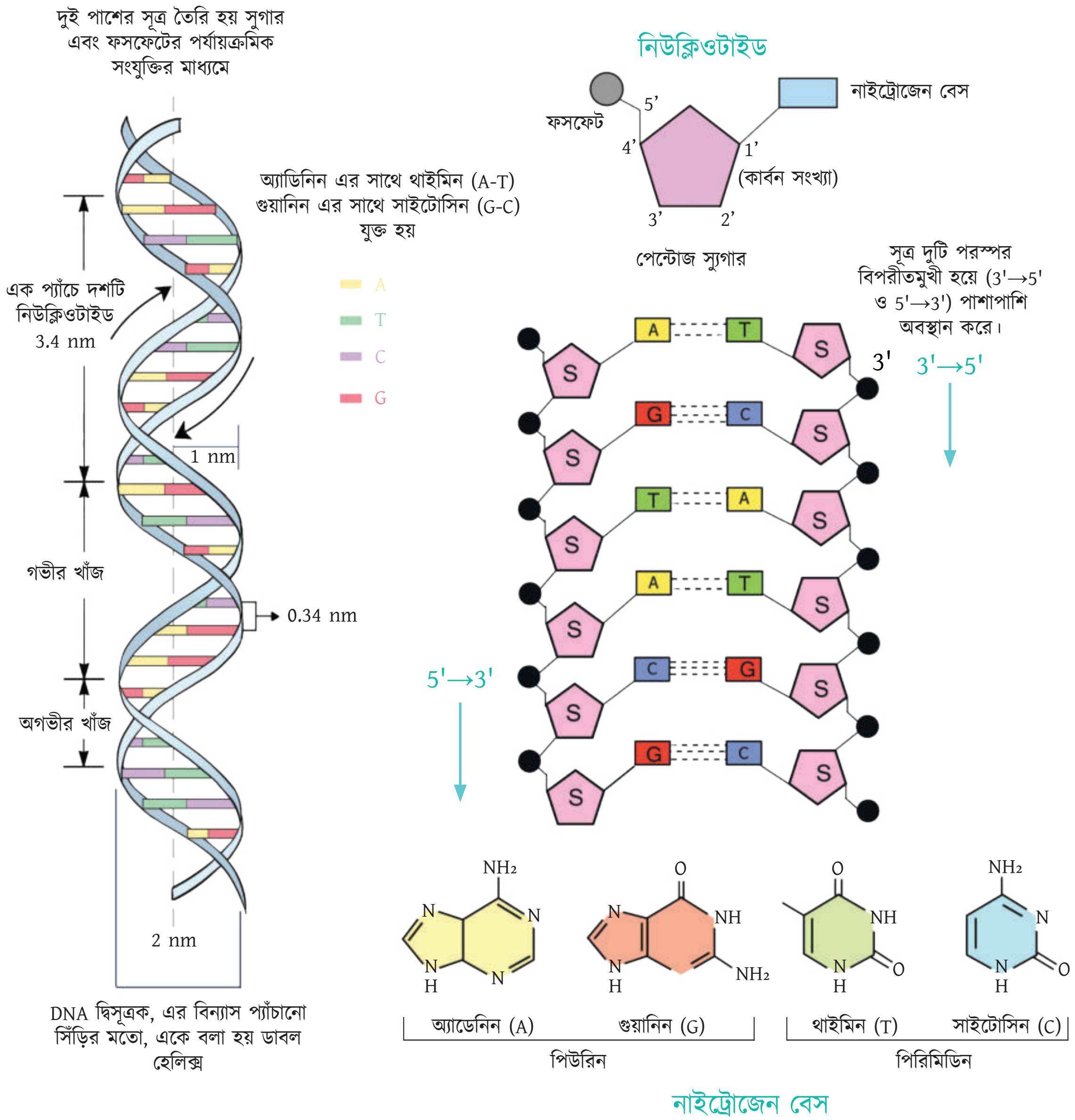

চিত্র ৯.৫ : ডিএনএ বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের গঠন

ডিএনএ দুই সূত্রবিশিষ্ট অসংখ্য নিউক্লিওটাইডের একটি সর্পিলাকার গঠন, এর একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। একটি ডিএনএ অণুর দুটি ডিএনএ সূত্র বা স্ট্র্যান্ড একে অপরের চারপাশে পেঁচিয়ে একটি সর্পিল আকৃতি তৈরি করে যাকে ডাবল হেলিক্স গঠন (Double Helix Structure) হয়। বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক (James Watson and Francis Crick) 1953 সালে ডিএনএ -এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ডিএনএ ডবল হেলিক্স মডেল প্রস্তাব করেন যা তাদেরকে 1963 সালে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়।

ডিএনএ-এর কাজ :

- ☑ জীবের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।
- ☑ ক্রোমোজোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
- ☑ বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- ☑ জীবের সব শারীরতাত্ত্বিক এবং জৈবিক কাজগুলোর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
- ☑ ডিএনএ -এর কাঠামোয় গোলযোগ সৃষ্টি হলে, নিজেই সেটা সংশোধন করে।
- ☑ মিউটেশনের মাধ্যমে প্রকরণ সৃষ্টি করে বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

৯.৩.২ আরএনএ (RNA)

আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় অথবা রাইবোজোমের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। ডিএনএ-এর সঙ্গে আরএনএ-এর মূল পার্থক্য হচ্ছে এটি ডিএনএ-এর মতো দুই সূত্রবিশিষ্ট নয়, এটি নিউক্লিওটাইডের একক চেইন বা শিকল (চিত্র ৯.৬)। ডিএনএ-এর মতোই আরএনএ-এর নিউক্লিওটাইডে রয়েছে পেন্টোজ সুগার, অজৈব ফসফেট এবং একটি নাইট্রোজেনাস বেস। তবে এই পেন্টোজ সুগারটি হচ্ছে রাইবোজ সুগার। ডিএনএ-এর চারটি নাইট্রোজেনাস বেসের মতো এখানেও চারটি বেস রয়েছে। তবে আরএনএ-তে থাইমিনের বদলে ইউরাসিল (uracil) নামক একটি ভিন্ন নাইট্রোজেন বেস বা ক্ষার নিয়ে গঠিত।

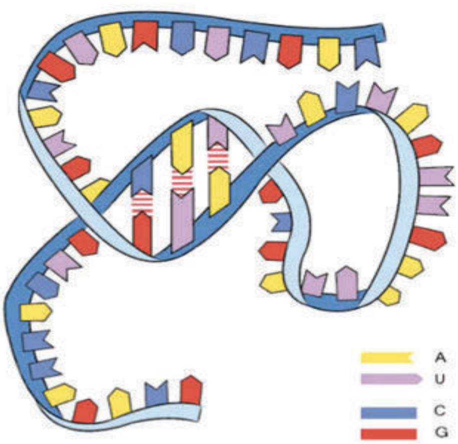

চিত্র ৯.৬ : আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড

কিছু সংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন- কোভিড ভাইরাস বা SARS-Cov-2.) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দিয়ে গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA-ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

আরএনএ প্রধানত তিন প্রকার- রাইবোজোমাল আরএনএ (Ribosomal RNA or rRNA), বার্তাবহ আরএনএ (Messenger RNA or mRNA), এবং পরিবাহক আরএনএ (Transfer RNA or tRNA)। আমরা প্রোটিনের সংশ্লেষ বা গঠন সম্পর্কে পড়ার সময় এই আরএনএগুলোর কাজ সম্পর্কে

একটি ধারণা পাব।

আরএনএ-এর কাজ :

- ☑ আরএনএ -এর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা।
- ☑ ডিএনএ হতে বার্তা বহন করে রাইবোজোমে পৌঁছে দেয়া।
- ☑ বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করা।

৯.৪ প্রোটিন (Protein)

প্রোটিন জীবদেহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ ও বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু। সর্বপ্রথম গেরিট মুলার 1838 খ্রিস্টাব্দে প্রোটিন শব্দটি প্রয়োগ করেন। একটি কোষের অভ্যন্তরে নানা প্রকার প্রোটিন তৈরি হয়, যেগুলো শরীরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোষের জৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, অ্যান্টিবডি ও হরমোন দ্বারা—এগুলো সবই প্রোটিন। এছাড়া দেহের টিস্যু এবং অঙ্গগুলোর গঠন, কার্যকারিতা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়। যেহেতু একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড সুবিন্যস্ত হয়ে একটি প্রোটিন তৈরি হয় তাই প্রোটিন সম্পর্কে জানার আগে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পর্কে একটুখানি জেনে নিতে হবে।

অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid) : 20 ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড (চিত্র ৯.৭) বিভিন্ন বিন্যাসে মিলে একটা প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন তৈরি করে। প্রাথমিকভাবে প্রোটিন হলো অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি লম্বা একটি চেইন। অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে প্রতিটি প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন একে অপর থেকে পৃথক হয়। তোমরা ইতোমধ্যে ডিএনএ'তে নিউক্লিওটাইডের বিন্যাস (ATGC) সম্বন্ধে জেনেছ। এই নিউক্লিওটাইডের বিন্যাসের উপরই অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস নির্ভর করে। সাধারণত তিনটি বেইজ মিলে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হওয়ার সংকেত তৈরি করে। একটি

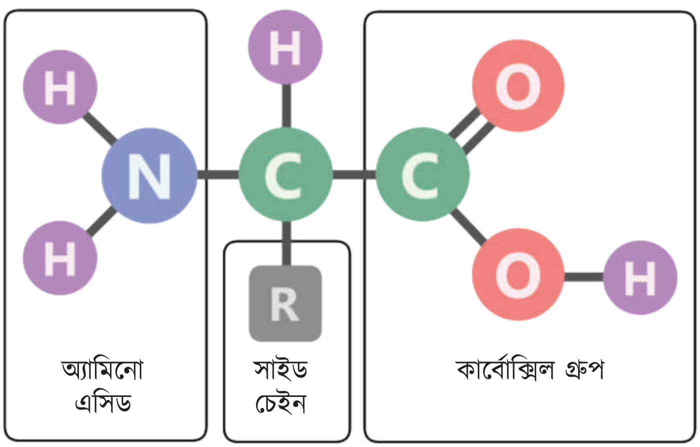

চিত্র ৯.৭ : অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন।

অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ পরবর্তী অ্যামিনো অ্যাসিডের আলফা অ্যামিনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ড তৈরি করে। এভাবে অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তির ফলে একটি পলিপেপটাইড চেইন বা প্রোটিন তৈরি হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, 20টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ভেতর মানুষ 11টি তার শরীরে সংশ্লেষ করতে পারে, বাকি ৯টি খাদ্যদ্রব্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

প্রোটিন সংশ্লেষ

৯.৮ চিত্রে প্রোটিনের সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। DNA থেকে RNA তৈরি করার সময় T নিউক্লিওটাইড রূপান্তরিত হয়েছে U তে। তিনটি তিনটি নিউক্লিয়াটিড একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড পলিপেপ্টাইড চেইনে সংযুক্ত করেছে।

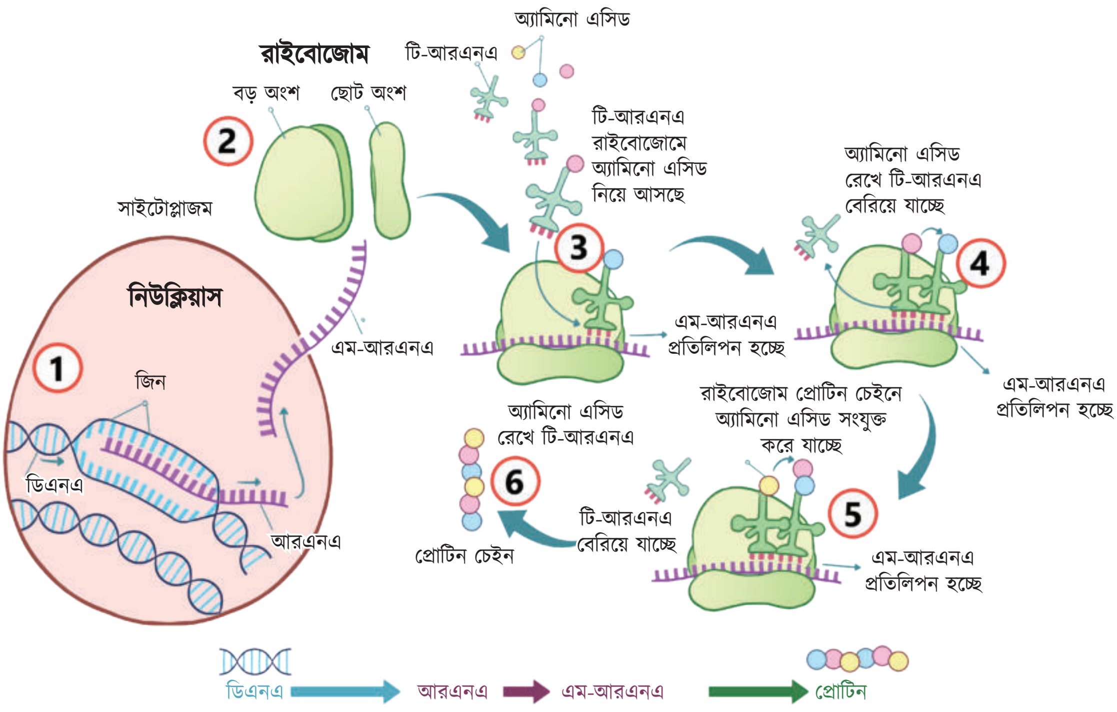

চিত্র ৯.৮ : প্রোটিন সংশ্লেষের বিভিন্ন ধাপ।

প্রোটিনের কাজ

(১) প্রোটিনযুক্ত খাবার আমাদের শরীরে শক্তি সরবরাহ করে এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(২) কোষের ভেতরে এবং বাইরে অসংখ্য জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে সহায়তা করে।

(৩) কিছু প্রোটিন হরমোন রাসায়নিক বার্তাবাহক, সেগুলো শরীরের টিস্যু এবং অঙ্গগুলোর মধ্যে যোগাযোগে সহায়তা করে।

(৪) রক্তে এবং অন্যান্য শারীরিক তরলগুলোতে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৫) বহিরাগত অণুজীবের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রোটিন আমাদের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে।

৯.৫ লিপিড (lipid)

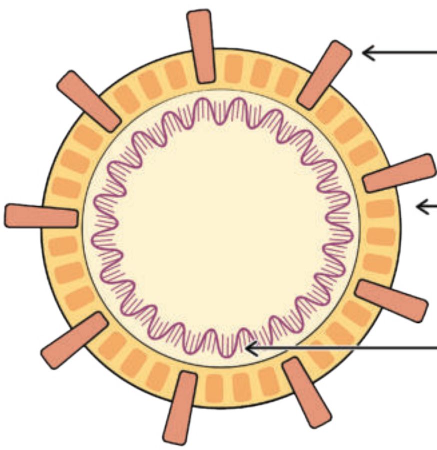

চিত্র ৯.৯ : করোনাভাইরাস

লিপিড বলতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে বুঝায়। লিপিড উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এটি কোষের গঠনে, শক্তি সংরক্ষণে, তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। 1943 সালে জার্মান বিজ্ঞানী Bloor সর্বপ্রথম Lipid শব্দটি ব্যবহার করেন। লিপিড সাধারণত প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের তেল ও চর্বিরূপে থাকে। এটি উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অঙ্গাণু বিশেষ করে ফল ও বীজে অধিক পরিমাণে থাকে।

লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয় তবে ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফরম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়। লিপিড বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধহীন, এর কোনো নির্দিষ্ট গলনাংক নেই, আণবিক ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। লিপিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি থেকে কম, পানির চেয়ে হালকা বলে লিপিড পানিতে ভাসে। সাধারণ উষ্ণতায় কিছু লিপিড তরল এবং কিছু লিপিড কঠিন অবস্থায় থাকে। যেসব লিপিড কঠিন অবস্থায় থাকে তাদের স্নেহদ্রব্য বা ফ্যাট বলে এবং যেসব লিপিড তরল অবস্থায় থাকে সেগুলোকে তেল বলে।

লিপিড হাইড্রোফোবিক হওয়ার কারণে এটি কোষের মেমব্রেন হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীব্যাপী করোনা অতিমারির জন্য দায়ী করোনাভাইরাসটির (চিত্র ৯.৯) লিপিড মেমব্রেন থাকার কারণে সাবান, জীবাণুনাশক বা কিছু অ্যালকোহল দিয়ে খুব সহজে এই ভাইরাসটির মেমব্রেন ভেদ করে তাকে অকার্যকর করা সম্ভব ছিল। সে কারণে কোভিড অতিমারি চলাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়া কিংবা জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

লিপিড -এর কাজ

(১) লিপিড প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে যেটি শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত।

(২) ফসফোলিপিড নামে এক ধরনের লিপিড বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(৩) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের লিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৪) চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদ দেহে খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের অঙ্কুরোদগমের সময় লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়।

(৫) মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেও উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

৯.৬ জৈব অণুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে জীবদেহের প্রধান জৈব অণুগুলো হলো কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড, প্রোটিন, এবং লিপিড। এই প্রত্যেকটি জৈব অণু একে অপরের গঠনের সঙ্গে এবং জৈবিক কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নিচে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা হলো:

কার্বোহাইড্রেট এবং নিউক্লিক অ্যাসিড : আমরা আলোচনায় জেনেছি যে জীবদেহের সব শারীরতাত্ত্বিক এবং জৈবিক কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ডিএনএ, তার একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে কোষ বিভাজন। ডিএনএ নামের এই নিউক্লিয়িক অ্যাসিড জীবদেহের জেনেটিক তথ্য ধারণ করে। ডিএনএ -এর গঠন যদি তোমরা খেয়াল করে দেখো, তাহলে দেখবে যে এটি ডিঅক্সিরাইবোজ নামে একটি পেন্টোজ সুগার দিয়ে গঠিত, যেটি একটি কার্বোহাইড্রেট।

কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড : কার্বোহাইড্রেট মাঝে মাঝেই গ্লুকোজে রূপান্তর করা হয় যেটি তাৎক্ষণিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিংবা গ্লাইকোজেন হিসেবে যকৃত অথবা পেশিতে সংরক্ষণ করা হয়। বাড়তি গ্লুকোজ ট্রাইগ্লিসারাইড নামে একটি লিপিডে দীর্ঘমেয়াদি শক্তি হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন : কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোসাইলেশান নামে প্রক্রিয়াতে প্রোটিনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে প্রোটিনের গঠনে রূপান্তর করতে পারে।

প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিড : প্রোটিন আমাদের শরীরের কাঠামোগত উপাদান তৈরি, এবং তারা প্রয়োজনীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ডিএনএ' তে সংরক্ষিত বার্তাগুলো প্রোটিন তৈরির মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। হিস্টোন নামে এক ধরনের প্রোটিন নিউক্লিয়িক অ্যাসিডকে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

প্রোটিন ও লিপিড : ফসফোলিপিড নামে একটি লিপিড অধিকাংশ কোষ অঙ্গাণুর আবরণ তৈরিতে প্রয়োজনীয় এবং প্রায়সময়েই লিপিড বাইলেয়ার বা দ্বি-স্তরবিশিষ্ট লিপিডের লেয়ার তৈরি করে। এই লিপিড বাইলেয়ারে প্রোটিন সংযুক্ত হয়ে এটি চ্যানেল, রিসেপ্টর বা ট্রান্সপোরটারের সৃষ্টি করে মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে নানা ধরনের জৈব অণুর গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জীবজগৎকে সচল রাখার জন্য জৈব অণুগুলো একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কের মাঝে বিঘ্ন ঘটলে জীবজগতের কার্যক্রমে নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়।

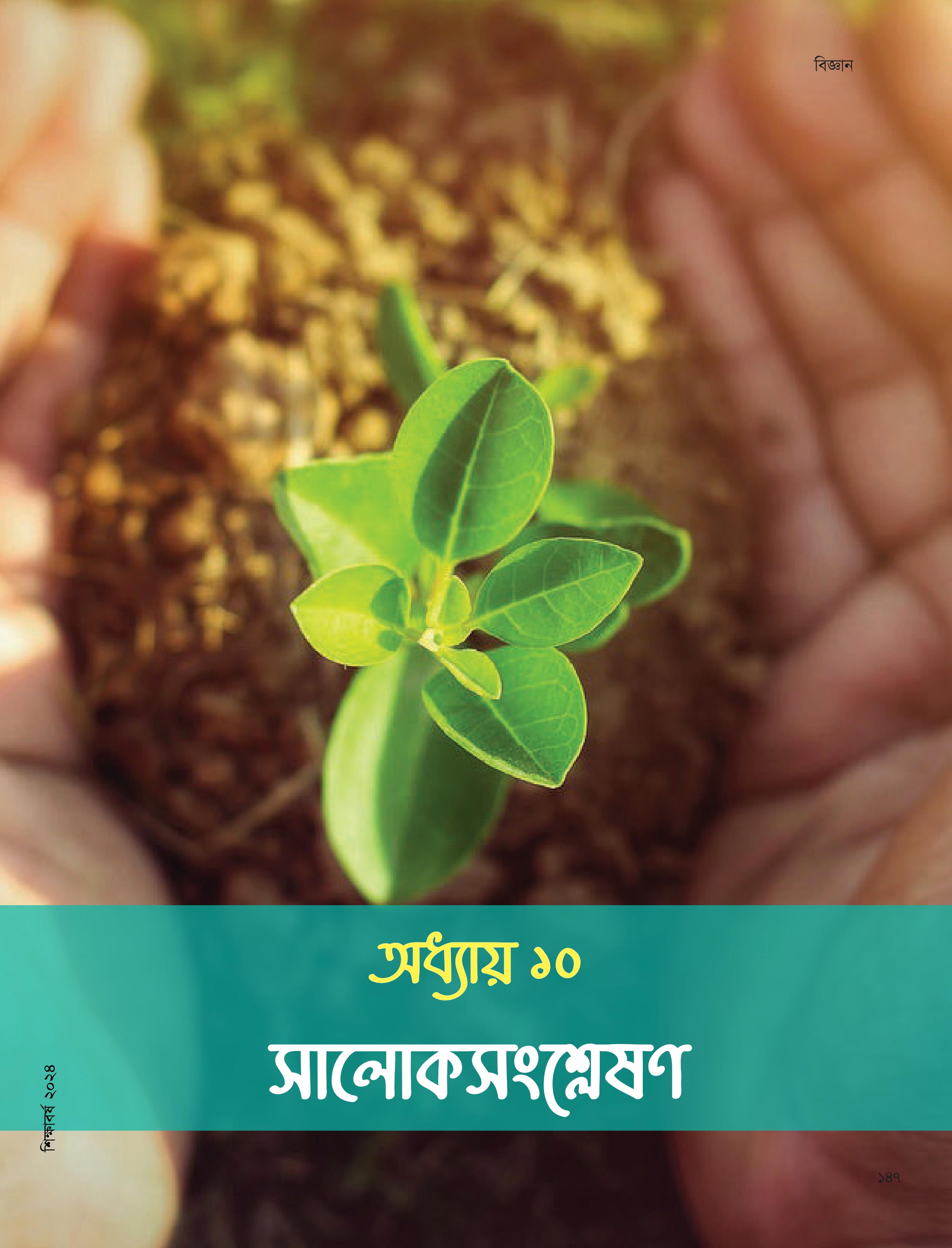

অধ্যায় ১০

সালোকসংশ্লেষণ

অধ্যায় ১০ সালোকসংশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর
- ☑ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের ধাপসমূহ
- ☑ কার্বন সংবন্ধন

১০.১ সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis)

তোমরা জানো যে বীজ থেকে চারা তৈরি হয়। এই চারাগুলো ধীরে ধীরে বড়ো হয় এবং দৈহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। বহু বছর থেকে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন ছিল যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের এই দৈহিক বৃদ্ধিতে ঠিক কোন জিনিসগুলো অবদান রাখে? এটি কি পানি, মাটিতে প্রাপ্ত নিউট্রিয়েন্ট, আলো, নাকি অন্যকিছু? এখন আমরা জেনেছি যে সূর্যের আলো, পানি এবং বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে উদ্ভিদ নিজেরাই নিজেদের খাবার তৈরি করে নেয়। এই প্রক্রিয়াটির নাম সালোকসংশ্লেষণ এবং এই প্রক্রিয়ায় তৈরি খাবারের উপর শুধু যে উদ্ভিদেরা নির্ভরশীল তা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জীবজগৎ প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষভাবে এর উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ উদ্বৃত্ত উপজাত হিসেবে যে অক্সিজেন গ্যাস পরিত্যাগ করে পৃথিবীর আমরা সবাই সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকি।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে আমাদের বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়েছিল নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেন দিয়ে, সেখানে কোনো অক্সিজেন ছিল না। তোমরা আগের একটি অধ্যায় থেকে জেনেছ প্রায় 2.5 বিলিয়ন বছর আগে, সায়ানোব্যাকটেরিয়া নামে একটি প্রোক্যারিওট এককোষী জীব সূর্যালোক এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে প্রথম সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে শুরু করে। পরবর্তী কালে বিবর্তনের ফলে শৈবালে এই ক্ষমতা বিকশিত হয়। শৈবাল, প্ল্যাঙ্কটন এবং পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ এখন আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে একসঙ্গে কাজ করে, যা আমাদের বায়ুমণ্ডলকে ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত করেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা সালোকসংশ্লেষণ নামের প্রকৃতির এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করব।

১০.২ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর

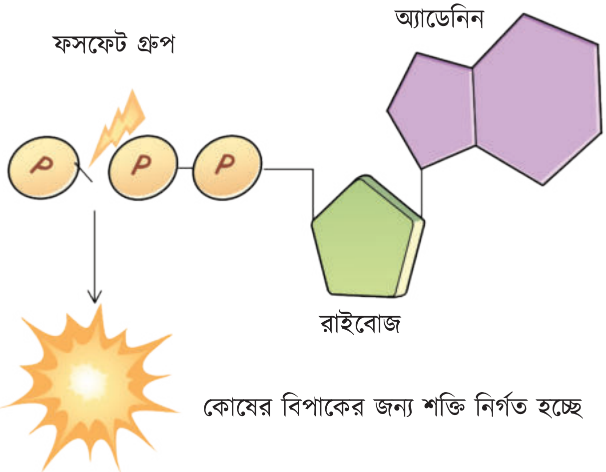

চিত্র ১০.১ : এটিপি-এর ফসফেট বন্ধন ভেঙ্গে শক্তির সৃষ্টি হয়।

তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছ উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের কারণে উদ্ভিদের পাতার রং সবুজ হয়। কোনো কিছুর রং সবুজ হওয়ার অর্থ সেটি আলোর অন্য রং শোষণ করতে পারলে সবুজ রংটি গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সালোকসংশ্লেষণের সময় গাছের পাতার ক্লোরোফিল আলো থেকে তার প্রয়োজনীয় অন্য রংগুলো শোষণ করে সবুজ রংটি ফিরিয়ে দেয়। ক্লোরোফিল দ্বারা শোষিত এই আলোক শক্তি সালোকসংশ্লেষণের পরের ধাপগুলো সম্পন্ন করার জন্য রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি এটিপি (ATP: এডিনোসিন ট্রাইফসফেট) এবং NADPH (নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট) নামক দুটি অণুতে সঞ্চিত হয়।

জীবদেহে এটিপি সকল বিক্রিয়ার জন্য শক্তি জমা রাখে এবং চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করে থাকে, এ কারণে এটিপি কোষের জৈবমুদ্রা (Biological coin) নামেও পরিচিত (চিত্র ১০.১)। তুমি যখন তোমার মাংসপেশি ব্যবহার করো সেই শক্তিটিও এটিপি নামের এই শক্তিসঞ্চিত জৈব অণু সরবরাহ করে। এটিপিতে তিনটি ফসফেট গ্রুপ শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধন দিয়ে যুক্ত থাকে, এই রাসায়নিক বন্ধনে শক্তি সঞ্চিত থাকে। এই রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে একটি ফসফেট গ্রুপকে মুক্ত করা হলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করার জন্য শক্তি বের হয়ে আসে। তখন তিনটির পরিবর্তে দুইটি ফসফেট থাকে বলে এটিকে এডিপি (ADP: এডিনোসিন ডাইফসফেট) বলা হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি সালোকসংশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে এডিপিকে এটিপি-তে রূপান্তর করার মাধ্যমে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করা।

NADPH -এর বেলায় ক্লোরোপ্লাস্টে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য NADP -এর সঙ্গে হাইড্রোজেন (H) সংযুক্ত করা হয় এবং এখানেও NADPH -এর হাইড্রোজেনকে (H) অবমুক্ত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায়।

১০.৩ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার স্থান

পাতার মেসোফিল টিস্যু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান। স্থলজ সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে

মূলের মাধ্যমে পানি শোষণ করে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায় এবং স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্ট নামক সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুতে ঘটে থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন :

১০.৩ চিত্রে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন দেখানো হয়েছে। এটি মোটামুটি 1-2 μm পুরু এবং এর ব্যাস 5-7 μm। ক্লোরোপ্লাস্ট আকার ডিম্বাকৃতির এবং এটিতে দুটি ঝিল্লি আছে : একটি বাইরের ঝিল্লি এবং একটি অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি। বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ ঝিল্লির মধ্যে প্রায় 10-2 0nm চওড়া আন্তঃঝিল্লি স্থান। অভ্যন্তরীণ ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থানটিই হলো স্ট্রোমা। ক্লোরোপ্লোস্টে গ্রানা (grana) নামের অঞ্চলে সালোকসংশ্লেষণের আলো শোষণ করে রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন হয় এবং স্ট্রোমা অঞ্চলে সেই রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শর্করা গঠনের বিক্রিয়াটি ঘটে। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে কয়েকটি অঙ্গাণু হচ্ছে :

চিত্র ১০.২ : ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন

ক্লোরোফিল : একটি সবুজ সালোকসংশ্লেষী রঞ্জক এবং রঞ্জক হওয়ার কারণে এটি সৌরশক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে।

থাইলাকয়েড : এগুলো ক্লোরোপ্লাস্টের চ্যাপ্টা থলির মতো কাঠামো নিয়ে গঠিত। এগুলো স্ট্রোমার ভেতর ঝুলে থাকে, যেখানে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। থাইলাকয়েডের পৃষ্ঠে ক্লোরোফিল থাকে। উল্লেখ্য যে, সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, কিন্তু সেখানে থাইলাকয়েড আছে এবং তার পৃষ্ঠদেশে ক্লোরোফিল এবং আলো সংবেদী অন্য রঞ্জক রয়েছে।

গ্র্যানাম (বহুবচন গ্রানা) : অনেকগুলো (10 থেকে 20) থাইলাকয়েড একত্রিত হয়ে গ্র্যানাম গঠন করে যা আলোক শক্তির রাসায়নিক রূপান্তরের স্থান।

১০.৪ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (The process of photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেখানে সজীব উদ্ভিদের কোষের ভেতরের ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে ATP এবং NADPH নামক জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত করে এবং ঐ রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়া ঘটানো হয়। বিক্রিয়াটি এরকম :

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 60_2 + 6H_2O$$

তোমরা উপরের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি থেকে দেখতে পাচ্ছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় 1 অণু হেক্সোজ শর্করা (গ্লুকোজ) তৈরি করতে 6 অণু CO2 ও 12 অণু H2O প্রয়োজন পড়ে। এখানে H2O জারিত হয়ে O2 মুক্ত হয়, অন্যদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয়ে তার সঙ্গে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়। এ কারণে সালোকসংশ্লেষণকে একটি জটিল জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অনেকগুলো ধাপ থাকলেও এটিকে আলোকনির্ভর (Light dependent) এবং আলোক নিরপেক্ষ (Light independent) এ দুটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায় (চিত্র ১০.৩)।

১০.৪.১ আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase)

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে পর্যায়ে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও NADPH -তে সঞ্চারিত হয়, তাকে আলোকনির্ভর পর্যায় বলে। এ অংশের জন্য আলোক অপরিহার্য। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো :

$$2ADP + 2Pi + 2NADP + 4H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} 2ATP + 2NADPH + H^+ + 2H_2O + O_2$$

বিক্রিয়াটিতে অজৈব ফসফেটকে Pi হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষণের আলোকনির্ভর পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টিডের গ্রানার মধ্যে সংঘটিত হয়। এই পর্যায়ের মূল ঘটনাগুলো হলো :

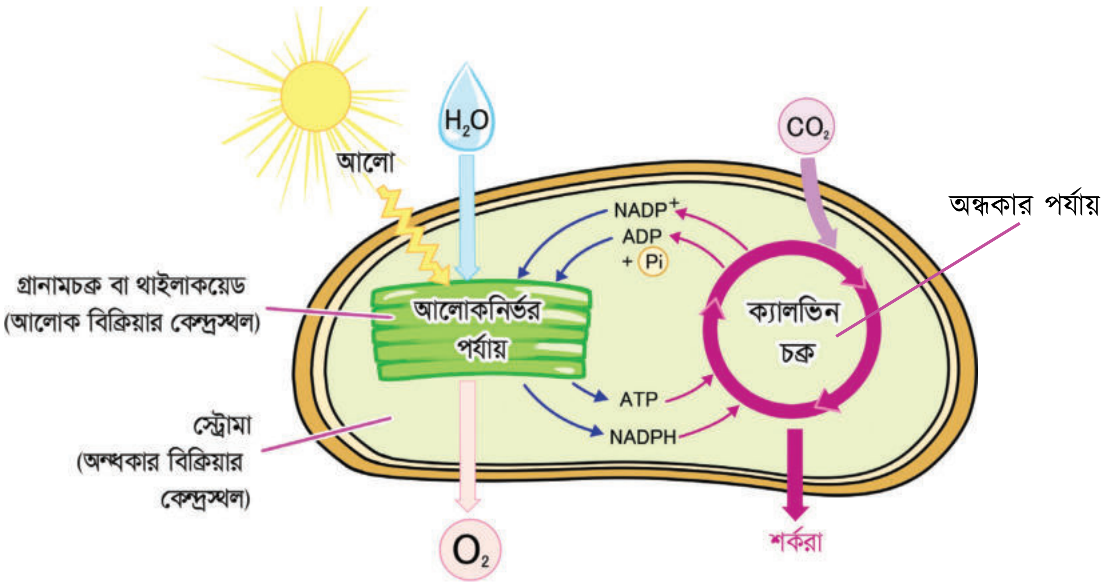

চিত্র ১০.৩ : ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে সালোকসংশ্লেষণের
আলোকনির্ভর ও অন্ধকার পর্যায়

ক্লোরোফিলের সক্রিয়তা : এই বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূর্যালোকের ফোটন কণা শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু সক্রিয় ও তেজোময় হয়ে ওঠে।

ফটোলাইসিস : সক্রিয় ক্লোরোফিল অণু পানিকে বিয়োজিত করে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং ইলেকট্রন উৎপন্ন করে। এই অক্সিজেন পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে পরিবেশে নির্গত হয়ে যায়।

ফটোফসফোরাইলেশন : এই প্রক্রিয়ায় পাতার কোষে অবস্থিত যৌগ ADP (অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট) সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অজৈব ফসফেট (Pi) সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন যৌগ ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) গঠন করে।

বিজারিত NADPH গঠন : পাতার কোষে অবস্থিত যৌগ NADP হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজারিত NADPH গঠন করে, যেটি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

১০.৪.২ আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (Light independent phase)

সালোকসংশ্লেষণের আলোক-নির্ভর পর্যায়ে আলোক শক্তি ব্যবহার করে যে ATP এবং NADPH সৃষ্টি হয় সেগুলোকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে কার্বহাইড্রেট বা সুগার তৈরি করা হয়। ATP এবং NADPH থেকে শক্তি গ্রহণ করার পর সেগুলো যথাক্রমে ADP এবং NADP-তে রূপান্তরিত হয় এবং আলোক-নির্ভর পর্যায়ে সেগুলো পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে। বিক্রিয়াগুলো উৎসেচকের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্টিডের স্ট্রোমার মধ্যে চক্রাকারে ঘটতে থাকে এবং এর জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। এই চক্রটির আবিষ্কারক ড. মেলভিন কেলভিনের নামানুসারে এই প্রক্রিয়াকে কেলভিন চক্র বলা হয়।

সালোকসংশ্লেষণে কার্বনের গ্যাসীয় অবস্থা থেকে কার্বহাইড্রেটে পরিণত করে যা পৃথিবীর অন্যান্য জীব ব্যবহার করতে পারে। একে কার্বন ফিক্সেশন বা কার্বন সংবন্ধন বলে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে পৃথিবীতে জীবন কার্বনভিত্তিক এবং ক্যালভিন চক্রে কার্বন সংবন্ধন জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যতম ঘটনা। সালোকসংশ্লেষণ সব সময় সর্বোচ্চ গতিতে কাজ করে না; আলোর তীব্রতা, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, তাপমাত্রা এবং পানির পরিমাণও সালোকসংশ্লেষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

১০.৫ সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষের মূল তাৎপর্য বা গুরুত্ব হলো তিনটি, যেমন-

১। সৌরশক্তি আবদ্ধকরণ এবং খাদ্যের মধ্যে স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরকরণ : সূর্য পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস। সালোকসংশ্লেষণের সময় সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শোষণ করে এবং তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ATP-অণুর মধ্যে আবদ্ধ করে। পরে ঐ শক্তি উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। ঐ শক্তি উদ্ভিদের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে লাগে। পরভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদজাত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করে থাকে। কাঠকয়লা, পেট্রোল ইত্যাদির মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে অনেক বছর আগেকার উদ্ভিদের মধ্যে আবদ্ধ সৌরশক্তি।

২। গ্লুকোজকে শ্বেতসারে রূপান্তর এবং সঞ্চয়ী অঙ্গে পরিবহণ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সরল শর্করা গ্লুকোজ, যা শ্বেতসারে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের ফল, মূল, বীজ এরকম বিভিন্ন সঞ্চয়ী অঙ্গে সঞ্চিত হয়। গ্লুকোজ থেকে প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যবস্তু সংশ্লেষিত হয়। পরভোজী প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই উদ্ভিদজাত খাদ্যই গ্রহণ করে। তাই সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন খাদ্যই হলো খাদ্যের মূল উৎস।

৩। পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা : বায়ুমণ্ডলে CO_2 গ্যাসের স্বাভাবিক

পরিমাণ হলো 0.04% এবং O_2-এর স্বাভাবিক পরিমাণ হচ্ছে 21%। সালোকসংশ্লেষের সময় সবুজ উদ্ভিদরা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন বর্জনের মাধ্যমে পরিবেশের O_2-CO_2—এর ভারসাম্য বজায় রাখে।

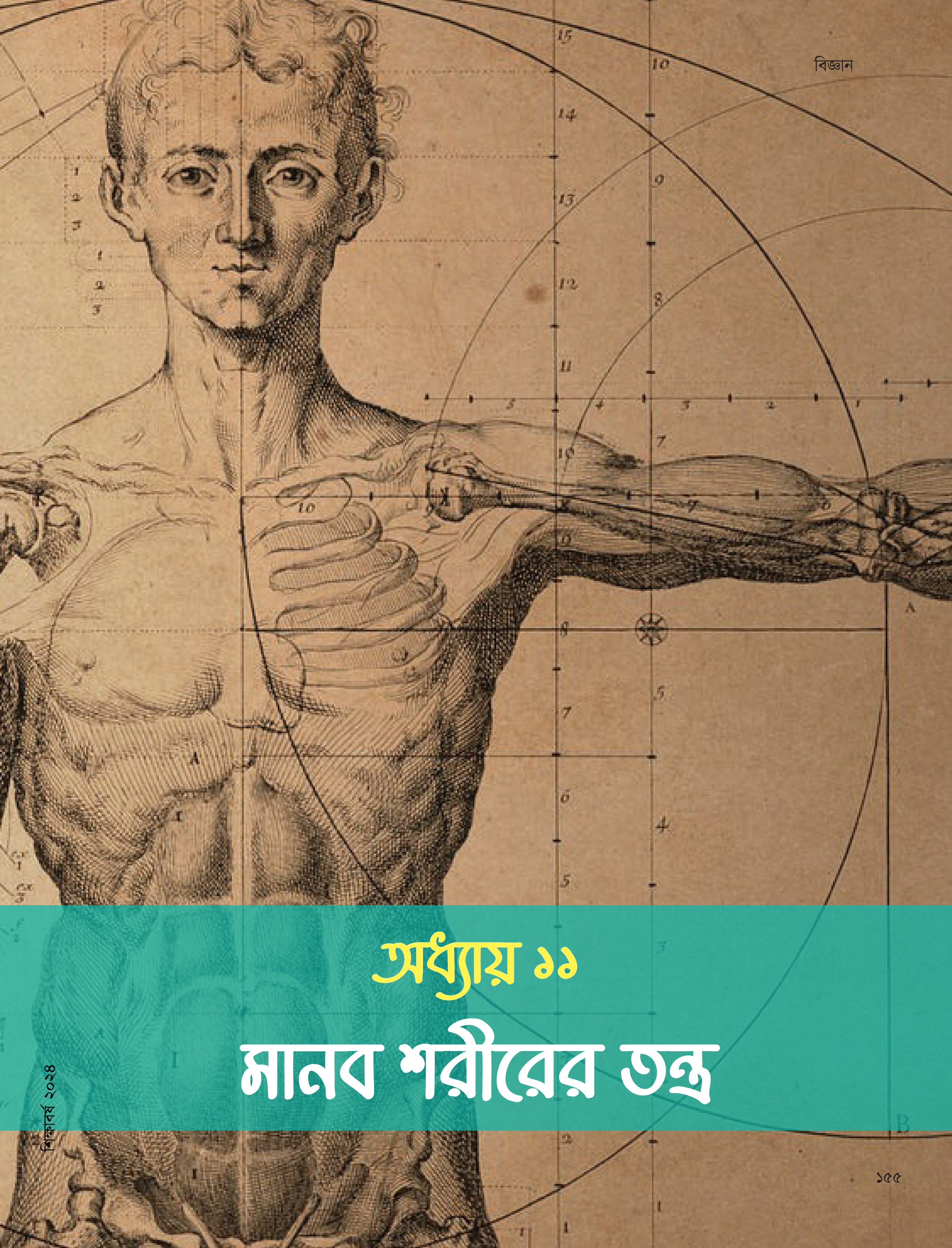

অধ্যায় ১১

মানব শরীরের তন্ত্র

অধ্যায় ১১ মানব শরীরের তন্ত্র

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ স্নায়ুতন্ত্র
- ☑ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র
- ☑ মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ হরমোনসমূহ
- ☑ হৃদ-সংবহন তন্ত্র
- ☑ মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিচয়
- ☑ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাধারণ প্রক্রিয়া

১১.১ স্নায়ুতন্ত্র

মানুষের দেহের যে তন্ত্র শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজকর্ম পরিচালনা করে, সমন্বয় সাধন করে এবং বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তাকে স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) বলে। মানুষের দেহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় অংশে রয়েছে মস্তিষ্ক আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী স্নায়ুতন্তু। স্নায়ুতন্ত্র প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত- কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র।

১১.১.১ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)

মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটিকার ভেতরে এবং মেরুরজ্জু মেরুদণ্ডের ভেতরে সুরক্ষিত থাকে।

মস্তিষ্ক (Brain)

তোমরা সবাই মস্তিষ্ক কী সেটি জান, এটি মেরুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ডের উপরে করোটিকার মাঝে থাকা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্ফীত অংশটি। মানুষের মস্তিষ্ক শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের পরিচালক, এটি শরীরের প্রতিটি অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে, শুধু তাই নয় এটি মানুষের অনুভূতি এবং চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন 1.4 kg। মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত, সেরিব্রাম, স্টেম এবং সেরিবেলাম (চিত্র ১১.১)।

সেরিব্রাম : মস্তিষ্কের উপরের সবচেয়ে বড়ো অংশটিকে বলে সেরিব্রাম। সেরিব্রামের ডান ও বাম অংশদুটি সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত। দুটি অংশের মাঝখানে বিভেদক খাঁজ থাকায় এ বিভক্তি ঘটে। এই দুই ভাগকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Cerbral hemisphere) বলা হয়। সেরিব্রামের ডান ও বাম হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে খাঁজ থাকলেও এ দুটি অংশ একগুচ্ছ নিউরন দিয়ে সংযুক্ত থাকে, যার নাম কর্পাস ক্যালেসাম। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেরিব্রামের উপরে অনেক রকম খাঁজ এবং ভাঁজ রয়েছে। সেরিব্রাম আমাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া কোনো উদ্দীপকের প্রতি কী ধরনের সাড়া দেবে সে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

স্টেম : মস্তিষ্কের যে অংশটি স্পাইনাল কর্ড বা মেরুরজ্জুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে স্টেম বলে। মানুষের শরীরের যে কাজগুলো নিজ থেকে ঘটতে থাকে—যেমন- হৃদস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তাপমাত্রা ইত্যাদি স্টেম নিয়ন্ত্রণ করে।

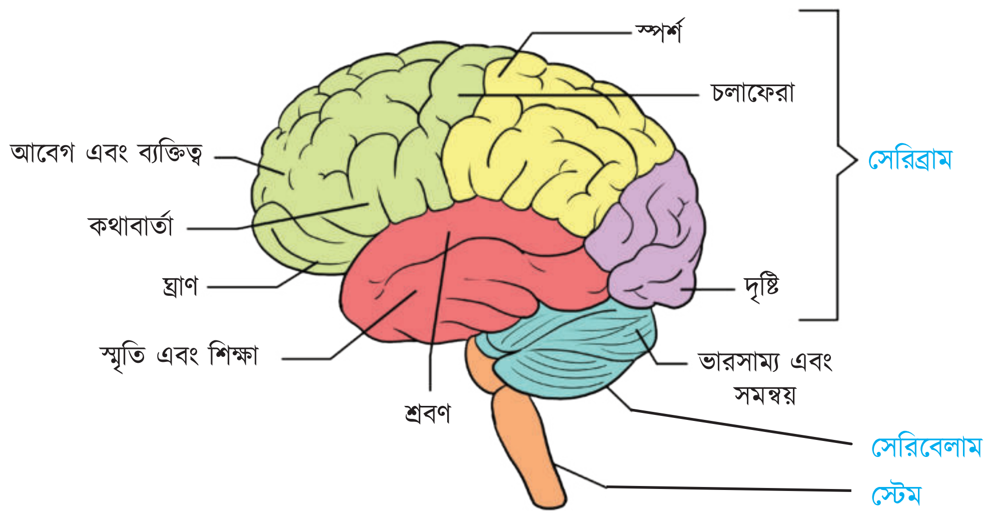

চিত্র: ১১.১ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

সেরিবেলাম : মাথার পিছন দিকে স্টেম এবং সেরিব্রামের মাঝখানে রয়েছে সেরিবেলাম । এটি দেহের পেশির টান নিয়ন্ত্রণ, চলনে সমন্বয় সাধন, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, দৌড়ানো এবং লাফানোর কাজে জড়িত পেশিগুলোর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্ক থেকে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু বের হয়ে মাথা, ঘাড়, মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর, জিহ্বা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর স্নায়ু খাদ্য গলাধঃকরণ এবং হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, গলবিল ইত্যাদির কিছু কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এই স্নায়ুগুলো শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও জড়িত।

মেরুরজ্জু (Spinal cord) :

মেরুরজ্জু করোটির পিছনে অবস্থিত ছিদ্র থেকে দিয়ে বের হয়ে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় কটিদেশ পর্যন্ত গিয়েছে। মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যবর্তী ছিদ্র দিয়ে মেরুরজ্জু থেকে 31 জোড়া মেরুরজ্জীয় স্নায়ু (Spinal nerves) বের হয়। এসব ঘাড়, গলা, বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের স্নায়ু।

১১.১.২ প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)

মস্তিষ্ক থেকে 12 জোড়া এবং মেরুমজ্জা বা সুষুম্না কাণ্ড থেকে যে 31 জোড়া স্নায়ু বের হয়ে আসে সেগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোকে একত্রে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে (চিত্র ১১.২)। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন করোটিক স্নায়ু চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলি প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মেরুরজ্জু থেকে বের হওয়া স্নায়ুগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে এবং দেহের বাকি অংশ থেকে সকল অনুভূতি মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায়।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আবার সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

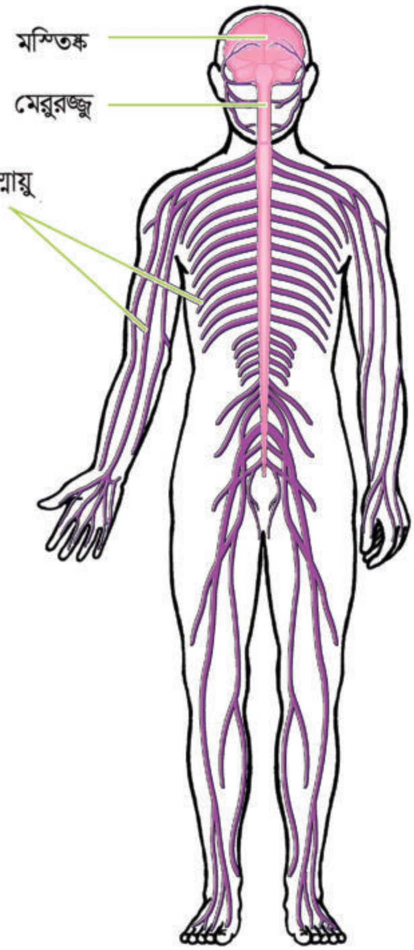

চিত্র ১১.২ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic Nervous System)

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ আমাদের শরীরের হাড় বা অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত মাংসপেশি ব্যবহার করে নাড়াচাড়া করে তাকে সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র বলে। আমরা সজ্ঞানে আমাদের শরীরের হাত, পা কিংবা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো কোনো অংশ যখন চালনা করি বা নাড়াই তখন সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র সেটিকে চালনা করে। আমরা যখন হাত দিয়ে কিছু ধরতে চাই কিংবা পা দিয়ে ধাক্কা দিতে চাই তখন সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র হাত কিংবা পায়ের মাংসপেশিতে প্রয়োজনীয় সিগনাল পাঠায়।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system) :

যেসব অঙ্গের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত

হয়। দেহের ভিতরের অঙ্গগুলো, যেমন- হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হয়। এসব তন্ত্রের কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় এরা অনেকটা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে আপন কাজ সম্পাদন করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র আবার সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। হঠাৎ করে বিপজ্জনক কিংবা উত্তেজক কিছু কিছু দেখলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়ে আমাদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে তোলে, মাংসপেশি শক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু একটা করার জন্য শরীরকে প্রস্তুত করে তোলে। শরীর হঠাৎ করে উত্তেজিত হওয়ার পর শরীরকে শান্ত করার জন্য প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে থাকে।

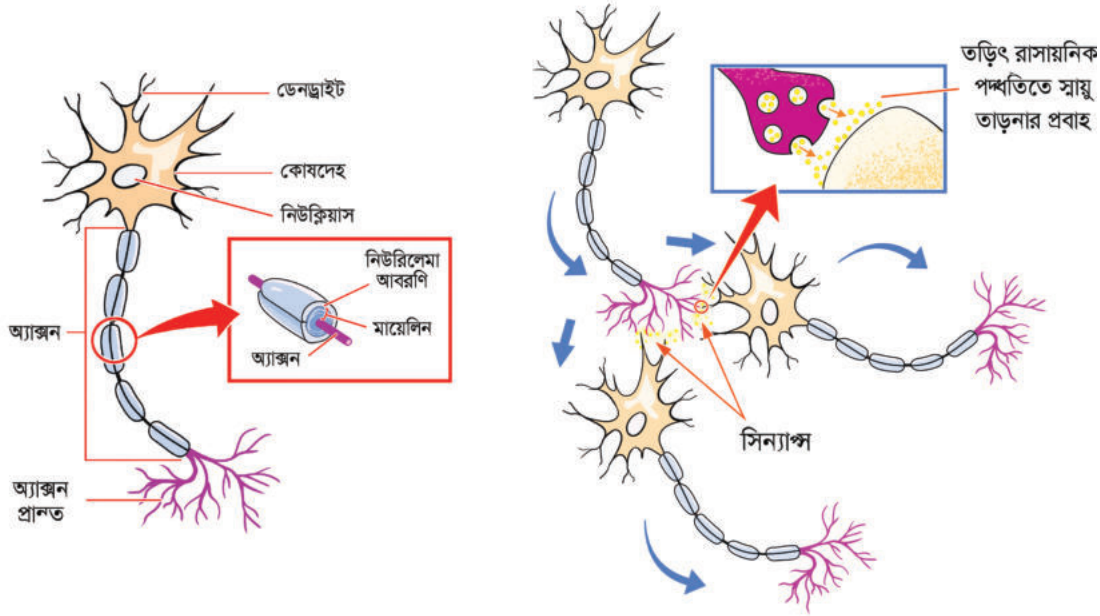

চিত্র ১১.৩ : (বামে) একটি নিউরন (ডানে) স্নায়ু তাড়নার প্রবাহ

১১.১.৩ নিউরন (neuron) :

যে কলা বা টিস্যু দেহের সব ধরনের সংবেদন এবং উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তা পরিবহণের মাধ্যমে উদ্দীপনা অনুসারে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেটাই হচ্ছে স্নায়ুটিস্যু বা স্নায়ুকলা। স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং কার্যক্রমের একককে বলে স্নায়ুকোষ বা নিউরন (চিত্র ১১.৩)। বহু সংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরন মিলে স্নায়ুটিস্যু গঠিত। প্রতিটি নিউরন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, কোষদেহ এবং প্রলম্বিত অংশ।

কোষদেহ :

প্লাজমামেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত নিউরনের গোলাকার, তারকাকার, অথবা

ডিম্বাকার অংশ কোষদেহ নামে পরিচিত। এখানে সাইটোপ্লাজমে, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবস্তু, লাইসোজোম, চর্বি, গ্লাইকোজেন, রঞ্জক কণাসহ অসংখ্য নিসল দানা থাকে।

প্রলম্বিত অংশ

কোষদেহ থেকে সৃষ্ট শাখা-প্রশাখাকেই প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই ধরনের :

(i) ডেনড্রন (Dendron) : কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয় তাদের ডেনড্রাইট বলে। একটি নিউরনে ডেনড্রন সংখ্যা শূন্য থেকে শতাধিক পর্যন্ত হতে পারে। এক নিউরনের ডেনড্রাইট অন্য নিউরন থেকে স্নায়ু তাড়না গ্রহণ করে।

(ii) অ্যাক্সন (Axon) : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন বেশ লম্বা তন্তুটির নাম অ্যাক্সন। এর চারদিকে পাতলা আবরণটিকে নিউরিলেমা বলে। নিউরিলেমা এবং অ্যাক্সনের মাঝখানের অংশটিতে স্নেহ পদার্থের একটি স্তর থাকে, যাকে মায়েলিন (Myelin) বলে। অ্যাক্সনের শেষ মাথা অ্যাক্সন টারমিনালে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং এই টারমিনালগুলো দিয়ে একটি নিউরন অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটে স্নায়ু তাড়না পাঠায়।

একটি নিউরনের অ্যাক্সনের টারমিনালের সঙ্গে দ্বিতীয় একটি নিউরনের ডেনড্রাইট সরাসরি যুক্ত থাকে না, মাঝখানে একটু ফাঁকাস্থল থাকে। এই সূক্ষ্ম ফাঁকা সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে, অর্থাৎ দুটি নিউরনের সন্ধিস্থল হলো সিন্যাপস। অ্যাক্সন টারমিনাল সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক (Electro chemical) পদ্ধতিতে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়। কোনো একটি নিউরনের মধ্য দিয়ে স্নায়ু তাড়না প্রবাহিত হয়ে সিন্যাপস অতিক্রম করে পরবর্তী নিউরনে যায়। অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা বা স্নায়ু তাড়না একদিকে পরিবাহিত হয়। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় একশ বিলিওন নিউরন রয়েছে এবং প্রতিটি নিউরন অন্য সাত থেকে দশ হাজার নিউরনের সঙ্গে সিন্যাপস সংযোগ করে থাকে।

কেউ যখন চিন্তা করে তখন এক নিউরন অন্য নিউরনের সঙ্গে সিনাপ্সের মাধ্যমে সংযোগ করে, কাজেই কেউ যদি একটি বই পড়ে, কিংবা একটা সমস্যার সমাধান করে তাহলে সে তার সুনির্দিষ্ট সিনাপ্স সংযোগ উজ্জীবিত করে মস্তিষ্ককে আরও কার্যক্ষম করে তোলে।

উদ্দীপনা সঞ্চালন (Transmission of Impulse)

পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য নিউরনতন্তুর ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা বা তাড়না শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায়। প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ প্রায় 100 মিটার, তবে স্নায়ুর উপর নির্ভর করে এর কিছু তারতম্য হতে পারে। পরিবেশ থেকে যে সংকেত স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে তাকে স্নায়ু-তাড়না বা স্নায়ু-উদ্দীপনা বলে। নিউরনের কার্যকারিতার কারণে এই উদ্দীপনা প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোতে পাঠানো হয়। এটি মাংসপেশিতে পৌঁছালে পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়, ফলে প্রয়োজনমতো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এই তাড়না গ্রন্থিতে পৌঁছালে সেখানে রস ক্ষরিত হয়। অনুভূতিবাহী স্নায়ু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখা, শোনা, ছোঁয়া বা যন্ত্রণাবোধের অনুভূতি উপলব্ধি করায়।

একটি টর্চ লাইট দিয়ে তোমার বন্ধুর চোখে আলো ফেললে দেখবে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পিউপিল ছোটো হয়ে যাবে। উদ্দীপনার আকস্মিকতায় আলোর উদ্দীপনাজনিত তাড়না চোখের আলো সংবেদী কোষ রেটিনা থেকে মস্তিস্কে পৌঁছালে, মস্তিষ্কের নির্দেশে পিউপিল ছোটো করে ফেলার জন্য আইরিশের বৃত্তাকার বা গোলাকার পেশি সংকুচিত করে ফেলা হয়।

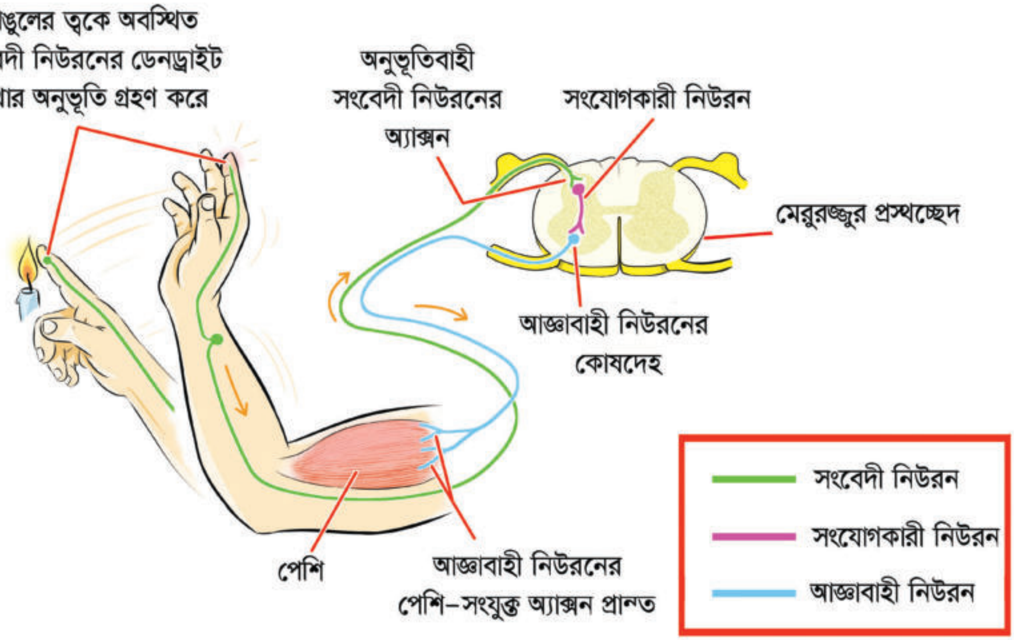

চিত্র ১১.৪ : মানব দেহের প্রতিবর্তী ক্রিয়া

১১.১.৪ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে উদ্দীপনার আকস্মিকতা এবং তার কারণে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। হঠাৎ করে আঙুলে সুচ ফুটলে অথবা হাতে গরম কিছু পড়লে আমরা অতি দ্রুত হাতটি উদ্দীপনার স্থান থেকে সরিয়ে নেই, এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফল (চিত্র ১১.৪)। আমরা চাইলেও প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কারণ প্রতিবর্তী ক্রিয়া মস্তিষ্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, এটি মেরুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেসব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দিয়ে না হয়ে মেরুরজ্জু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

অসতর্কভাবে জ্বলন্ত মোমবাতির আলোকশিখায় আঙুল চলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত অন্যত্র সরে যাওয়ার

প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

- আঙুলে আগুনের তাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরন ব্যথার উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে ত্বক গ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
- আঙুলের ত্বক থেকে এ উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে মেরুরজ্জুতে পৌঁছায়।
- মেরুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ডে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন থেকে তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে উদ্দীপনা মধ্যবর্তী বা রিলে নিউরনের মাধ্যমে মোটর বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু কোষের ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে।
- অজ্ঞাবাহী স্নায়ুর অ্যাক্সনের মাধ্যমে এ উদ্দীপনা পেশিতে প্রবেশ করে।
- উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে পেশির সংকোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনাস্থল বা আগুনের শিখা থেকে হাত দ্রুত আপনা-আপনি সরে যায়।

১১.১.৫ স্নায়বিক বৈকল্যজনিত কয়েকটি শারীরিক সমস্যা

(ক) প্যারালাইসিস (Paralysis) : শরীরের কোনো অংশের ঐচ্ছিক মাংসপেশি ইচ্ছেমতো নাড়াতে পারার ক্ষমতা নষ্ট হওয়াকে প্যারালাইসিস বলে। সাধারণত মস্তিষ্কের কোনো অংশের ক্ষতির কারণে ঐ অংশের সংবেদন গ্রহণকারী পেশিগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় স্ট্রোকের কারণে প্যারালাইসিস হয়ে থাকে। এছাড়া মেরুদণ্ডের বা ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ডের আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও প্যারালাইসিস হতে পারে।

(খ) এপিলেপসি (Epilepsy) : এপিলেপসি বা মৃগী রোগ মস্তিষ্কের একটি রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে খিঁচুনি বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে এই রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ করেই সাময়িকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শরীর কাঁপুনি ও খিঁচুনি দিতে দিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অনেকক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। এপিলেপসির মূল কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। মাথায় আঘাতজনিত কারণে ম্যানিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি, টিউমার ইত্যাদি কারণেও এপিলেপসির উপসর্গ দেখা দেয়।

(গ) পারকিনসন রোগ (Parkinson's disease) : পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা যার কারণে হাতে ও পায়ের কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগীর নড়াচড়া, হাঁটাহাটি করতে সমস্যা হয়। এ রোগ সাধারণত 50 বছরের বয়সের পরে হয়। স্নায়ুকোষ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে থাকে, যার একটি হলো ডোপামিন। ডোপামিন শরীরের পেশির নড়াচড়ায় সাহায্য করে। পারকিনসন রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কে ডোপামিন তৈরির কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ডোপামিন ছাড়া ঐ স্নায়ু কোষগুলো পেশি কোষগুলোতে

সংবেদন পাঠাতে পারে না বলে মাংসপেশি তার কার্যকারিতা হারায়।

১১.২ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine System) :

মানব দেহের একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তন্ত্র হচ্ছে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। এই গ্রন্থিতন্ত্র মানব দেহের বেশকিছু নালিবিহীন গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র ১১.৫)। এই নালিবিহীন গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। বিভিন্ন ধরনের হরমোন রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু হরমোন পরিবহণের জন্য পৃথক কোনো নালি নেই তাই এটি রক্তস্রোতের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে পৌঁছে কোষের প্রাণরাসায়নিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে এবং জৈবিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থি থেকে নিয়মিত হরমোন নিঃসৃত হয়, তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে শরীরে নানারকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১১.২.১ মানব দেহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি

(ক) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pitutary gland) : মানব দেহের সবচেয়ে ছোটো এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত। সবচেয়ে ছোটো হলেও পিটুইটারি গ্রন্থি মানব দেহের প্রধান হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি। একদিকে পিটুইটারি গ্রন্থি সবচেয়ে বেশি হরমোন নিঃসৃত করে, অপরদিকে অন্যান্য গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। এটি অন্যান্য গ্রন্থিকে প্রভাবিত করা ছাড়াও মানব দেহের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) : থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরণ হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন (Thyroxin) সাধারণত মানব দেহে স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েডের আরেকটি হরমোন মানব দেহে ক্যালসিয়াম বিপাকের সঙ্গে জড়িত।

(গ) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland) : একজন মানুষের সাধারণত চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে যার সবকটিই থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে অবস্থিত। এই গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোন মূলত ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland) : থাইমাস গ্রন্থি গ্রীবা অঞ্চলে অবস্থিত। থাইমাস গ্রন্থি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে। শিশুকালে এই গ্রন্থি বিকশিত থাকে পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হয়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে সাধারণত এই হরমোন থাকে না। এ গ্রন্থি বেশ কয়েকটি হরমোন তৈরি করে যা থাইমাসে শ্বেতকণিকা তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

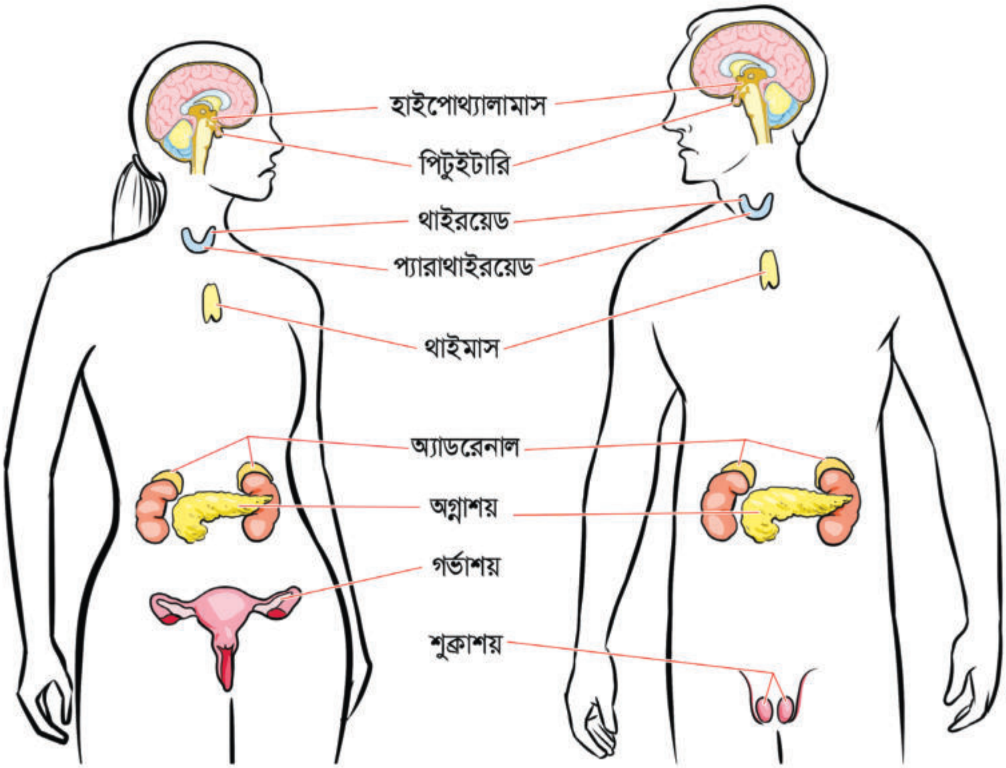

চিত্র ১১.৫ : মানব দেহের প্রধান নালিবিহীন গ্রন্থিগুলো

(ঙ) অ্যাডরেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি কিডনির উপরে অবস্থিত। অ্যাডরেনাল গ্রন্থি দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি মূলত কঠিন মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলোর একটি হচ্ছে অ্যাডরেনালিন (adrenalin)। অ্যাডরেনালিন হরমোন হৃৎপিণ্ড ও ধমনির অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(চ) আইলেটস অফ ল্যাংগারহ্যানস (Islets of langerhans) : আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস অগ্ন্যাশয়ের মাঝে অবস্থিত, এই কোষগুচ্ছ শরীরের শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি ইনসুলিন (insulin) নিঃসরণ করে যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু ইনসুলিন দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, তাই অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়।

(ছ) পিনিয়াল বডি (Pineal body) : এটি মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত একটি গোলাকার গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো মেলাটোনিন যেটি দেহের দিন-রাতের চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

(জ) গোনাড বা জনন অঙ্গ গ্রন্থি (Gonads) : এটি মেয়েদের ডিম্বাশয় এবং ছেলেদের শুক্রাশয়ে অবস্থিত। জনন অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের পরিণত বয়সের লক্ষণগুলো বিকশিত করতে ভূমিকা রাখে। প্রাণীর

জনন অঙ্গের বৃদ্ধির পাশাপাশি এটি জননচক্র এবং যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষ-দেহে টেস্টোস্টেরন (testosterone) এবং স্ত্রী-দেহে ইস্ট্রোজেন (estrogens) নামক হরমোন উৎপন্ন হয়।

১১.২.২ হরমোনজনিত কয়েকটি অস্বাভাবিকতা

(a) থাইরয়েড সমস্যা : আয়োডিনযুক্ত খাবার খেলে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। সমুদ্রের পানিতে আয়োডিন থাকায় সামুদ্রিক মাছ মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অন্যতম মূল উৎস। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড বা গয়টার রোগ হয়ে থাকে, তাই সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত এলাকায় এক সময় এই রোগীর সংখ্যা বেশি পাওয়া যেত। খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের কারণে আজকাল এই রোগের প্রাদুর্ভাব দূর করা সম্ভব হয়েছে। গলগণ্ড ছাড়া থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে শিশুদের মানসিক বিকাশও বাধা পায় এবং চেহারায় স্বাভাবিক শিশুদের থেকে বৈসাদৃশ্য থাকে, সামুদ্রিক মাছ ছাড়া কলা, ফলমূল, কচু ইত্যাদি খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(b) বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস (Diabetes) : অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে দেহের শর্করা পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলে দেহে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, যে অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস বলে। ডায়াবেটিস প্রধানত দুই ধরনের, টাইপ-1 এবং টাইপ-2। টাইপ-1 -এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারেই ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই নিয়মিতভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। অন্যদিকে টাইপ-2 রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ, অগ্ন্যাশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তি সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম দিয়ে অনেক সময় এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১১.২.৩ মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ হরমোনসমূহ

মানব দেহে অনেক ধরনের হরমোন কার্যকর রয়েছে, তার ভেতরে অর্ধশতাধিক হরমোন বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদের ভেতর থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের নাম, তাদের কাজ এবং সেটি কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় তা নিচে দেওয়া হলো :

১. ইনসুলিন : রক্তের গ্লুকোজ দেহকোষে প্রেরণ করে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে; এটি অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস উৎপন্ন হয়।

২. থাইরয়েড হরমোন বা থাইরোক্সিন: দেহের বিপাক এবং শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে; থাইরয়েড গ্রন্থিতে উৎপাদিত।

৩. **কর্টিসোল :** মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, শরীরের বৃদ্ধি, এবং ইমিউন কার্যক্রম পরিচালনা করে; এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন।

৪. **অ্যাড্রেনালিন :** কঠিন মানসিক ও শারীরিক চাপের জন্য প্রস্তুত করে; এড্রেনাল গ্রন্থি দ্বারা উৎপন্ন।

৫. **টেস্টোস্টেরোন :** পুরুষের জনন অঙ্গের বৃদ্ধির পাশাপাশি জননচক্র এবং যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পুরুষের শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়।

৬. **এস্ট্রোজেন :** মেয়েদের জনন অঙ্গের বৃদ্ধির পাশাপাশি জননচক্র এবং যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মেয়েদের ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন হয়।

৭. **প্রোজেস্টেরোন :** সন্তান জন্মের জন্য গর্ভাশয়কে প্রস্তুত করে এবং গর্ভকালীন সময়ে সহায়তা করে; মেয়েদের ডিম্বাশয়, বিশেষভাবে কর্পাস লুটিয়ামে উৎপন্ন হয়।

৮. **গ্রোথ হরমোন :** দৈহিক বৃদ্ধি, কোষ বিভাজনে সহায়তা করে; পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা উৎপন্ন।

৯. **মেলাটোনিন :** ঘুম-জাগরণ চক্র এবং দিন-রাত অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে ; পাইনিয়াল বডি দ্বারা উৎপন্ন।

১০. **অক্সিটোসিন :** সামাজিক বন্ধন উৎসাহিত করে, প্রসবে সহায়তা করে এবং মাতৃদুগ্ধ নির্গমনে সহায়তা করে; হাইপোথালামাস দ্বারা উৎপন্ন এবং পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা মুক্ত।

১১.৩ হৃদ-সংবহন তন্ত্র (Blood Circulation) :

রক্ত জীবনীশক্তির মূল। রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় ও কোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে দেহের সব কোষকে সজীব এবং সক্রিয় রাখে। একই সঙ্গে রক্তের বর্জ্য পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত করা হয়। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং অংশে চলাচল করে তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।

মানব দেহে রক্তপ্রবাহ কেবল হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনও এর বাইরে আসে না। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে বন্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system) বলা হয়। সারাদেহে রক্ত একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় লাগে। বদ্ধ সংবহনতন্ত্রের বড়ো সুবিধা হলো এ ব্যবস্থায়-

(ক) রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছায়।

(খ) রক্তবাহী নালির ব্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহ কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(গ) রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

অন্যান্য তন্ত্রের তুলনায় রক্ত সংবহনতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও এর গঠন মোটামুটি সাধারণ।

১১.৩.১ রক্ত (Blood)

রক্ত একটি অস্বচ্ছ, মৃদু ক্ষারীয় এবং লবণাক্ত তরল পদার্থ। রক্ত হৃৎপিণ্ড, শিরা, উপশিরা, ধমনি, শাখা ধমনি এবং কৈশিকনালি পথে আবর্তিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তকণিকার জন্ম হয়।

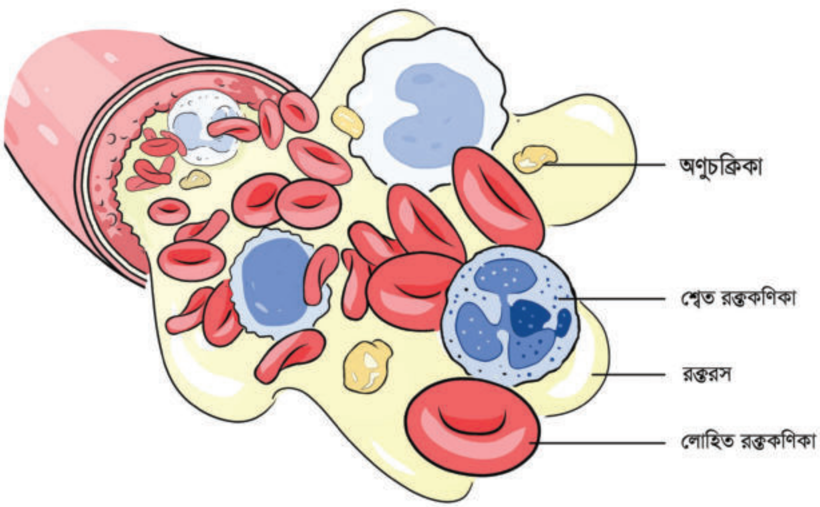

চিত্র ১১.৬ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

রক্তের উপাদান

রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। এটি রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্তকণিকা (চিত্র ১১.৬) দিয়ে গঠিত।

(ক) রক্তরস (Plasma)

রক্তের বর্ণহীন তরল অংশকে রক্তরস বলে। সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় 90 ভাগ রক্তরস। রক্তরসের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া বাকি অংশে যে পদার্থগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে : প্রোটিন, গ্লুকোজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

চর্বিকণা, খনিজ লবণ, ভিটামিন, হরমোন, এন্টিবডি। বর্জ্যপদার্থ হিসেবে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি। আমরা খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করি তা পরিপাক হয়ে অন্ত্রের গাত্রে শোষিত হয় এবং রক্তরসে মিশে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। এভাবে দেহকোষগুলো পুষ্টিকর দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেহের পুষ্টির সাধন এবং ক্ষয়পূরণ করে।

চিত্র ১১.৭ : লোহিত রক্তকণিকা

(খ) রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

মানব দেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা দেখা যায়- লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles) এবং অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। যদিও এগুলো সবই কোষ, তবে রক্তের প্লাজমার মধ্যে ভাসমান কণার সঙ্গে তুলনা করে এদেরকে অনেকদিন আগে রক্তকণিকা নাম দেওয়া হয়েছিল, সেই নাম এখনও প্রচলিত।

লোহিত রক্তকণিকা (RBC: Red Blood Corpuscles) : মানব দেহে তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (চিত্র ১১.৭)। লাল অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এর গড় আয়ু 120 দিন। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না, এবং দেখতে অনেকটা দ্বি-অবতল বৃত্তের মতো। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় 50 লক্ষ। সংখ্যায় এটি শ্বেত রক্তকণিকার চেয়ে প্রায় 500 গুণ বেশি। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়। লোহিত রক্তকণিকা শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এর হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহণ করে। হিমোগ্লোবিন

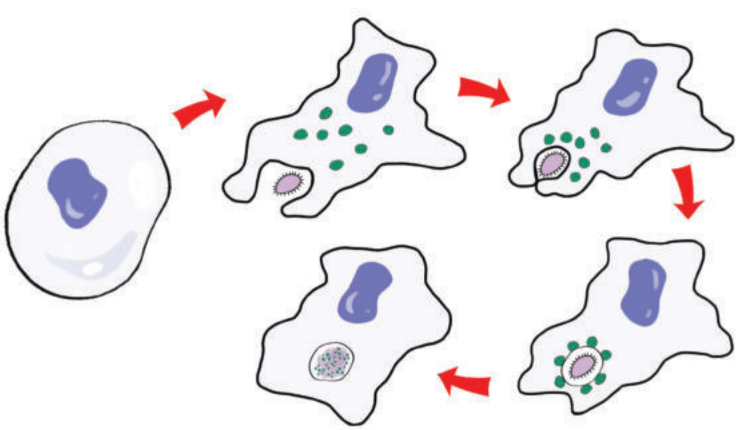

চিত্র ১১.৮ : শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে থাকে।

এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ, লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা (anemia) দেখা দেয়।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (WBC White Blood Cell) :

শ্বেত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড়ো আকারের কোষ, হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা বলে। শ্বেত রক্তকণিকায় DNA থাকে। শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা RBC -এর তুলনায় অনেক কম। শ্বেত রক্তকণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই, এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে (চিত্র ১১.৮)। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় (চিত্র ৩.০৩) এগুলো জীবাণুকে ধ্বংস করে।

শ্বেত রক্তকণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে এবং রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। শ্বেত রক্তকণিকার গড় আয়ু 1-15 দিন। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে, দ্রুত শ্বেতকণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানব দেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে 4-10 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানব দেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

অণুচক্রিকা (Platelet)

অণুচক্রিকা গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু 5-10 দিন। পরিণত মানব দেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।

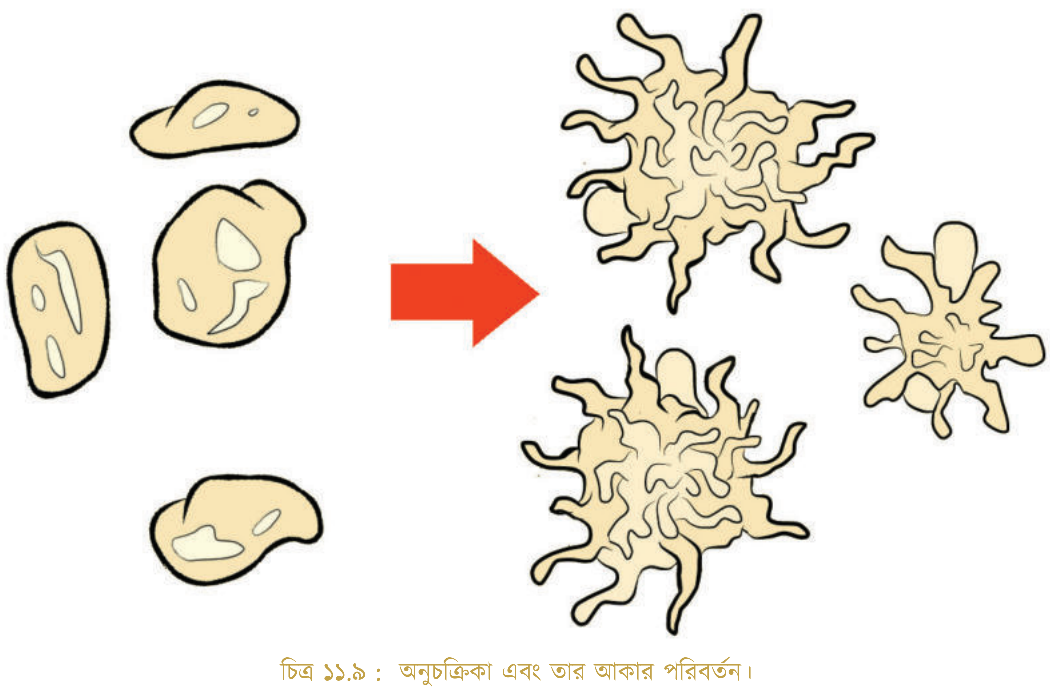

চিত্র ১১.৯ : অনুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন।

অনুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত জমাট বাঁধাতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেখানকার অনুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে (চিত্র ১১.৯) এবং ক্ষতস্থানে রক্তকে জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ অণুচক্রিকা না থাকলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না।

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি দেহের নানাবিধ কাজ করে থাকে, যেমন-

(১) অক্সিজেন পরিবহণ : লোহিত রক্তকণিকা কোষে অক্সিজেন পরিবহণ করে।

(২) কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ : রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোষগুলোতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তা রক্তরস এবং লোহিত রক্তকণিকার সমন্বয়ে সংগ্রহ করে ফুসফুসে নিয়ে আসে সেগুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহের বাইরে বের করে দেয়।

(৩) খাদ্যসার পরিবহণ : রক্তরস গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, চর্বিকণা ইত্যাদি কোষে সরবরাহ করে।

(৪) তাপের সমতা রক্ষা : দেহের মধ্যে অনবরত দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে, এতে করে বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দেহের সর্বত্র তাপের সমতা রক্ষা হয়।

(৫) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : রক্ত দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বহন করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে সেসব ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশন করে।

(৬) হরমোন পরিবহণ : হরমোন সরাসরি রক্তে মিশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৭) রোগ প্রতিরোধ : কয়েক প্রকারের শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এন্টিবডি ও এন্টিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(৮) রক্ত জমাট বাঁধা : দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দেহের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

১১.৩.২ রক্তনালি (Blood Vessel) :

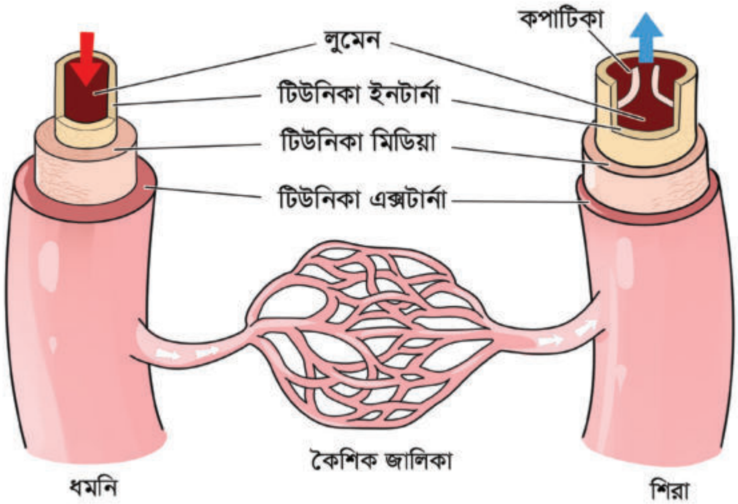

চিত্র ১১.১০ : বিভিন্ন ধরনের রক্ত বাহিকা

যেসব নালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে রক্তনালি বলে (চিত্র ১১.১০)। এসব নালিপথে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এই রক্তনালিকে তাদের গঠন, আকৃতি এবং কাজের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা।

(ক) ধমনি (Artery) : যেসব রক্তনালির ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে সারাদেহে রক্ত বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি ছাড়া অন্য সব ধমনির রক্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ। ফুসফুসীয় ধমনির বেলায় হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত এই ধমনি দিয়ে ফুসফুসে যায়।

ধমনির প্রাচীর পুরু ও স্থিতিস্থাপক, এর নালিপথ সরু এবং এটিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটি সংকোচন ও প্রসারণের সময় সারা দেহের সব ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয় তখন ধমনিগাত্র প্রসারিত বা সংকুচিত হয়। ধমনির এই স্ফীতি এবং সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বলে। ধমনির ভিতর রক্ত প্রবাহ, ধমনিগাত্রের সংকোচন, প্রসারণ এবং স্থিতিস্থাপকতা নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ। হাতের কব্জির ধমনির উপর হাত রেখে তোমরা এই নাড়িস্পন্দন অনুভব করতে পারবে।

(খ) শিরা (Vein)

শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে যেসব নালি দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে আসা শিরাটি ছাড়া অন্য সব শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত পরিবহণ করে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে

আসে। শুধু ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয়। ধমনির মতোই শিরা সারা দেহে ছড়িয়ে থাকে। শিরাগুলো শরীরের বিভিন্ন স্থানের কৈশিকনালি থেকে আরম্ভ হয় এবং অসংখ্য কৈশিকনালি একত্র হয়ে যথাক্রমে সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা, শিরা এবং সবশেষে মহাশিরায় পরিণত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। শিরার প্রাচীরও ধমনির মতো তিন স্তরবিশিষ্ট। এদের নালিপথ একটু চওড়া এবং সেখানে কপাটিকা থাকে। এদের প্রাচীর কম পুরু, কম স্থিতিস্থাপক এবং কম পেশিময়।

(গ) কৈশিক জালিকা (Capillaries)

পেশিতন্তুতে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি দেখা যায়। একে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালি বলে। এগুলো একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ফলে ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৈশিক নালিতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি কোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত সব বস্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষে প্রবেশ করতে পারে।

১১.৩.৩ হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

হৃৎপিণ্ডের গঠন

হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত।

হৃৎপিণ্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি নিচের দুটির চেয়ে আকারে ছোটো। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম অলিন্দ (rigth & left atrium) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান এবং বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে। হৃৎপিণ্ডের উভয় অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে এবং নিলয় ও ধমনিগুলোর মাঝে যে ছিদ্র পথ আছে তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালভ (valve) বা কপাটিকা থাকে। এদের আকৃতির ফলে এরা কেবল একদিকে খুলতে পারে এবং এ কারণে পাম্প করা রক্ত উল্টোদিকে ফিরে আসতে পারে না।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি

হৃৎপিণ্ডে অলিন্দ দুটি প্রসারিত হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত এসে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত উর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরার ভেতর দিয়ে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দুইটি ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার ভেতর দিয়ে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে (চিত্র ১১.১১)।

উপরে অলিন্দ দুটির সংকোচন হলে নিচের নিলয় দুটির পেশি প্রসারিত হয। তখন ডান অলিন্দ-নিলয়ের ছিদ্রপথের ভাল্ব খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে।

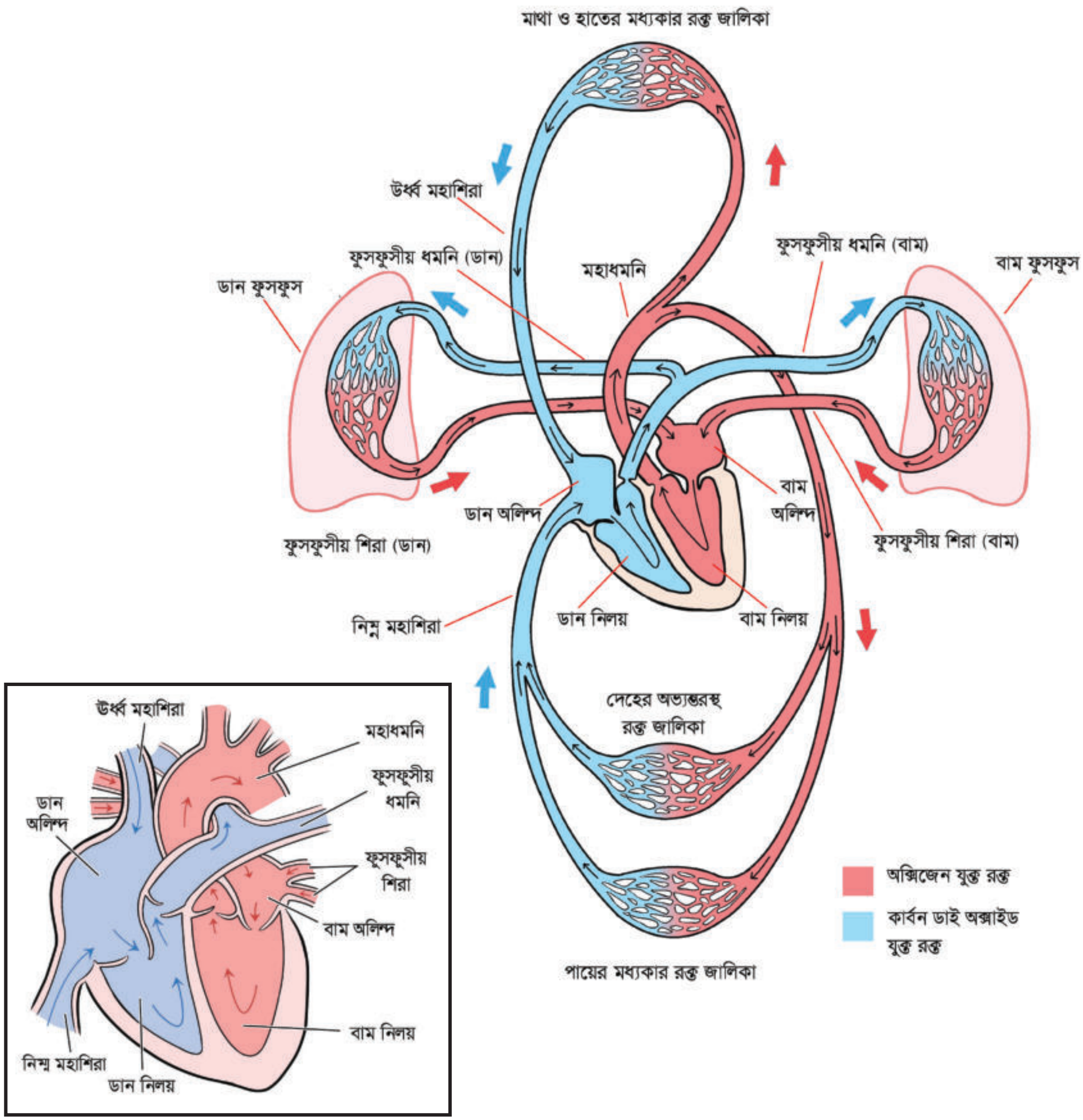

চিত্র ১১.১২ : হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের ধাপগুলো

ঠিক একই সময়ে বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ের ছিদ্রপথের ভাল্ব খুলে যায়, তখন বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পরপরই ছিদ্রগুলো কপাটিকা দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিলয় থেকে রক্ত আর অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে না।

যখন নিলয় দুটি সংকুচিত হয় তখন রক্ত পরিশোধিত করার জন্য ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময়ে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত মহাধমনির মাধমে সারা দেহে পরিবাহিত হয় এবং উভয় ধমনির কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

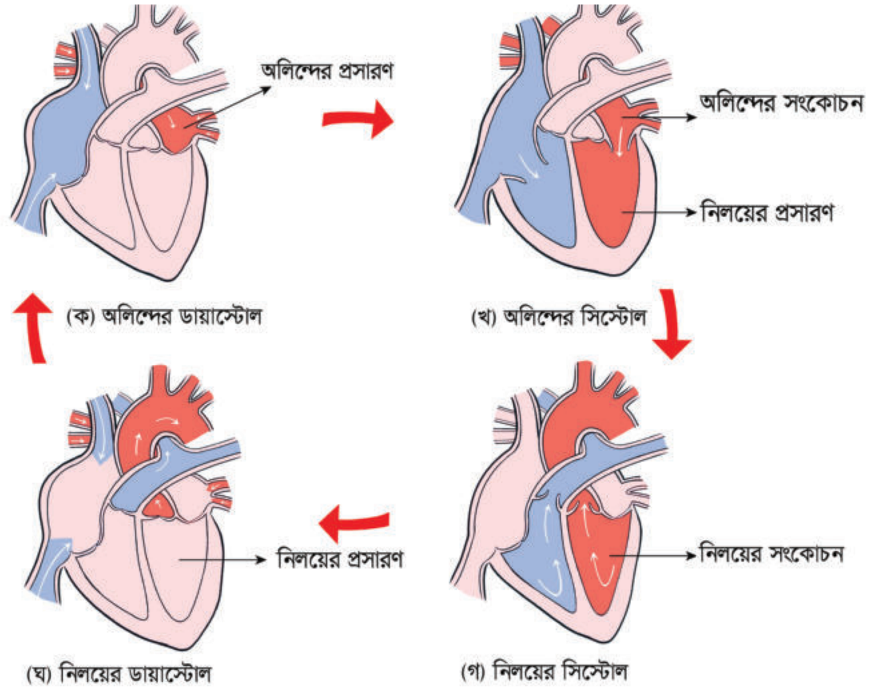

চিত্র ১১.১২ : হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের ধাপগুলো

রক্ত আর নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এভাবে হৃৎপিণ্ডে পর্যায়ক্রমিক সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে (চিত্র ১১.১২)।

হৃৎপিণ্ডের কাজ : রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় এখানে অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না।

১১.৩.৪ রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ

উচ্চ রক্তচাপ (High blood pressure) : হৃৎরোগ এবং স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ। রক্ত চলাচলের সময় রক্তনালি গাত্রে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত সিস্টোলিক চাপ 120 মিলিমিটার পারদের নিচে এবং ডায়াস্টলিক চাপ 80 মিলিমিটার পারদের নিচের মাত্রাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। আর এই রক্তচাপ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই আমরা তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি।

হার্ট অ্যাটাক : যখন কারও হৃদযন্ত্রের কোনো অংশে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন হৃৎপিণ্ডের কোষ কিংবা হৃৎপেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় যেগুলোকে এক নামে হার্ট অ্যাটাক নামে ডাকা হয়। হৃৎপিণ্ড রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং খাবারের সারবস্তু অর্থাৎ পুষ্টিকর পদার্থ রক্তনালির মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। নিজের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য অর্থাৎ তার হৃদপেশির অক্সিজেন এবং পুষ্টি অর্জনের জন্য হৃৎপিণ্ডের তিনটি প্রধান রক্তনালি আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক সময় চর্বি জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে প্রাণঘাতী রোগ হার্ট অ্যাটাক হয়। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন- অধিক তেলযুক্ত খাবার অলস জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে এই রোগ দেখা যায়।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরোল : দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতো হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন এবং খাদ্যসার সবরাহের প্রয়োজন হয়। হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির গায়ে চর্বি জমা হলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং খাদ্যসার না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রগ্রস্ত হয়। রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে অ্যানজিনা (Angina) বলা হয়। এছাড়া ধমনির গায়ে বেশি চর্বি জমা হলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে করোনারি হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

লিউকেমিয়া (Leukemia) : যদি কোনো কারণে রক্তে অস্বাভাবিকভাবে শ্বেত রক্তকণিকার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। অস্থিমজ্জা অত্যধিক হারে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন করার কারণে পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে। লোহিত রক্তকণিকার অভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি হয় যার ফলে রোগী দুর্বল বোধ করে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। অনুচক্রিকার অভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে না পেরে অনেক সময় কোনো আঘাত ছাড়াই অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। অধিক হারে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপন্ন হলেও সেগুলো আসলে ক্যান্সার কোষ এবং শ্বেত রক্তকণিকার স্বাভাবিক কাজ রোগপ্রতিরোধে অক্ষম। তাই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হন। এভাবে রক্তের তিন ধরনের কোষের প্রায় প্রতিটিরই স্বাভাবিক কাজ ঠিকমতো না করতে পারা এ রোগের লক্ষণ, তবে লিউকেমিয়ার প্রকারভেদ অনুসারে লক্ষণের তারতম্য হতে পারে।

১১.৪ মানব দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defense Mechanism)

মানব দেহের দৃশ্যমান গঠন এবং তার দেহের নানা ধরনের সমন্বিত কার্যক্রম আমরা প্রতিমুহূর্তে দেখতা পাই, এবং বিস্মিত হই, কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে চারপাশের অসংখ্য রোগ জীবাণু বা বিষাক্ত এবং দূষিত পদার্থের আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেহ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি গড়ে তুলেছে সেটি আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যে কোনো হিসেবে সেটি একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেরকম বাহ্যিক ভৌত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ঠিক একই রকম অত্যন্ত নিখুঁত ইমিউন ব্যবস্থা রয়েছে যেটি রোগ, জীবাণু ভাইরাস ভরপুর এই পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের রক্ষা করে যাছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, মানব দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো বিভিন্ন জৈবিক কাঠামো সহযোগে গঠিত একটি ব্যবস্থা যা জীবদেহকে রোগব্যাধির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। মানব দেহের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি প্রতিরক্ষা স্তর (defense lines) হিসেবে ভাগ করা যায়।

১১.৪.১ প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)

মানব দেহের প্রতিরক্ষায় প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরটি একটি রাসায়নিক ও ভৌত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে, যেন বাইরের কোনো অণুজীব বা কণা দেহের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। এটি যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো অণুজীব বা কণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি না করে একটি সাধারণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই এই প্রতিরক্ষা স্তরটি অনির্দিষ্ট বা নন-স্পেসিফিক স্তর নামেও পরিচিত। নিচের অঙ্গগুলো (চিত্র ১১.১৩) এই প্রতিরক্ষা স্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

ক. ত্বক (skin) : ত্বক আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড়ো অঙ্গ এবং এটি বায়ুরোধী, জলাভেদ্য (waterproof) এবং অধিকাংশ পদার্থের জন্য অভেদ্য। আমাদের শরীরকে আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অথবা ফানজাইয়ের বিরুদ্ধে ত্বক সবার প্রথম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলে। কতকগুলো ভাইরাস ছাড়া এমন কোনো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নেই যা অক্ষত ত্বকের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করতে পারে। মানবত্বকে উপকারী ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই থাকে, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সেখানে বাঁচতে পারে না। কারণ ত্বকের স্বেদ ও ঘাম গ্রন্থি থেকে যে তেল ও ঘাম বের হয় তা ত্বককে এসিডিক করে তুলে, যে পরিবেশে জীবাণু

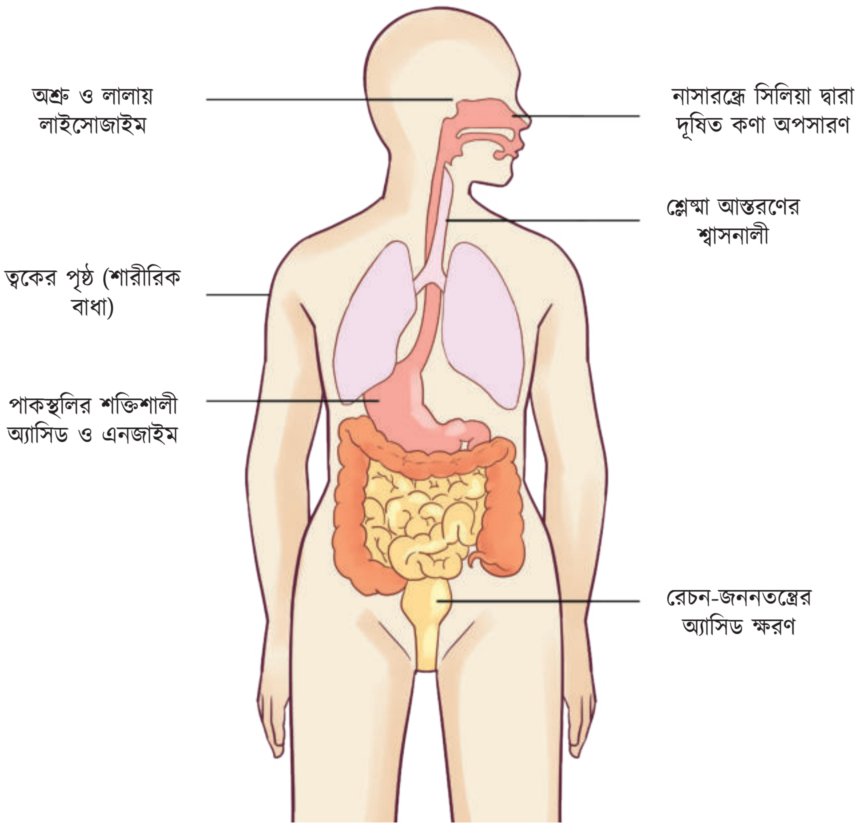

চিত্র ১১.১৩ : মানব দেহের প্রতিরক্ষায় প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, ত্বকে যেসব উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোও যে অ্যাসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য ত্যাগ করে সেসব পদার্থও ত্বকের উপরে ব্যাকটেরিয়া দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। স্বেদ ও ঘাম গ্রন্থির ক্ষরণেও জীবাণুনাশক পদার্থ থাকে। এসব পদার্থ থাকায় মানুষের ত্বক একটি রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

খ. লোম (Hairs): নাকের ভিতরে যে লোম রয়েছে সেগুলো ধুলা-ময়লা আটকে শরীরের ভেতরে ক্ষতিকর পদার্থকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

গ. সিলিয়া (Cilia): দেহের উন্মুক্ত প্রবেশ পথগুলো মিউকাসের ঝিল্লি দিয়ে ঢাকা থাকে। বাইরের দূষিত কণা ও অণুজীব ঝিল্লির এই আঠালো মিউকাসে আটকে যায়। শ্বাসনালিতে মিউকাস ঝিল্লিময় এই অংশ আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র চুলের মতো আন্দোলনরত সিলিয়া দিয়ে আবৃত থাকে, সেগুলো এই বহিরাগত কণা ও অণুজীবকে সরিয়ে দিয়ে দেহের এই প্রবেশপথকে উন্মুক্ত রাখে।

ঘ. সিরুমেন (Cerumen or Ear wax): কানের বাইরের প্রাচীর থেকে বের হওয়া হলদে-বাদামি রঙের মোমের মতো পদার্থকে সিরুমেন বলে। কানের পর্দায় যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য ময়লা বা অণুজীব সিরুমেনে আটকে গিয়ে কানের খইলে পরিণত হয়।

ঙ. অশ্রু ও লালা (Tears and Saliva): অশ্রু ও লালায় লাইসোজাইম (lysozyme) নামে একটি এনজাইম রয়েছে যেটি ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। অশ্রু চোখকে বারবার ভিজিয়ে দিয়ে সেটিকে বহিরাগত কণা ও অণুজীবের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। লালা মুখগহ্বরকে সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে, একই সঙ্গে মুখগহ্বরের প্রাচীর যেন শুকিয়ে না যায় সে কাজটিও করে থাকে। এ কারণে কোনো জীবিত ব্যাকটেরিয়া সহজে মুখের ক্ষতি করতে পারে না।

চ. পৌষ্টিকনালির অ্যাসিড (Acid of Alimentary canal): আমাদের দৈনন্দিন খাবার ও পানির সঙ্গে অনেক ধরনের ক্ষতিকর অণুজীব পাকস্থলিতে পৌঁছালেও,পাকস্থলির শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় সেগুলো টিকে থাকতে পারে না এবং সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়।

ছ. রেচন-জননতন্ত্রের অ্যাসিড (Acid of Excretory-reproductive system): রেচন ও জননতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ক্ষরণ এসিডিক ও আঠালো বলে দেহের ভেতরে কোনো অণুজীব প্রবেশ করতে চাইলে সেগুলো আঠালো এই ক্ষরণে আটকে যায়। পরে এগুলো মূত্রের সঙ্গে বের হয়ে যায় কিংবা ফ্যাগোসাইট এসে এগুলোকে গ্রাস করে। যোনিতে যে উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলো ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্ষরণ করে পিএইচ (pH) সাম্যতা রাখার পাশাপাশি অণুজীবের বংশবৃদ্ধি হতে বাধা দেয়।

১১.৪.২ দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)

প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে যদি দেহের ভেতরে কোনো অণুজীব বা অণুকণা প্রবেশ করতে পারে তখন

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে শরীরের ইমিউন ব্যবস্থা সেগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা নিয়ে গঠিত এই স্তরটিও প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের মতোই অনির্দিষ্ট বা নন-স্পেসিফিক। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা শরীরের নিজের কোষ এবং বাইরের অণুজীবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তাই শরীরের নিজের সুস্থ কোষের কোনো ক্ষতি না করে শুধু বাইরের অণুজীবকে ধ্বংস করে দেয়। দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর নিচের প্রতিরক্ষা পদ্ধতিগুলো নিয়ে নিয়ে গঠিত।

ক. ফ্যাগোসাইট (Phagocytes) : ফ্যাগোসাইট হচ্ছে অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হওয়া এক ধরনের বড়ো আকারের শ্বেত রক্তকণিকা যেগুলো অন্য অণুজীব বা বহিরাগত কণা গ্রাস করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা করে। দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইটিক কণিকা হচ্ছে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ। দেহে জীবাণুর সংক্রমণ হলে নিউট্রোফিল রক্তে, আর ম্যাক্রোফেজ নির্দিষ্ট টিস্যুতে হাজিয়ে হয়ে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে গ্রাস করতে শুরু করে। ম্যাক্রোফেজ শুধু যে জীবাণু গ্রাস ও হজম করে তা নয়, এটি পুরোনো রক্তকণিকা, মৃত টিস্যু-খণ্ড ও কোষীয় আবর্জনা গ্রাস করে আবর্জনাভুক হিসেবে বর্জ্য পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করে।

খ. সহজাত মারণকোষ (NK: Natural killer cells) : সহজাত মারণকোষ বা NK-কোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষের প্লাজমাঝিল্লিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনকে শনাক্ত করে সেইসব কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। NK-কোষের আক্রমণে টার্গেট কোষের ঝিল্লিতে ছিদ্র সৃষ্টি হয় এবং কোষটিকে ধ্বংস করার জন্য NK-কোষ সেই ছিদ্রপথে কোষের ভেতরে বিশেষ এনজাইম প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেটি কোষটিকে ধ্বংস করে দেয়।

গ. প্রদাহ (Inflammation) : আমরা সবাই শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হলে যে প্রদাহ হয় তার সঙ্গে পরিচিত (চিত্র ১১.১৪)। শরীরের টিস্যুতে দহন, রাসায়নিক বা আঘাতজনিত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত বা অন্য কোনো ধরনের

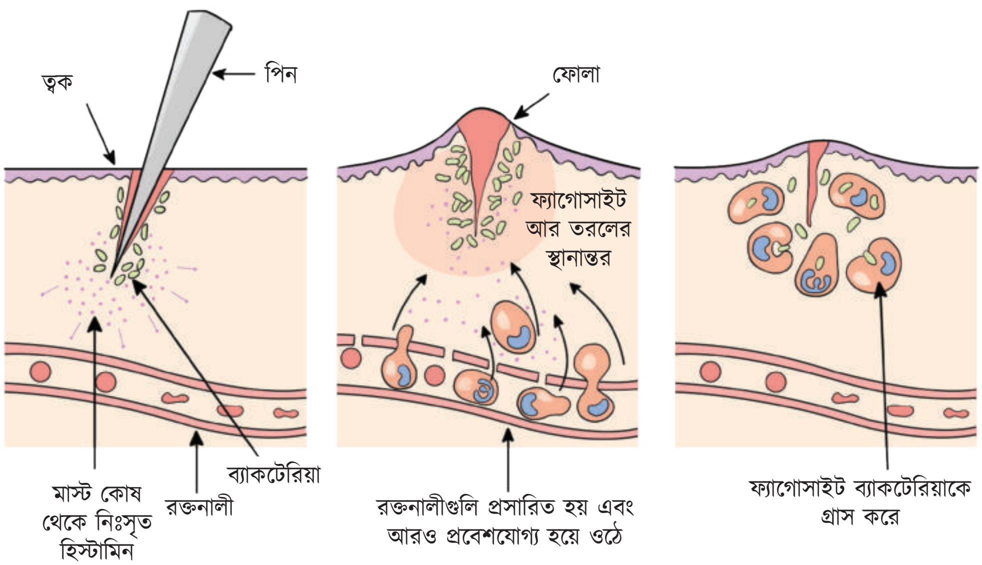

চিত্র ১১.১৪ : প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়া

সংক্রমণজনিত ক্ষত হলে সেখানে প্রদাহ হয়, অর্থাৎ ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায়, উত্তপ্ত হয়, ফুলে যায় এবং ব্যথা অনুভূত হয়। এটি আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একধরনের বহিঃপ্রকাশ। যখন টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেখানে এক ধরনের রাসায়নিক নিষ্ক্রমণ হয় যেটি ক্ষতস্থানে রক্তের বাড়তি প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই বাড়তি রক্তপ্রবাহ ক্ষতস্থানে প্রয়োজনীয় ইমিউন কোষ এবং পুষ্টি নিয়ে আসে যা ক্ষতস্থানের নিরাময় দ্রুততর করে থাকে।

ঘ. কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম (Complement system) :

কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে রক্তে উপস্থিত ত্রিশটি থেকে বেশি প্লাজমা প্রোটিন দিয়ে গঠিত একটি গ্রুপ যা অন্যান্য প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে, যে কারণে এটিকে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বলা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব প্রোটিন নিষ্ক্রিয় থাকে তবে একবার যদি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কোনো একটি প্রোটিন সক্রিয় হয়ে উঠে তাহলে সেটি অন্য প্রোটিনকেও সক্রিয় করে তুলে। এভাবে সমস্ত প্রোটিন পরস্পরকে সক্রিয় করে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট দুই ধরনের প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকেই উজ্জীবিত করে দেয়। যার কারণে মারণকোষ তখন দক্ষতার সঙ্গে অবাঞ্ছিত কোষ ধ্বংস করতে পারে। অণুজীবের গায়ে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম আটকে থেকে সেটি চিনিয়ে দেয় বলে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ দ্রুত সেই আক্রান্ত স্থানে পৌঁছে কোষকে আক্রমণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রদাহকে ত্বরান্বিত করার জন্য কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম রক্তনালিকার প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে।

ঙ. ইন্টারফেরন (Interferon) : ইন্টারফেরন মানব দেহের সহজাত ইমিউন ব্যবস্থাপনার অংশ। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন নামে এই বিশেষ এক ধরনের ক্ষুদ্র সিগনালিং প্রোটিন উৎপন্ন হয়। ব্যাপনের মাধ্যমে ইন্টারফেরন আশপাশের সুস্থ কোষে ছড়িয়ে পড়ে, ওইসব কোষের ঝিল্লিতে যুক্ত হয় এবং সুস্থ কোষগুলোকে আরও ইন্টারফেরন তৈরি করতে প্রেরণা দিয়ে থাকে, যার ফলে ভাইরাস অন্য সুরক্ষিত কোষগুলোকে আক্রমণ করতে পারে না। ইন্টারফেরন চিকিৎসার কাজেও ব্যবহার হয়। কৃত্রিম উপায়ে ইন্টারফেরন-আলফা এবং ইন্টারফেরন-বেটা তৈরি করা হয়েছে যেগুলো হেপাটাইটিস বি এবং সি -এর মতো ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

চ. জ্বর (Fever) : দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে তাকে জ্বর বলা হয় এবং এটি দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি দেহের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ম্যাক্রোফেজ নামে শ্বেতকণিকা যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত কণাকে শনাক্ত ও আক্রমণ করে তখন কোষগুলো রক্তপ্রবাহে পাইরোজেন (pyrogen) নামক একধরনের জৈব অণু ক্ষরণ করে। এই পাইরোজেন হাইপোথ্যালামাসের বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতর মাত্রায় নির্ধারণ করায়, আমরা যেটাকে জ্বর বলে থাকি। জ্বর হলে দেহকোষের বিপাকীয় হার বেড়ে যায়, প্রতিরক্ষা পদ্ধতি ও টিস্যুর ক্ষয়পূরণ দ্রুততর হয় এবং উচ্চ তাপমাত্রায় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। জ্বরশেষে যখন পাইরোজেনের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেহের তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

১১.৪.৩ তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third line of Defense)

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর অনির্দিষ্ট বা নন-স্পেসিফিক, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণাকে লক্ষ বা টার্গেট করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে না। সেদিক দিয়ে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ব্যতিক্রম কারণ এই প্রতিরক্ষা স্তর দেহে প্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণাকে শুধু ধ্বংস করে না, প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যে কোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকরভাবে সাড়া দিতে পারে। তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের কর্মকাণ্ড ইমিউন সাড়া (immune response) বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরে বৈশিষ্ট্যগুলো এরকম :

(ক) টার্গেট : এই প্রতিরক্ষা স্তর বহিরাগত অণুজীব বা কণা শনাক্ত করে টার্গেটে পরিণত করতে পারে, একই সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যবান কোষকে ক্যান্সার কোষের মতো অসুস্থ, মৃতপ্রায় বা মৃতকোষ থেকে পৃথক করতে পারে। রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে টার্গেট করার জন্য সেগুলোর পৃষ্ঠদেশের সুনির্দিষ্ট আণবিক মার্কারকে শনাক্ত করার প্রয়োজন হয়। টার্গেট শনাক্ত করার পর ঐ জীবাণুকে ধ্বংস করার উপযোগী ইমিউন কোষ তৈরি করা হয়।

(খ) মেমরি কোষ : তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বহিরাগত অণুজীব বা কণার সংক্রমণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে। প্রথমবার কোনো একটি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর এই প্রতিরক্ষা স্তর দেহে মেমরি কোষ সৃষ্টি করে। যদি পরবর্তী কালে একই জীবাণু আবার সংক্রমণের চেষ্টা করে তাহলে মেমরি কোষ সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে। এভাবে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বহিরাগতের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঠেকানোর চেষ্টা করে।

(গ) সামগ্রিক প্রতিরক্ষা : তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর সমগ্র দেহকে রক্ষা করে। অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুধু দেহের নির্দিষ্ট অংশে কার্যকর না থেকে শরীরের যে কোনো অংশে কার্যকর হতে পারে।

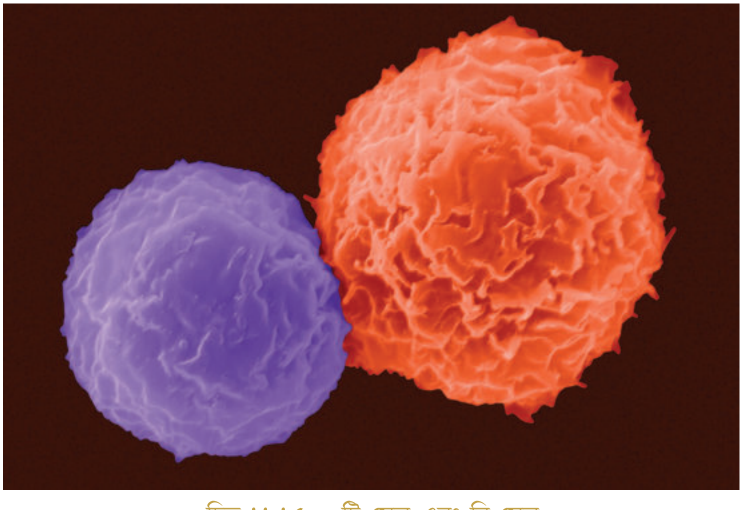

চিত্র ১১.১৫ : টি সেল এবং বি সেল

(ঘ) বি-সেল: বি-সেল এবং টি-সেল (চিত্র ১১.১৫) মানুষের ইমিউন প্রক্রিয়ার অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ দুইটি উপাদান। এই শ্বেতকণিকাগুলো অভিযোজিত ইমিউন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রত্যেকটি বি-সেল নির্দিষ্ট এন্টিজেনকে (একটি জীবাণুর পৃষ্ঠদেশের সুনির্দিষ্ট আণবিক গঠন বা মার্কার) শনাক্ত করতে পারে এবং শনাক্ত করার পর সেটি কার্যকর হয়ে উঠে দ্রুত বিভাজিত হতে শুরু করে। বি-সেল শনাক্তকারী জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য এন্টিবডি তৈরি করে সেগুলোকে রক্তের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এ ছাড়াও প্রতিরোধ শেষে এই জীবাণুকে পরবর্তী কালে শনাক্ত করার জন্য কিছু বি-সেল পরিবর্তিত হয়ে মেমরি কোষে পরিণত হয়।

(ঙ) টি-সেল :

টি-সেল কোনো এন্টিবডি তৈরি করে না কিন্তু ইমিউন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কখনো কখনো এগুলো সরাসরি সংক্রামিত কোষকে আক্রমণ করে কখনো কখনো NK-কোষ বা অন্য ধরনের ইমিউন কোষকে উজ্জীবিত করে। বি-সেলের মতো এই কোষগুলোও মেমোরি সেল তৈরি করে পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকে।

টীকা বা ভ্যাক্সিন দিয়ে পৃথিবীর অসংখ্য জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এই টীকা বা ভ্যাক্সিন তৈরি করার পিছনে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের অভিযোজন প্রক্রিয়ার ধারণাটি কাজ করে থাকে। যে জীবাণুর বিরুদ্ধে টীকা তৈরি করা হয় সেই জীবাণুটি কিংবা তার এন্টিজেনকে দুর্বল বা অকার্যকর হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হয়। শরীরের তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় এন্টিবডি এবং মেমোরি কোষ তৈরি করে। পরবর্তী কালে সেই জীবাণুর সত্যিকারের সংক্রমণ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ইমিউন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে উঠে আমাদের সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

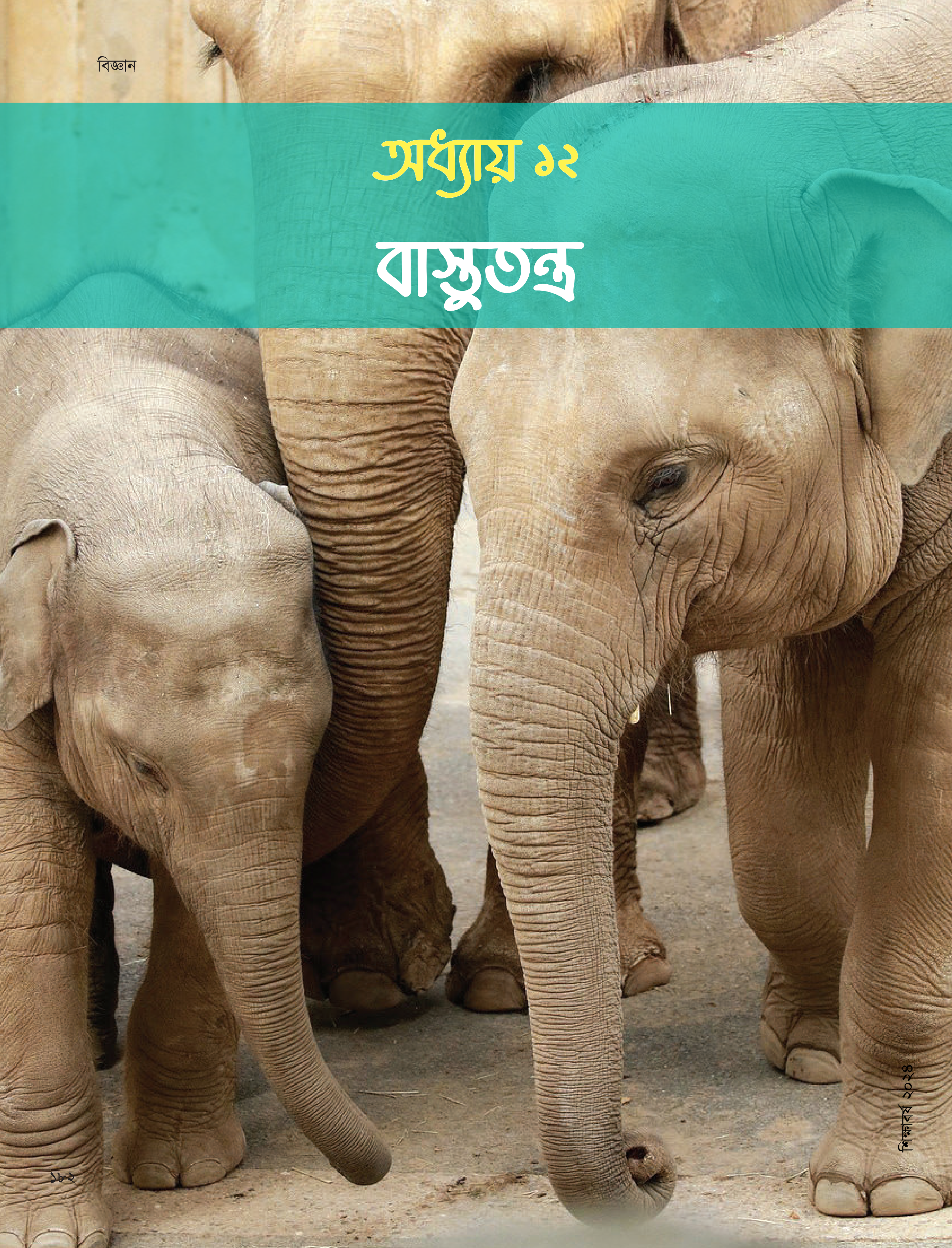

অধ্যায় ১২

বাস্তুতন্ত্র

অধ্যায় ১২
বাস্তুতন্ত্র

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ বিভিন্ন জীবের নিবিড় সহাবস্থান
- ☑ বাস্তুসংস্থান (Ecology, study) ও বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)
- ☑ পপুলেশন ইকোলজি
- ☑ খাদ্যচক্র, খাদ্যপিরামিড
- ☑ পানিচক্র
- ☑ অক্সিজেন চক্র
- ☑ নাইট্রোজেন চক্র
- ☑ বিভিন্ন পরিবেশে জীবের অভিযোজন

১২.১ বিভিন্ন জীবের নিবিড় সহাবস্থান

আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের গ্রহ- নক্ষত্রের মাঝে শুধু পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে। কোটি কোটি বছরে পরিবর্তনশীল। এই পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে এই প্রাণ পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে, বিবর্তিত এবং অভিযোজিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে যে জীবজগৎ রয়েছে তার মাঝে রয়েছে একটি অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য। জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার কারণেই জীবজগৎকে লক্ষ লক্ষ প্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রজাতির রয়েছে তার নিজের বৈশিষ্ট্য, এবং তার সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে যে কোনো একটি প্রজাতি অন্যসব প্রজাতি থেকে ভিন্ন, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলেই কিন্তু আমরা আবিষ্কার করব যে প্রকৃতির এই উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সকল জীব ঐ অঞ্চলে অবস্থিত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে বিভিন্ন জীবের মাঝে যে নিবিড় সহাবস্থান গড়ে উঠেছে এবং সে কারণে জীবজগতে যে এক ধরনের ভারসাম্যতা বজায় রয়েছে আমরা নিচে তার উপর আলোকপাত করব।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে সবুজ উদ্ভিদকে আমাদের স্বনির্ভর মনে হয়, কারণ তারা স্বভোজী—সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাবার নিজেরা তৈরি করে নেয়। কিন্তু পরিবেশের দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবুজ গাছপালা পুরোপুরি স্বনির্ভর নয়। যেমন- সবুজ উদ্ভিদকে সালোকসংশ্লেষণের জন্য যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর করতে হয়, সেটি জীবেরা তাদের শ্বসনক্রিয়ার মাধ্যমে ত্যাগ করে। পর-পরাগায়নের জন্য একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ কীটপতঙ্গের উপর নির্ভর করে। আবার বীজ বিতরণের

জন্যও উদ্ভিদ পশুপাখির উপর নির্ভর করে। এভাবে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য সকল জীবজন্তু একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত এবং কমবেশি নির্ভরশীল। যেমন- সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ করে যে অক্সিজেন ত্যাগ করে শ্বসনের জন্য জীবজগৎ সেটি ব্যবহার করে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দিয়ে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। আমাদের শরীরে যত সংখ্যক দেহকোষ রয়েছে তার থেকে বেশি সংখ্যক অণুজীব বসবাস করে, সেগুলো আমাদের জৈবিক ক্রিয়াকর্মে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায় যে, পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতাই হচ্ছে জীবনক্রিয়া পরিচালনার চাবিকাঠি। জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা এবং প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক সম্পর্কগুলোকে সহ-অবস্থান বা সিম্বিওসিস (Symbiosis) বলা হয়। এই সহ-অবস্থানকারী জীবগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া ঘটে তার উপর ভিত্তি করে সিম্বিওসিস প্রক্রিয়াকে মিউচুয়ালিজম, কমেনসেলিজম এবং প্যারাসিটিজম এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

মিউচুয়ালিজম (Mutualism) :

চিত্র ১২.১ : মিউচুয়ালিজম : (বামে) মৌমাছির পরাগায়ন (ডানে) পিঁপড়া ও এফিড

যে আন্তঃসম্পর্কে দুটি জীব একটি অন্যটিকে সহায়তা করে এবং উভয়ই একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয় তাকে মিউচুয়ালিজম বলে। যেমন- মৌমাছি খাবার হিসেবে ফুলের মধু এবং পরাগ আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, তার বিনিময়ে ফুলের পরাগায়ন ঘটে এবং উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনেক পাখি এবং বাদুড় ফল খেয়ে বাঁচে এবং মলত্যাগের সঙ্গে ফলের বীজও ত্যাগ করে। এভাবে বীজের স্থানান্তর হয় এবং এ বীজ নতুন গাছ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কিছু পিঁপড়া আছে যারা এফিড নামে এক ধরনের কীট পালন করে, তাদেরকে অন্য কীটভুক প্রাণী থেকে রক্ষা করে, বিনিময়ে এফিড তার শরীর থাকে নির্গত হানিডিউ নামে মিষ্টি এক ধরনের তরল পিঁপড়াদের পান করতে দেয় (চিত্র ১২.১)। পিঁপড়া আর এফিডের এই মিউচুয়ালিজমে দুই পক্ষেরই উপকার হয়।

কমেনসেলিজম (Commensalism) :

কমেনসেলিজমের ক্ষেত্রে দুই সহযোগীর মধ্যে একজনমাত্র উপকৃত হয়, অন্য সহযোগী সদস্য উপকৃত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন- রোহিণী উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটিতে আবদ্ধ করে এবং অন্য বড়ো উদ্ভিদকে আরওহণ করে উপরে উঠে। এরূপে অন্য বৃক্ষের উপর প্রসারিত হয়ে বেশি পরিমাণে আলো গ্রহণ করে কিন্তু বৃক্ষটির কোনো ক্ষতি করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (epiphyte) অন্য বৃক্ষে ঝুলে থেকে বায়ু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু আশ্রয়দাতার কোনো ক্ষতি করে না। রেমোরা নামে এক ধরনের ক্ষুদ্র মাছ তাদের বিশেষ চুষনী ব্যবহার করে হাঙর মাছের মতো অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীর গায়ে আটকে থাকে (চিত্র ১২.২)। এটি নিজের কোনো পরিশ্রম না করেই হাঙ্গর মাছের সাহায্য নিয়ে সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়ায় এবং তার পরিত্যক্ত খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে । এই কমেনসেলিজমে দুই সহযোগীর মাঝে হাঙ্গরের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু রেমোরা মাছের অনেক বড়ো লাভ হয়।

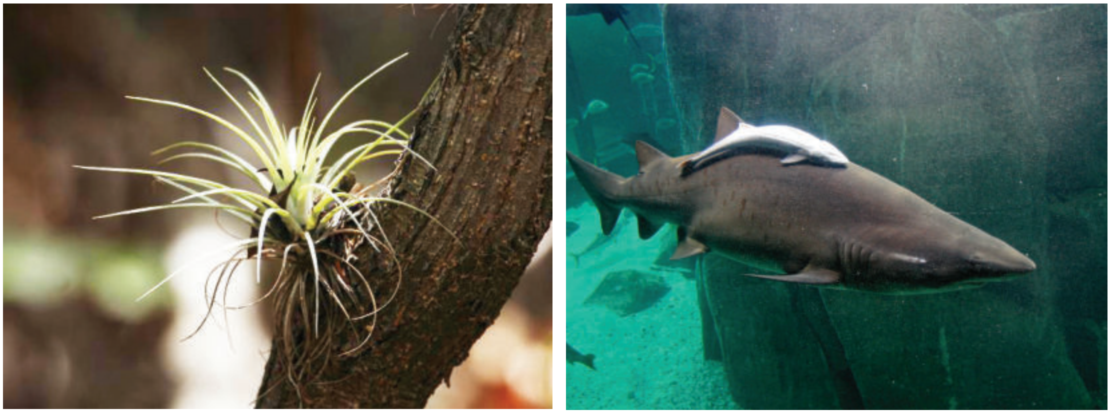

চিত্র ১২.২ : কমেনসেলিজম : (বামে) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (ডানে) হাঙর ও রেমোরা মাছ

প্যারাসিটিজম (Parasitism) :

এক্ষেত্রে একটি জীব অন্য জীবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের অধিকার ভোগ করে। যেমন- স্বর্ণলতা উদ্ভিদ, এটি তার আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করে (চিত্র ১২.৩)। কোকিল কখনো পরিশ্রম করে বাসা তৈরি করে না। কাকের বাসায় সে ডিম পাড়ে এবং কাকের দ্বারাই তার ডিম ফোটায়। ম্যালেরিয়া রোগ একটি মশাবাহিত রোগ, এই রোগের জীবাণু মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তের লোহিত কণা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে তার

চিত্র ১২.৩ : প্যারাসিটিজম : স্বর্ণলতা এবং পোষক উদ্ভিদ

বংশ বৃদ্ধি করে। এখানে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিজের জীবন চক্র পূরণ করার জন্য মানুষের দেহকে ব্যবহার করে। ম্যালেরিয়ার সংক্রমণে মানুষের নানা ধরনের বিপজ্জনক উপসর্গ সৃষ্টি হয়। এই প্যারাসিটিজমে দুই সহযোগীর মাঝে মানুষের অনেক ক্ষতি করে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার জীবন চক্র পূর্ণ করে।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে এবং প্রতিটি জীব পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক দিয়ে কেউ লাভবান হচ্ছে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে, আর এভাবেই তারা একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

১২.২ বাস্তুসংস্থান ও বাস্তুতন্ত্র (Ecology and Ecosystem)

বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি (Ecology) বলতে বোঝানো হয় জীবজগৎ ও তার পারিপার্শিক পরিবেশে মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান। অন্যদিকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম (Ecosystem) হচ্ছে একটি অঞ্চল, যেখানে সেই অঞ্চলের বসবাসকারী উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সঙ্গে সেই অঞ্চলের জড় উপাদান—যেমন- মাটি, জল, বায়ু, সূর্যালোকের সঙ্গে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া ঘটছে। জড়জগৎ ও জীবজগৎ উভয়ই হলো বাস্তুতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

১২.২.১ বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

পৃথিবীর সব জীব, জড় ও ভৌত অবস্থা সবকিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। জীব সক্রিয়ভাবে জড়জগৎ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তার জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর তার দেহ পরিবেশে মিশে গিয়ে সেসব গৃহীত উপাদান আবার জড় পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট তৈরির সময় অক্সিজেন ত্যাগ করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী মিলিয়ে পুরো জীবজগতের শ্বসনের জন্য যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন তার একটি বড়ো অংশ আসে এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে। সবুজ-অসবুজ এই দুই ধরনের উদ্ভিদই মাটি বা পানি থেকে কিছু খনিজ লবণ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণীরা নানাভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বেঁচে থাকে। বিভিন্ন স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা আবার তৃণভোজী বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সকল প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ পরিবেশেই মিশে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর পর উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহ পচনক্রিয়ার মাধ্যমে আবার পরিবেশেই ফিরে যায়। এই পচনের কাজটি করে ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু অণুজীব। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিক নিয়মেই বজায় থাকে।

তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছ প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুই ধরনের জীবের সঙ্গে জড়পদার্থের মধ্যে যে শক্তি আর বস্তুর আদান প্রদান হয় তাকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়া, আর এ ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক ঘটে, পৃথিবীর এরকম যে কোনো অঞ্চলই হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। সুতরাং

বাস্তুতন্ত্র বলতে ভূপৃষ্ঠের এমন কোনো অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে জড়, খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ উদ্ভিদ, খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল কিছু প্রাণী এবং মৃত্যুর পর সেই জীবদেহকে পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য অণুজীব রয়েছে এবং এসব উপাদানের মধ্যে যথাযথ আন্তঃসম্পর্ক চলমান রয়েছে।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ :

জীব সম্প্রদায়, পরিবেশের জড়পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিতে আবার রয়েছে অনেক ধরনের ছোটো ছোটো উপাদান (চিত্র ১২.৪)। বিভিন্ন উপাদানের মাঝে জীব উপাদানগুলোই সব সময় সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

জড় উপাদান (Nonliving matters) :

পরিবেশের জড় পদার্থগুলো জীব উপাদানের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন জোগায় এবং বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্রের সকল জড় উপাদানকে আবার অজৈব এবং জৈব এই দুভাগে ভাগ করা যায়।

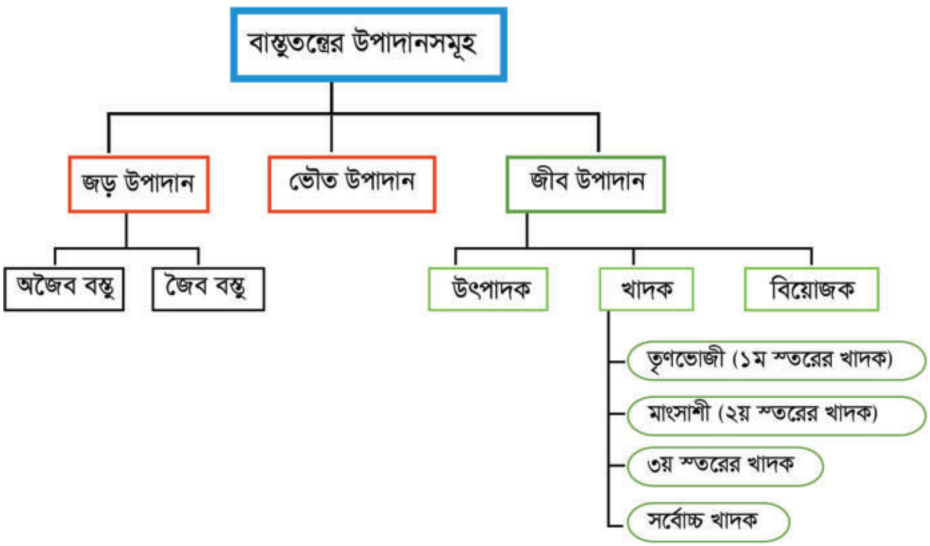

চিত্র ১২.৪ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো

(ক) অজৈব বস্তু (Inorganic matters) : পানি, বায়ু, এবং মাটিতে অবস্থিত খনিজ পদার্থ অর্থাৎ যেসব পদার্থ কোনো জীবদেহ থেকে আসেনি, বরং জীবের উদ্ভবের আগেই পরিবেশে ছিল সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান। যেমন- ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি।

(খ) জৈব বস্তু (Organic matters) : উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা এসব জীবের মৃতদেহ থেকে যেসব জড়বস্তু বাস্তুতন্ত্রে যোগ হয় তাদের বলা হয় জৈব উপাদান। এগুলো সচরাচর হিউমাস নামে পরিচিত। হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, অঙ্গ ইত্যাদি। জৈববস্তু উদ্ভিদের জন্য বেশি পুষ্টিকর। তাই উদ্ভিদ চাষে বেশি করে জৈব সার দিতে হয়। বহু প্রাণীও হিউমাসসমৃদ্ধ মাটি বেশি পছন্দ করে।

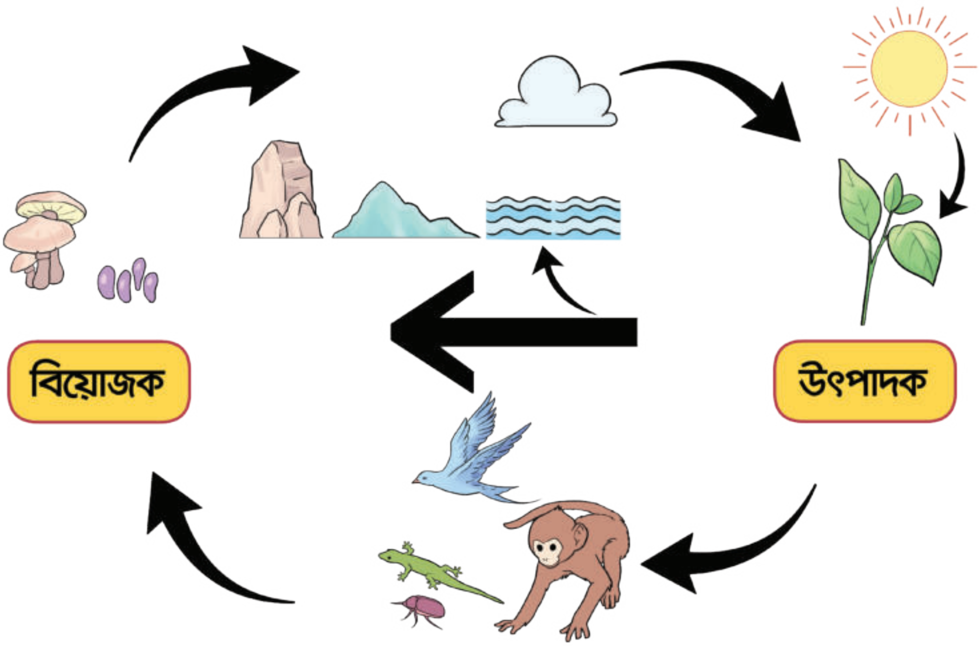

চিত্র ১২.৫ : বাস্তুতন্ত্রের জীবজ উপাদান

ভৌত উপাদান (Physical components)

পরিবেশে সূর্যালোকের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা (মাটির নিচে বা পানির নিচে) এবং উচ্চতা ইত্যাদি বহু উপাদান বাস্তুতন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান মিলে গড়ে ওঠে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এইসবই হচ্ছে কোনো বাস্তুতন্ত্রের ভৌত উপাদান।

জীবজ উপাদান (Living components) :

জীবকুল বাস্তুতন্ত্রের সক্রিয় উপাদান। এরাই তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। পরিবেশের জীবজ উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার- উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজক (চিত্র ১২.৫)।

(ক) উৎপাদক (producer) : সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি করে। এ সময় উপজাত হিসেবে উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদকুল। এই উৎপাদক উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় স্বভোজী (Autotroph) কারণ তারা নিজের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো জীবের উপর নির্ভর করতে হয় না।

(খ) খাদক (Consumer) : কোনো প্রাণীই পরিবেশের জড়পদার্থ থেকে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের বলা হয় পরভোজী জীব। যেসব প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী (herbivorous)। এদের অপর নাম প্রথম শ্রেণির খাদক। ঘাস ফড়িং, মুরগি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বলা হয় গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। এরা এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী। ব্যাঙ, শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

যেসব প্রাণী গৌণ খাদকদের খেয়ে বাঁচে তারাও মাংসাশী প্রাণী (carnivorous)। এদের বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদক। সাপ, ময়ূর, বাঘ ইত্যাদি এই শ্রেণির খাদক।

একটি বিশেষ শ্রেণির খাদক জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে মৃত প্রাণীর মাংস বা আবর্জনা খেতে বেশি পছন্দ করে। যেমন- কাক, শকুন, শিয়াল, হায়েনা ইত্যাদি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আবর্জনাভুক বা ধাঙড় (scavenger)। কারণ এরা মৃতদেহ বা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। উল্লেখ্য যে, কখনো কখনো বাস্তুতন্ত্রে এমন প্রাণী দেখা যায়, যারা একাই বিভিন্ন স্তরের খাদক হিসেবে ভূমিকা রাখে। যেমন-: মানুষ একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংশাসী (omnivorous)।

(গ) বিয়োজক (Decomposer) : ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র জীব বা অণুজীব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে এসব বর্জ্য বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সঙ্গে মিশে যায়। এই মিশে যাওয়া উপাদান তখন উদ্ভিদের পক্ষে আবার খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাই এই অণুজীবগুলোকে বলা হয় বিয়োজক বা পরিবর্তক।

১২.৩ পপুলেশান ইকোলজি

পপুলেশান শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটি অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রজাতির সংখ্যা এবং পপুলেশান ইকোলজি বলতে বোঝানো হয় সেই অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে এই সংখ্যার সম্পর্ক। সময়ের সঙ্গে পপুলেশান কীভাবে বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় কিংবা দীর্ঘ সময়ব্যাপি স্থিতিশীল থাকে পপুলেশান ইকোলজি তার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে এবং ব্যাখ্যা করে। একই সঙ্গে একটি জীবের পপুলেশান কীভাবে সেই এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে পপুলেশান ইকোলজি সেই বিষয়েও আলোকপাত করে।

পপুলেশন ইকোলজির চারটি মূল উপাদান- হচ্ছে আকার, ঘনত্ব, জীব সংখ্যা, ডিস্পারসান এবং ডেমোগ্রাফি।

(ক) আকার (Size) : অঞ্চলটির নির্দিষ্ট জীবের মোট সংখ্যা হচ্ছে পপুলেশনের আকার।

(খ) ঘনত্ব (Density) : এই অঞ্চলের নির্দিষ্ট জীবটির মোট সংখ্যাকে তার এলাকার পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে জীব সংখ্যার বা পপুলেশনের ঘনত্ব পাওয়া যায়।

(গ) বিচ্ছুরণ (Dispersion) : পুরো এলাকায় জীবকুল কীভাবে ছড়িয়ে আছে সেটি দিয়ে জীবের বিচ্ছুরণ বোঝানো হয়। তিন ধরনের ডিস্পারসান হওয়া সম্ভব (চিত্র ১২.৬), সেগুলো হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো (Random), সুষম বা নিয়মিত (Uniform) এবং গুচ্ছ (Clumped)।

বিক্ষিপ্ত : কোনো প্রজাতির জীবকে যদি তার এলাকায় এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকতে পাওয়া যায় তাহলে তাকে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলোভাবে বণ্টিত বলা যায়। অনেক বুনোফুলের বীজ বাতাসে একটি এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার যে কোনো জায়গায় অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে, তাদেরকে বিক্ষিপ্ত বণ্টন বলা হয়।

সুষম : কোনো প্রজাতির জীবকে যদি তার এলাকায় পরস্পর থেকে মোটামুটি সমদূরত্বে পাওয়া যায় তাহলে সেটিকে সুষম বা নিয়মিত বণ্টন বলা হয়। পেঙ্গুইন পাখি হচ্ছে সুষম বণ্টনের উদাহরণ।

গুচ্ছ : অনেক প্রজাতির জীব দলবদ্ধভাবে থাকে, তাদের বণ্টনকে গুচ্ছ বণ্টন বলা হয়। হাতির পাল এই ধরনের বণ্টনের উদাহরণ।

চিত্র ১২.৬ : জীবের বিক্ষিপ্ত, সুষম এবং গুচ্ছ ধরনের বিচ্ছুরণ

(ঘ) ডেমোগ্রাফি : পপুলেশনের প্রতিটি বয়সের আনুপাতিক হারকে ডেমোগ্রাফি বলা হয়।

একটি অঞ্চলের জীবসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা হচ্ছে পপুলেশান ইকোলজির একটি মূল বিষয়। পপুলেশন বৃদ্ধির হার চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেগুলো হচ্ছে- জন্মহার, মৃত্যুহার, আগমনের হার (Immigretion) এবং নির্গমনের হার (Emigration)। আমরা যদি কোনো অঞ্চলের চড়ুই পাখির কথা

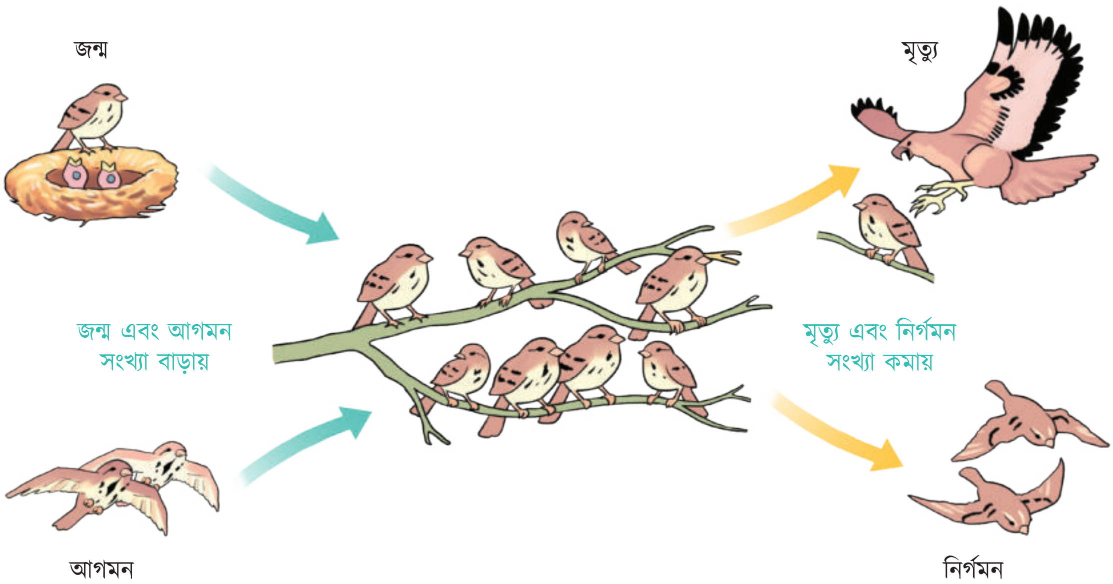

চিত্র ১২.৭ : জীবের পপুলেশান জন্ম, মৃত্যু, আগমনের হার এবং নির্গমনের হারের উপর নির্ভর করে।

চিন্তা করি, তাহলে দেখব প্রতি বছরে সেখানে বেশ কিছু চড়ুই পাখির জন্ম হয় আবার নানা কারণে বেশ কিছু চড়ুই পাখির মৃত্যুও হয়। যদি জন্মের হার মৃত্যুর হার থেকে বেশি হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে চড়ুই পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। জন্ম-মৃত্যুর হার ছাড়া আগমন এবং নির্গমনের হার পপুলেশন বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ভালো আবাসস্থলের খোঁজে কিছু চড়ুই পাখী এই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়ে পপুলেশনের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে, আবার অন্য এলাকা থেকে কিছু চড়ুই পাখি চলে এসে পপুলেশনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি নির্গমন থেকে আগমনের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে সেই এলাকার পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (চিত্র ১২.৭)।

পপুলেশন ইকোলজির আরও গভীরে প্রবেশের পূর্বে আমাদের জীবের বংশধর উৎপাদনের দুটি ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে আর এবং কে সিলেকশন (r and K Selection)। যেসব জীব অধিক সংখ্যক বংশধর উৎপাদন করে কিন্তু শৈশবে তাদের লালনের ব্যাপারে যত্নবান হয় না তাদেরকে 'আর-সিলেক্টেড' (r-Selected) জীব বলা হয়। পোকামাকড় বা মাছ হচ্ছে তাদের উদাহরণ। আবার যেসব জীব বংশধর উৎপাদনের বেলায় সংখ্যার চেয়ে মানের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ কমসংখ্যক বংশধর জন্ম দিয়ে অধিক পরিমাণ যত্ন দিয়ে বড়ো করে তোলে, তাদেরকে বলা হয় 'কে-সিলেক্টেড' (K-Selected) জীব। মানুষ এবং অন্য বড়ো স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে কে-সিলেক্টেড জীবের উদাহরণ। পরিবেশ যখন অনুকূল এবং স্থিতিশীল থাকে সেখানে কে-সিলেক্টেড জীব ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

'কে-সিলেক্টেড' জীব এবং আর-সিলেক্টেড' জীবকে আমরা তার জীবদ্দশার পুরো সময়টিতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন- মানুষ কিংবা হাতির মতো বিশাল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সন্তানের সংখ্যা খুব কম এবং তারা তাদের সন্তানদের শৈশবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। কাজেই এই প্রাণীগুলোর শিশু মৃত্যর হার কম এবং তাদের একটি বড়ো অংশ পূর্ণ বয়সে পৌঁছাতে পারে (চিত্র ১২.৮)। অন্যদিকে আর-সিলেক্টেড' জীব প্রচুর সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য

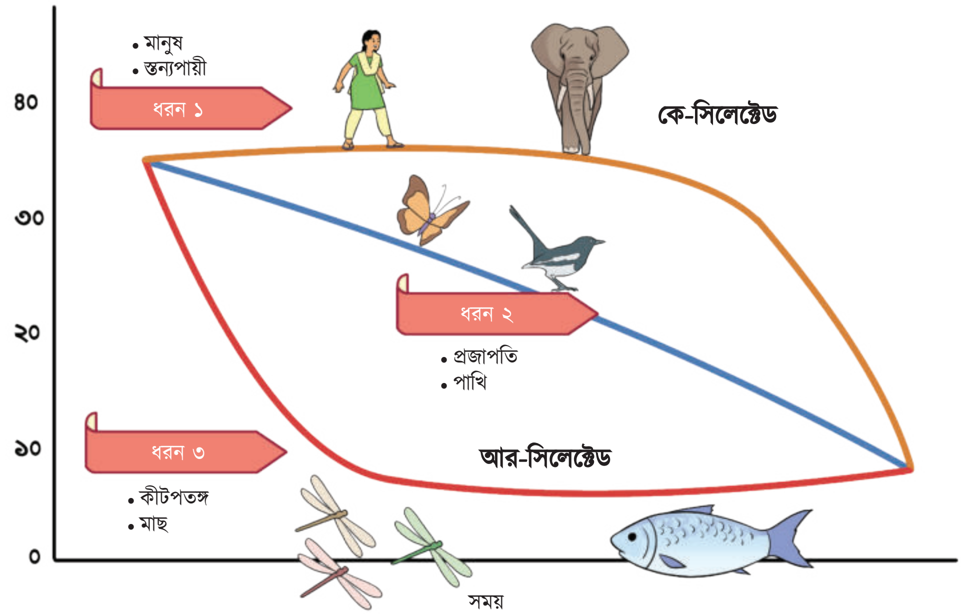

চিত্র ১২.৮ : 'কে-সিলেক্টেড' এবং আর-সিলেক্টেড' জীবের জীবদ্দশায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা

কোনো সময় কিংবা শক্তি ব্যয় করে না। এই জীবগুলো তাদের জীবদ্দশার শুরুতে অনেক বেশি সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করে, তবে একটু বয়স হয়ে যাবার পার সেগুলো টিকে থাকতে শুরু করে। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ বা মাছ এই দলের ভেতর পড়ে। জীবদ্দশায় টিকে থাকার সম্ভাবনার বিচার থেকে কে-সিলেক্টেড' জীবকে টাইপ I এবং আর-সিলেক্টেড' জীবকে টাইপ III বলা হয়। এই দুটি জীবনধারার মাঝামাঝি টাইপ II আরেকটি জীবন ধারা রয়েছে যেগুলোর মৃত্যুর আশঙ্কা পুরো জীবনে সমানভাবে বিস্তৃত। কিছু পাখি বা ইঁদুরকে এই দলভুক্ত করা যায়।

একটি এলাকায় একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীব কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে সেটি কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলো হচ্ছে- (১) জীবটি কত তাড়াতাড়ি সন্তান জন্ম দেওয়ার উপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত হতে পারে, (২) কত দ্রুত জীবটি পরবর্তী বংশধর জন্ম দিতে পারে, (৩) কত বেশি সংখ্যকবার বংশধর জন্ম দিতে পারে এবং (৪) প্রতিবার কত বেশি সংখ্যক বংশধর জন্ম দিতে পারে।

যদি পরিবেশ থেকে কোনো বাধা বা চাপের সম্মুখীন না হয় তাহলে পপুলেশন বৃদ্ধির হার জ্যামিতিক হারে বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সব সময়েই পপুলেশন বৃদ্ধি পাওয়ার পর পরিবেশে থেকে আলো, বাতাস, স্থান ও পুষ্টির অভাবের কারণে বৃদ্ধির হার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছানোর পর থেমে যায়। জন্ম ও মৃত্যুর হারে একটি সমতা আসার পর পপুলেশান একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আসে, একটি অঞ্চলের জন্য এই স্থিতিশীল সংখ্যাটিই হচ্ছে নির্দিষ্ট সেই জীবটির ক্যারিং ক্যাপাসিটি (caring capacity) । একটি অঞ্চলে কোনো একটি জীব যতগুলো জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাকে সেই জীবের ক্যারিং ক্যাপাসিটি বলে (চিত্র ১২.৯)।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ, একটি জীবের জন্য ক্যারিং ক্যাপাসিটি কত হবে সেটি অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তবে সাধারণভাবে সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, পপুলেশন ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল এবং নির্ভরশীল নয় এরকম দুটি বিষয়। খাদ্য, পানি বা আবাসভূমির সংকট ইত্যাদি পপুলেশন ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল বিষয়। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি পপুলেশন ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল নয় সেরকম কয়েকটি বিষয়।

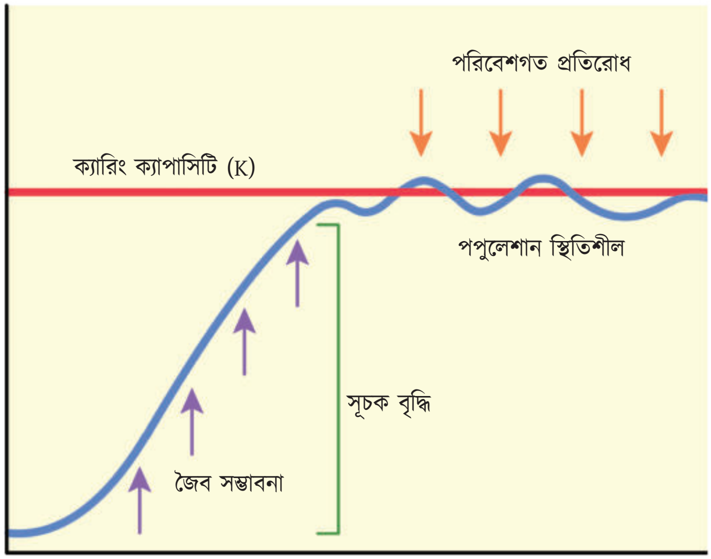

চিত্র ১২.৯ : জীবের ক্যারিং ক্যাপাসিটি

১২.৪ খাদ্যচক্র, শক্তিপিরামিড

১২.৪.১ খাদ্যশিকল (Food chain) :

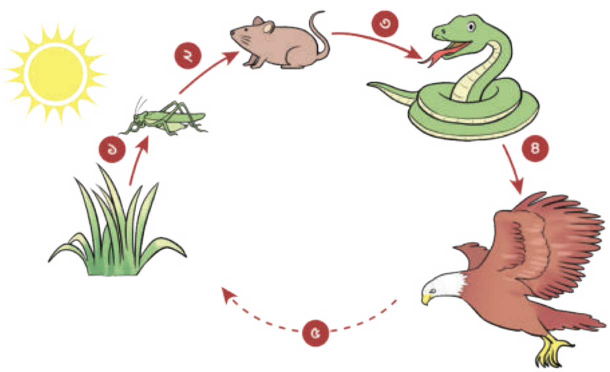

চিত্র ১২.১০ : খাদ্য শিকল

যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদানগুলোর মধ্যে উৎপাদক হিসেবে সবুজ উদ্ভিদ সবার প্রথম কাজে নামে। তারা খাদ্য তৈরি না করলে তৃণভোজী প্রাণীরা খাদ্য সংকটে পড়ে মারা যেত এবং তৃণভোজী প্রাণী না থাকলে মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খেতে না পেয়ে মারা যেতো। যখন খাদ্য শক্তি উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন সেই প্রবাহকে একসঙ্গে খাদ্যশিকল বা ফুড চেইন বলা হয় (চিত্র ১২.১০)।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাঠের সবুজ ঘাস হচ্ছে উৎপাদক। ঘাসফড়িং সে ঘাসের অংশবিশেষ খেয়ে বাঁচে।

ইঁদুর ঐ ঘাস ফড়িংকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আর সাপ সেই ইঁদুরকে খেয়ে ফেলে। সাপটি আকারে খুব বড়ো না হলে একটি বাজপাখি আবার সেই সাপটিকে খেয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশিকলটিকে নিচের মতো করে লেখা যাবে :

ঘাস	→	ফড়িং	→	ইঁদুর	→	সাপ	→	বাজপাখি
(উৎপাদক)		(প্রথম স্তরের খাদক)		(দ্বিতীয় স্তরের খাদক)		(তৃতীয় স্তরের খাদক)		(সর্বোচ্চ স্তরের খাদক)

এখানে উল্লেখ্য যে, বাজপাখির মৃত্যুর পর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র জীব বা অণুজীব বাজপাখির মৃতদেহ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে দেহটি বিয়োজিত হয়ে মাটি বা পানির সঙ্গে মিশে যায়। যেটি আবার ঘাস বা অন্য উদ্ভিদ তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে চক্রটি পূর্ণ করে।

বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশিকল হতে পারে। যেমন- শিকারজীবী খাদ্যশিকল, পরজীবী খাদ্যশিকল এবং মৃতজীবী খাদ্যশিকল।

(a) শিকারজীবী খাদ্যশিকল (Predator food chain) : যে খাদ্যশিকলে প্রথম স্তরের খাদক আকারে সবচেয়ে ছোটো থাকে এবং পর্যায়ক্রমে উপরের খাদকেরা নিচের স্তরের খাদকগুলো শিকার করে খায় সেরূপ শিকলকে বলা হয় শিকারজীবী খাদ্যশিকল। উপরে বর্ণিত খাদ্যশিকলটি একটি শিকারজীবী খাদ্যশিকল।

(b) পরজীবী খাদ্যশিকল (Parasitic food chain) : পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের চেয়ে বড়ো আকারের পোষকদেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে খাদ্যশিকলের প্রথম ধাপে সব সময় সবুজ উদ্ভিদ নাও থাকতে পারে।

মানুষ → মশা → ডেঙ্গু ভাইরাস।

(c) মৃতজীবী খাদ্যশিকল (Saprophytic food chain) : এই ধরনের খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যের পুষ্টি জীবের মৃত বা পচে যাওয়া দেহাবশেষ থেকে বিভিন্ন জীবাণুর দিকে স্থানান্তরিত হয়, কাজেই মূলত মৃতজীবী এবং বিয়োজকের মধ্যে এই ধরনের খাদ্যশিকল আবদ্ধ থাকে। যেমন-

মৃত উদ্ভিদ → ছত্রাক → ব্যাকটেরিয়া

পরজীবী এবং মৃতজীবী খাদ্যশিকলে কোনো উৎপাদক নেই বলে এই খাদ্যশিকলগুলো অসম্পূর্ণ এবং তাদের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য শিকারজীবী খাদ্যশিকলের প্রথম এক বা একাধিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের সকল খাদ্যশিকল প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

১২.৪.২ খাদ্যজাল (Food web)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশিকলে একই খাদক বিভিন্ন স্তরে স্থান পেতে পারে। তখন কয়েকটি খাদ্যশিকল একত্রিত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে, একে খাদ্যজাল বলে (চিত্র ১২.১১)। স্থলজ ও জলজ উভয় পরিবেশের জন্য এই ঘটনা ঘটে থাকে। পাশের ছবি থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

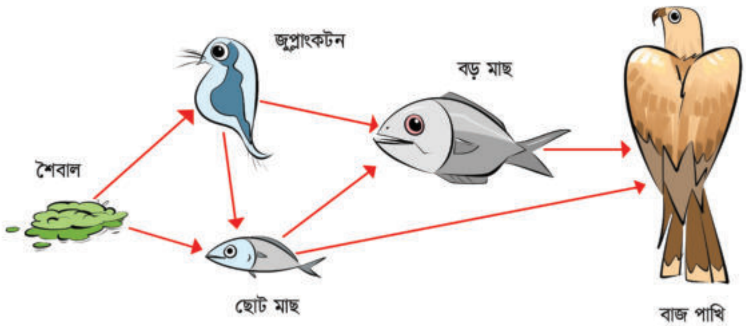

চিত্র ১২.১১ : খাদ্যজাল

উপরের চিত্রে দেখা যায় উৎপাদক শৈবাল জুপ্ল্যাংকটন এবং ছোটো মাছকে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করে। জুপ্ল্যাংকটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ছোটো এবং বড়োমাছ উভয়ই। বড়োমাছ আবার ছোটোমাছকে খায়। বাজপাখি ছোটো মাছ এবং বড়ো মাছটি খুব বেশি বড়ো না হলে সেটিকে সহজেই খেতে পারে। এখানে স্থলজ ও জলজ জীবের পাঁচটি খাদ্য শিকল তৈরি হয়েছে। এভাবে যে খাদ্যজাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে এর চেয়েও অনেক বেশি জটিল খাদ্যজাল তৈরি হতে পারে।

উপরের খাদ্যজালের মোট পাঁচটি খাদ্যশিকল এরকম:

(a) শৈবাল → ছোটো মাছ → বাজপাখি।

(b) শৈবাল → জুপ্ল্যাংকটন → বড়ো মাছ → বাজপাখি।

(c) শৈবাল → ছোটো মাছ → বড়ো মাছ → বাজপাখি।

(d) শৈবাল → জুপ্ল্যাংকটন → ছোটো মাছ → বড়ো মাছ → বাজপাখি।

(e) শৈবাল → জুপ্ল্যাংকটন → ছোটো মাছ → বাজপাখি।

বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যজাল কেমন হতে পারে সেটি ১২.১২ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

১২.৪.৩ বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিপ্রবাহ (Nutrient flow in ecosystem) :

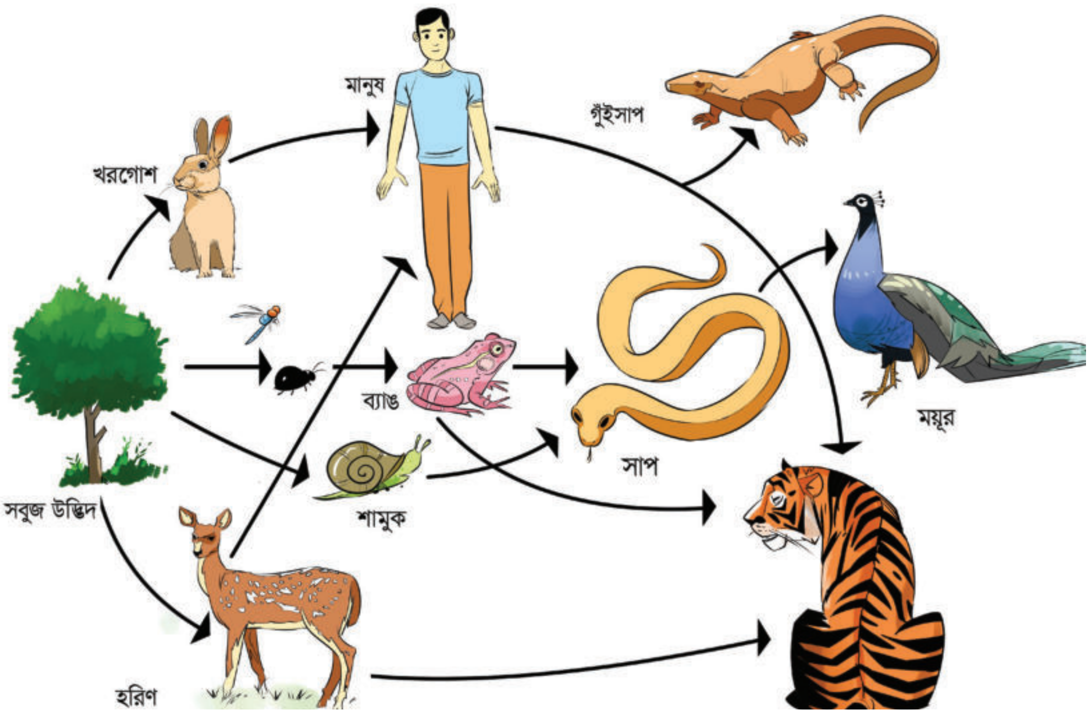

চিত্র ১২.১২ : বনভূমির একটি খাদ্যজাল

খাদ্যশিকল দিয়ে আমরা বিভিন্ন জীবের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণের ধাপগুলো সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা চাইলে পুষ্টির প্রবাহ হিসেবেও দেখতে পারি। যেমন- উদ্ভিদ অজৈব বস্তু গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ দেহেই জমা থাকে। তৃণভোজী প্রাণী এসব উদ্ভিদ খায় এবং পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণী এসব তৃণভোজী খায়। এসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মৃত্যুর পর বিয়োজকগুলো এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এসব অজৈব বস্তু গ্রহণ করে এবং পুনরায় খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করে থাকে। পুষ্টিদ্রব্যের এরূপ চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পুষ্টিপ্রবাহ বলে। খাদ্যশিকলের মাধ্যমে এরূপ পুষ্টির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem) :

যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো এবং তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তার বড়োজোড় 2% সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে। প্রথমে বাস্তুতন্ত্রের প্রথম

স্তরের খাদক তৃণভোজী প্রাণীদের সবুজ উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীজ বা মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এভাবে তৃণভোজী প্রাণীতে পৌঁছায়। মাংসাশী প্রাণী, যারা প্রথম স্তরের খাদকদের (তৃণভোজী প্রাণীদের) খেয়ে বাঁচে তারাই দ্বিতীয় স্তরের খাদক। প্রথম স্তরের খাদক থেকে এভাবে রাসায়নিক শক্তি দ্বিতীয় স্তরের খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে রাসায়নিক শক্তি খাদ্য আকারে তৃতীয় স্তরের খাদকে পৌঁছায়। যদি তৃতীয় স্তরের খাদককে আরও উচ্চতর কোনো খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তবে একই প্রক্রিয়ায় শক্তি সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে পৌঁছায়। খাদ্যশক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরে স্থানান্তরিত হওয়াকে খাদ্যশিকল (Food Chain) বলে। একটি খাদ্যচক্রে সাধারণত 4-5টি ধাপ বা পর্যায় থাকে।

খাদ্যচক্রের প্রতিটি ধাপকে খাদ্যস্তর (trophic level) বলে। এক ট্রফিক লেভেল থেকে পরবর্তী ট্রাফিক লেভেল বা খাদ্যস্তরে শক্তি স্থানান্তরের সময় বিপুল পরিমাণ শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তী খাদ্যস্তরে ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। তাই খাদ্যচক্র যত ছোটো হয়, তত বেশি পরিমাণ শক্তি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি ট্রফিক লেভেলে যতটুকু শক্তি থাকে তার মাত্র 10% ঠিক উপরের ট্রফিক লেভেলে সঞ্চারিত হতে পারে। বাকি 90% তাপ হিসেবে পরিবেশে বিমুক্ত হয় কিংবা আংশিকভাবে অব্যবহৃত থেকে যায়।

মৃত্যুর পর সব জীবের তার শক্তি গ্রহণ প্রক্রিয়া থেমে যায়। তখন ঐ মৃতদেহে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি বিয়োজকের কাজের ফলে ভেঙে জড় পদার্থ বা শক্তি আকারে আবার পরিবেশে ফিরে আসে। পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যে জমা হওয়া এই শক্তি তখন আবার উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়। আর এভাবে খাদ্যচক্রের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে।

১২.৪.৪ শক্তি পিরামিডের ধারণা :

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে বাস্তুতন্ত্রে একটি খাদ্যস্তর থেকে অপর খাদ্যস্তরে মাত্র 10% শক্তি স্থানান্তরিত হয়, বাকি শক্তি তাপশক্তি হিসেবে পরিবেশ ফিরে যায় কাজেই পরবর্তী খাদ্যস্তরে মোট শক্তির পরিমাণ কমে যায়। এই কারণে নিম্ন খাদ্যস্তর থেকে উচ্চ খাদ্যস্তর পর্যন্ত জীবের স্থানান্তরিত শক্তিকে পরপর সাজালে যে ক্রমহ্রাসমান আকৃতির চিত্র পাওয়া যায় তাকে খাদ্য পিরামিড বা শক্তি পিরামিড বলে (চিত্র ১২.১৩)।

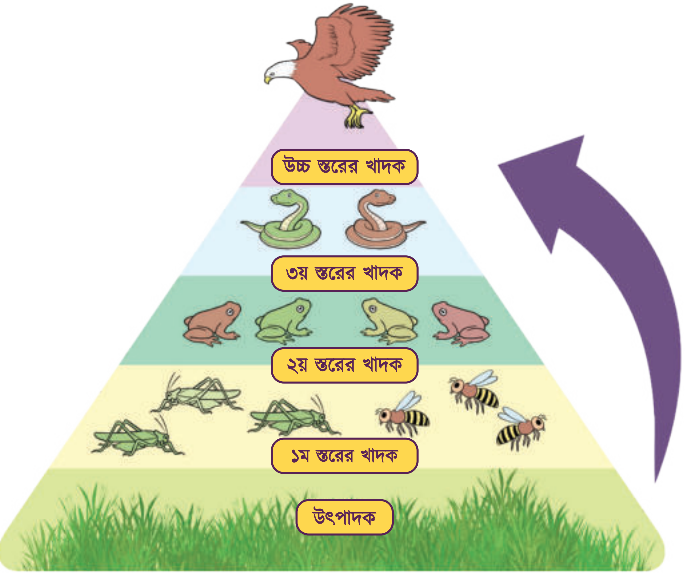

চিত্র ১২.১৩ : শক্তির পিরামিড

শক্তির এই প্রবাহ সব সময়েই একমুখী। এ শক্তিপ্রবাহকে কখনো বিপরীতমুখী করা যায় না। প্রতিটি ধাপে প্রায় 90% ভাগ শক্তি কমে যায় বা ব্যবহারযোগ্যতা হারায়। শক্তির এ ক্রমবর্ধমান ক্ষয় খাদ্যশিকলের আকারকে 4 বা 5টি ধাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। খাদ্যশিকল যত দীর্ঘ হবে ঊর্ধ্বতম ট্রফিক লেভেলে শক্তির পরিমাণ ততই কমতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এসে আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

খাদ্য পিরামিডের বেলায় শুধু স্থানান্তরিত শক্তি নয়, জীবের সংখ্যা কিংবা জীব-ভরকেও পিরামিড আকারে সাজানো যায় এবং সেগুলো বাস্তুতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে।

১২.৫ পানিচক্র

পানি চক্র (চিত্র ১২.১৪) বলতে বায়ুমণ্ডলে, ভূপৃষ্ঠে, এবং ভূপৃষ্ঠের নিচে ভূগর্ভস্থ পানির পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে বোঝানো হয়। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের পিছনে পানির অনেক বড়ো একটা ভূমিকা রয়েছে এবং পৃথিবীর এই পানি-চক্র সেই প্রাণের বিকাশ, বিবর্তন ও অভিযোজনের কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে। তোমরা সবাই জান পানি কঠিন, তরল এবং গ্যাস এই তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে এবং শক্তির বিনিময়ের মাধ্যমে পানি তার অবস্থার পরিবর্তন করে। শুধু তাই নয় পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পানি হওয়ার কারণে এটি বিপুল পরিমাণ তাপশক্তির আধার হিসেবে কাজ করে। কাজেই পানির সঙ্গে শক্তির আদানপ্রদানের মাধ্যমে চলমান পানির চক্র পৃথিবীর স্থিতিশীলতার পিছনে অনেক বড়ো একটি ভূমিকা রাখে।

তোমরা জানো পানিচক্রে পানি তার কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার পরিবর্তন করে, কিন্তু এই পরিবর্তন হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন তাই পানির মোট পরিমাণ বা অণুর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। পানিচক্রে পানিকে তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাষ্পীভবন, গলন, ঘনীভবন ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) এবং অবক্ষেপ (Deposition) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পানিচক্রের বিভিন্ন ধাপ কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয় নিচে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প

বাষ্পীভবন : সূর্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস এবং এই সূর্য পৃথিবীপৃষ্ঠের পানির বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠের তরল পানি সূর্যের আলো থেকে তাপ শক্তি গ্রহণ করে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) : বরফ কিংবা তুষার সাধারণত গলে পানিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু যদি বাতাসের চাপ কম থাকে এবং বাতাস শুষ্ক থাকে তাহলে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় বরফ কিংবা তুষার সরাসরি বাষ্পে পরিণত হতে পারে। শক্তি ব্যয়ের বিবেচনা করলে এটি কম শক্তি খরচ করে ঘটানো সম্ভব তাই পর্বত চূড়ার বরফে, কিংবা মেরু অঞ্চলে বরফ থেকে এই প্রক্রিয়ায় বরফ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে থাকে।

প্রস্বেদন : বাষ্পীভবন ও ঊর্ধ্বপাতন এই দুটি প্রক্রিয়া ছাড়াও উদ্ভিদ তার পাতার মাধ্যমে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প নির্গমন করে থাকে।

ভূপৃষ্ঠে পানি

ঘনীভবন : বাতাসের জলীয় বাষ্প উপরে উঠে শীতল হয়ে ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র জলকণায় এবং বরফ কণায় পরিণত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত একত্রিত হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়, যেগুলো আকাশে ঘুরে বেড়ায়।

বৃষ্টিপাত : ক্ষুদ্র জলকণা একত্র হয়ে এক সময় বড়ো পানির ফোটায় রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির পানি হিসেবে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। তবে বৃষ্টির ফোঁটা হিসেব তৈরির জন্য সেটিকে কোনো ধরনের ধূলিকণা বা অন্য কোনো কণার উপরে জমা হতে হয়। তাপমাত্রা বেশি কমে গেলে জলকণাগুলো বরফের কণায় রূপান্তরিত হয়ে তুষার কিংবা শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে।

পানির প্রবাহ : বৃষ্টির পানির যে অংশ মাটি চুঁইয়ে ভূগহ্বরে ঢুকে না যায় সেটি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীনালা হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে এসে জমা হয়। কোনো কোনো স্থানে বাতাস কিছু জলীয়বাষ্পকে মেঘ হিসেবে বহন করে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। মেঘ ঠান্ডা হয়ে সেখানে তুষারের সৃষ্টি করে। মেরু অঞ্চল বা পর্বতশৃঙ্গে যদি ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় পানি বাষ্পীভূত হওয়ার হার থেকে তুষার গঠনের হার বেশি হয় তাহলে

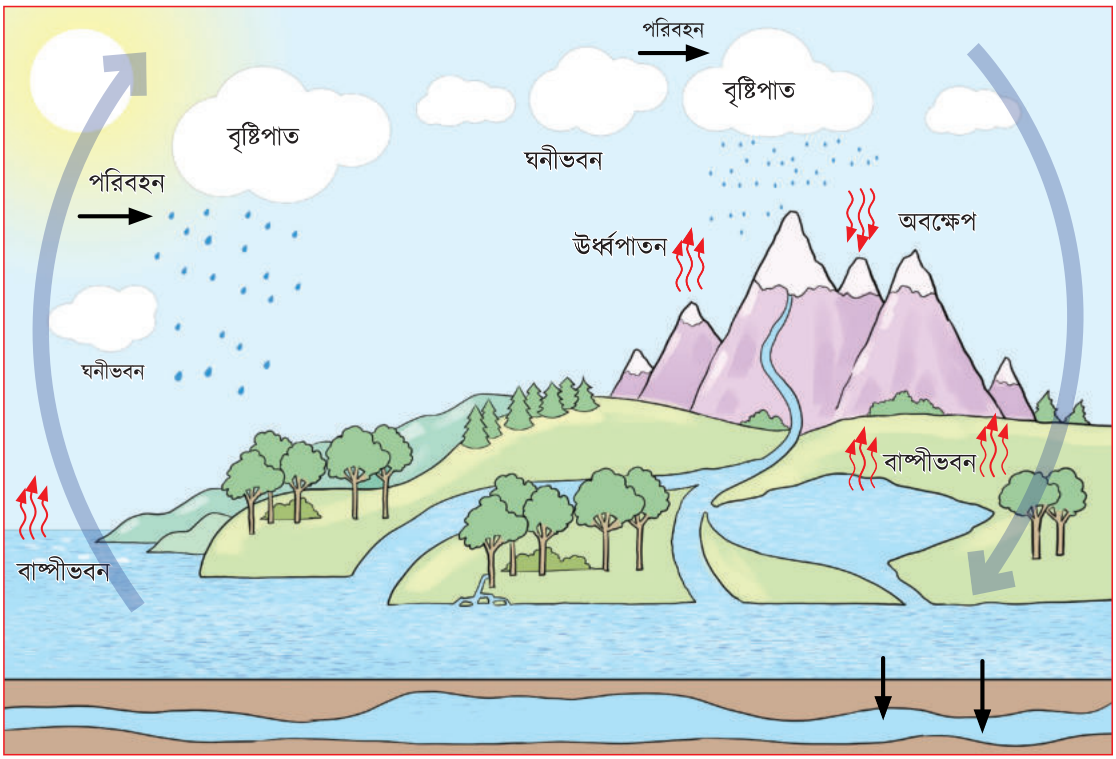

চিত্র ১২.১৪ : পানি চক্র

বরফের চূড়া গঠিত হয়। গরমকালে সূর্যের তাপে তুষার গলে পানিতে পরিণত হয় এবং সেই পানি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসতে থাকে। এভাবে পাহাড়ের ঢালে ছোটো ছোটো নদীর সৃষ্টি হয়। এসব ছোটো ছোটো নদী আবার সমতলভূমিতে পতিত হয়ে বড়ো নদীর সৃষ্টি করে। সবশেষে সেই পানি গিয়ে সাগরে পতিত হয়।

ভূগর্ভে পানি

অনুপ্রবেশ (Infiltration) : যে প্রক্রিয়ায় বৃষ্টির পানি মাটি চুইয়ে ভূগর্ভে ঢুকে যায় তাকে অনুপ্রবেশ বলে। ভূগর্ভে কতটুকু জমা হবে সেটি নির্ভর করে পানি কত গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এবং সেখানে মাটির স্তর কীরকম তার উপর। পাথর কম পানি ধরে রাখতে পারে, সে তুলনায় মাটি বেশি পানি ধরে রাখতে পারে। ভূপৃষ্ঠে অনুপ্রবেশ করা পানি মাটির নিচে গিয়ে একুয়িফায়ার গঠন করতে পারে।

অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারছ ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয় বাষ্প, সেই জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি এবং তুষার এবং সেই বৃষ্টি এবং তুষার গলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সর্বশেষ সাগরে পতিত হয়। এভাবে পানি চক্র আবর্তিত হয়। এখানে পানিচক্রের যে ধাপগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর সুনির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। এগুলোর জন্য কোনো সময়ও বেধে দেওয়া যায় না কারণ এই পানিচক্র অবিরত ঘটে চলছে।

পানিচক্রের গুরুত্ব

পানিচক্রের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ুর উপরেও পানিচক্রের অনেক বড়ো একটি প্রভাব রয়েছে উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, পানি বাষ্পীভূত হওয়ার সময় পরিবেশকে শীতল করে না রাখলে গ্রিন হাউস প্রক্রিয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠত। এছাড়াও পানিচক্র বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় বৃষ্টির ফোঁটা গঠনের জন্য পানির ক্ষুদ্র কণাগুলো ধূলিকণার উপর জমা হয় এবং সেটিকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে পৃথিবীর মাটির উপর নামিয়ে আনে। শুধু তাই নয় বাতাসে ভাসমান অপদ্রব্যকে, এমনকি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকেও বৃষ্টির পানি অপসারণ করে ফেলে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে।

১২.৬ অক্সিজেন চক্র

আমরা সবাই জানি বাতাসের 78% ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং 21% হচ্ছে অক্সিজেন। অন্য সব গ্যাস মিলিয়ে হচ্ছে বাকি 1%। পৃথিবীতে সবসময় কিন্তু বাতাসে এই পরিমাণ অক্সিজেন ছিল না। প্রায় 4.6 বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে সায়ানোব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষণ করে অক্সিজেন তৈরি করা শুরু করে এবং প্রায় 300 মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। পৃথিবীর বেশিরভাগ জীব এই অক্সিজেন শ্বসন করে জীবন ধারণ করে, অর্থাৎ বলা যায় অক্সিজেন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে একটি মূল ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেন চক্রটি (চিত্র ১২.১৫) একটি জৈব রাসায়নিক চক্র এবং এই চক্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকে। এই চক্রটি শুধু বায়ুমণ্ডল নয়, পৃথিবীর জীবমণ্ডল ও পৃথিবী পৃষ্ঠের লিথোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে

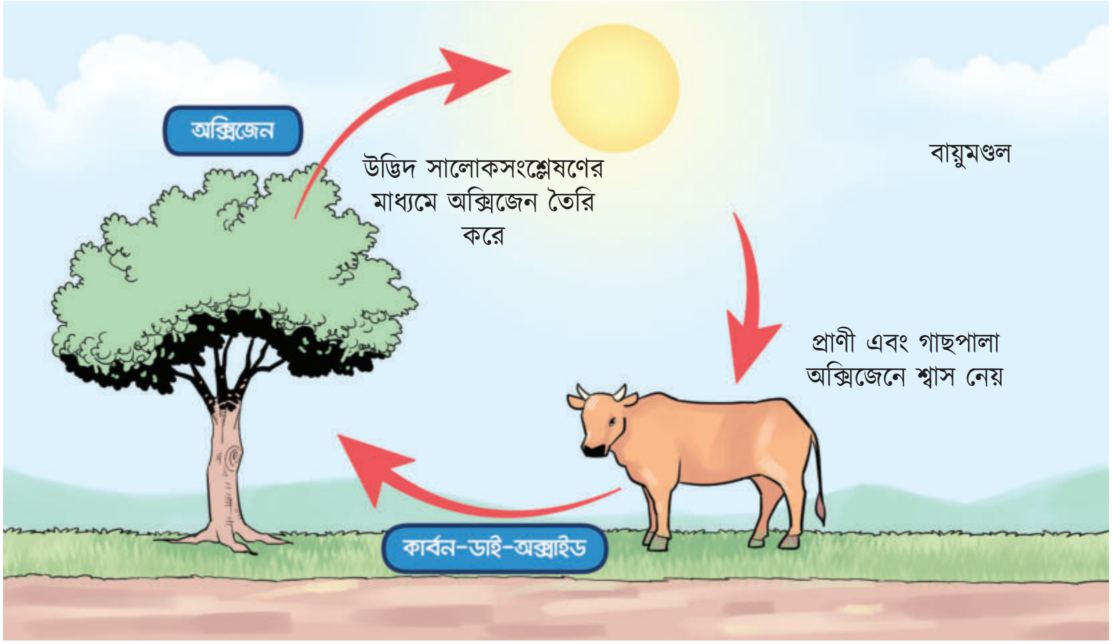

চিত্র ১২.১৫ : অক্সিজেন চক্র

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অক্সিজেন রয়েছে লিথোস্ফিয়ারে।

অক্সিজেন চক্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধাপে পৃথিবীর সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং নিজেদের জন্য খাদ্য তৈরি করে উপজাত দ্রব্য হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে। দ্বিতীয় ধাপে সকল শ্বসনকারী জীব তাদের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে। তৃতীয় ধাপে সকল জীব নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, যেটি আবার উদ্ভিদের কাছে সালোকসংশ্লেষণের জন্য ফেরত যায়। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ স্থিতিশীল থাকে। এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রায় সমপরিমাণ অক্সিজেন বের হয়। এছাড়াও পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার থেকেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে আদান প্রদান হয়ে থাকে।

অক্সিজেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই গ্যাসটি নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহার করা হয়।

অক্সিজেন চক্রের গুরুত্ব:

১। জীব শ্বসনের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্যের দহনের মাধ্যমে নিজের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে।

২। রান্নার কাজে, গাড়িতে, শিল্পকারখানায় এবং আরও অনেক কিছুতেই শক্তি সৃষ্টি করার জন্য জ্বালানি দহন করা হয়, এইসব দহন কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়।

৩। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে জলজ প্রাণীরা জীবন ধারণ করে থাকে।

৪। জৈব বর্জ্য পদার্থের পচন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।

১২.৭ নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন চক্র (চিত্র ১২.১৬) পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নাইট্রোজেন জীবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এটি বিপুল পরিমাণে থাকলেও কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। নাইট্রোজেন চক্র এমন একটি জৈবভূরাসায়নিক প্রক্রিয়া যেটি প্রায় নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাসকে জীবের ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তরিত করে তুলে। এই চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে আসে এবং চক্র শেষে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। নাইট্রোজেন চক্রের কয়েকটি সক্রিয় প্রক্রিয়া নিচে আলোচনা করা হলো।

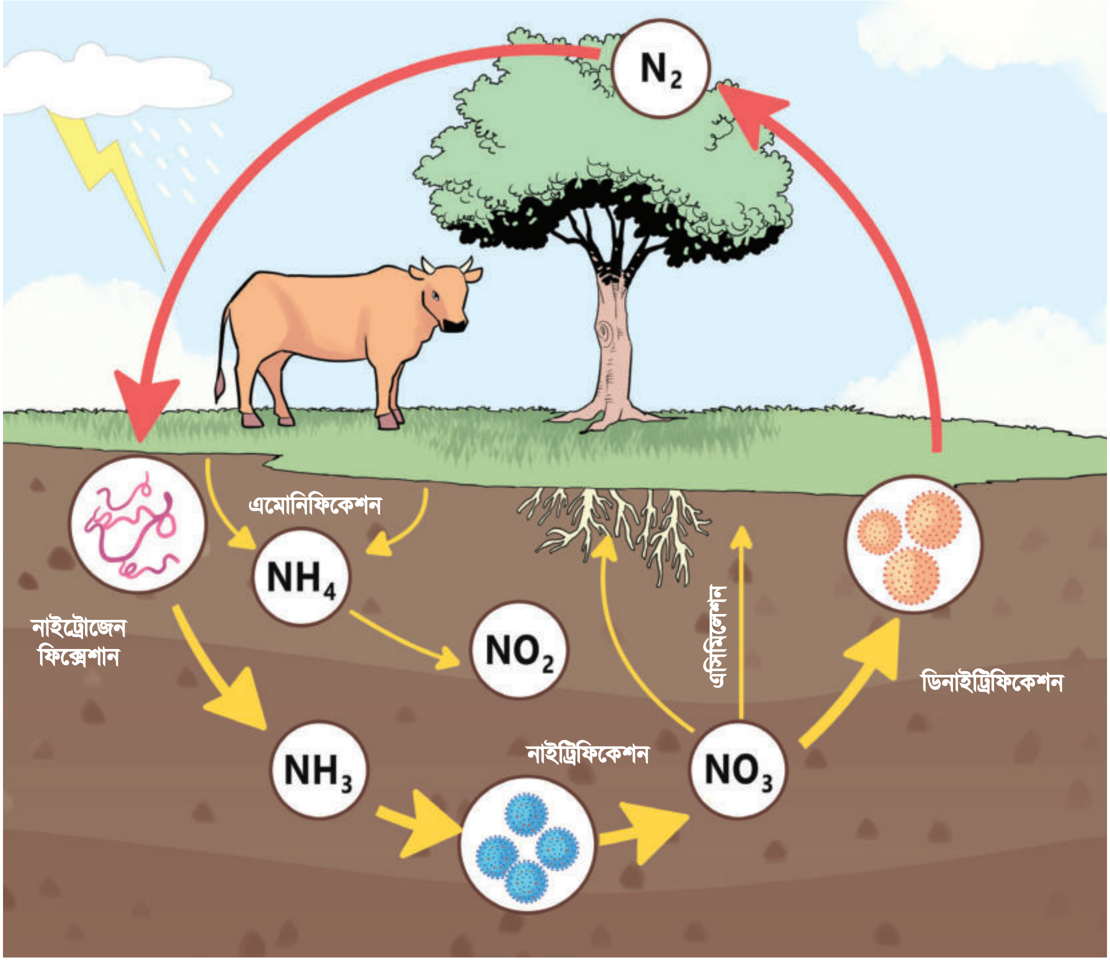

চিত্র ১২.১৬ : নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন ফিক্সেশান (Fixation) : নাইট্রোজেন চক্র শুরু হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশান দিয়ে যেখানে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মাটিতেই থাকে এবং এটি হচ্ছে উদ্ভিদের সঙ্গে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর একধরনের সিম্বিওটিক সম্পর্ক।

নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) : এই প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া প্রথমে নাইট্রাইট পরে নাইট্রেট আয়নে রূপান্তরিত হয়। একবার নাইট্রেটে পরিণত হলে উদ্ভিদ খুব সহজে সেটি পুষ্টির অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

এসিমিলেশন (Assimilation) : এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে নাইট্রেট গ্রহণ করে সেগুলো ব্যবহার করে নাইট্রোজেন গঠিত অ্যামিনো অ্যাসিড ও অন্যান্য অণু গঠন করে যেগুলো হচ্ছে ডিএনএ এবং প্রোটিন তৈরি করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাণী তাদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকে।

এমোনিফিকেশন (Ammonification) : যখন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে তখন ব্যাকটেরিয়া এবং ফানজাই তাদের দেহাবশেষ পচিয়ে আবার অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে দেয়। নাইট্রোজেন ফিক্সেশানে প্রস্তুত অ্যামোনিয়া যেভাবে নাইট্রেটে পরিণত হয়, ঠিক একইভাবে অ্যামোনোফিকেশানে প্রস্তুত অ্যামোনিয়াও নাইট্রেটে পরিণত হয়।

ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrification) : অক্সিজেনের ঘাটতি আছে এরকম এলাকায় এই প্রক্রিয়ায় ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে ভেঙে আবার নাইট্রোজেনে পরিণত করে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে মাটিতে নাইট্রেটের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে সেটি একধরনের পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করেছে। কাজেই নাইট্রোজেন চক্রটির সঠিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের জন্য একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব :

১। এই চক্র উদ্ভিদকে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জৈব অণু ক্লোরোফিল তৈরি করার ব্যাপারে সহায়তা করে।

২। এমোনিফিকেশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়া এবং ফানজাই মৃত জীবের দেহাবশেষকে পচিয়ে পরোক্ষভাবে পরিবেশ পরিষ্কার করে রাখে।

৩। নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট তৈরি করে ভূমিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করার দায়িত্ব পালন করে।

৪। নাইট্রোজেন জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, নাইট্রোজেন চক্র জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ জৈব অণুগুলো তৈরি করার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

১২.৮ বিভিন্ন পরিবেশে জীবের অভিযোজন

প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য জীবকে তার বাসভূমির পরিবেশে অভ্যস্ত হতে হয়, সে কারণে বৈরী পরিবেশেও আমরা জীবকে টিকে থাকতে দেখি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- তাপমাত্রার পার্থক্য, খাদ্যের অপ্রতুলতা, শিকারি প্রাণীর বিচরণ, তারপরেও দীর্ঘ বিবর্তনে সেই পরিবেশেও বেঁচে থাকার মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাণী অভিযোজিত হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও জীবসম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতের যে বড়ো পরিবর্তন হয় না তার পিছনে রয়েছে জীবের অভিযোজন ক্ষমতা। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বংশানুক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকার উপযোগী প্রজাতিটির মাঝে আমরা সেই পরিবেশের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের পরিবর্তন দেখে থাকি। এর ফলে জীবটির অস্তিত্ব বংশানুক্রমিকভাবে সেই পরিবেশে টিকে থাকে। নিচের বিভিন্ন পরিবেশের উদাহরণগুলো থকে তোমরা এই অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্ট ধারণা পাবে (চিত্র ১২.১৭)।

চিত্র ১২.১৭ : বিশেষ পরিবেশে অভিযোজিত প্রাণীর উদাহরণ। (ক) মরু অঞ্চলের উট (খ) সমুদ্রের ডলফিন (গ) পাহাড়ি ছাগল

মরুভূমি : মরু অঞ্চলের প্রাণী অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়। যেমন- তাদের দেহে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকে, দেহ থেকে পানির নির্গমন কমানোর জন্য এদের ত্বক অনেক পুরু হয়, ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যাও অনেক কম হয়, শরীরের উপর মোমজাতীয় পানি-অপ্রতিরোধ্য প্রলেপ থাকে। শুধু তাই নয় এই প্রাণীদের আচরণেও ভিন্নতা দেখা যায়, যেমন- দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়ে এগুলো উন্মুক্ত স্থানে আসে না। উট এরকম প্রাণীর একটি উদাহরণ। তারা তাদের কুঁজে অনেক পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে, তাদের নাক এমনভাবে গঠিত যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে পানি হারিয়ে না যায়। শুধু তাই নয় উট অনেক উঁচু তাপমাত্রাও সহ্য করতে পারে।

ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট : সমুদ্র উপকূলে যেখানে মিঠাপানি এবং লোনাপানি সংযুক্ত হয়, সেখানকার উদ্ভিদগুলোতে লবণাক্ত পানি এবং লবণাক্ত মাটিতে টিকে থাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জোয়ার ও ভাটার পানির উচ্চতার তারতম্যে এরা খাপ খইয়ে নেয় এবং পানির নিচে থাকার পরও শ্বসনের জন্য মাটি ফুঁড়ে এখানকার কিছু কিছু উদ্ভিদের শ্বাসমূল বের হয়ে আসে। সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এক ধরনের বিশেষ শ্বাসমূল তৈরি করে। আবার আলোক-উদ্দীপনা গাছগুলোকে আলোর দিকে পরিচালিত করে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ বাড়ায়।

সামুদ্রিক পরিবেশ: সামুদ্রিক জীবের প্রধান প্রতিবন্ধকতা লবণাক্ততা, পানির চাপ এবং দেহে পানির সাম্যতা বজায় রাখা। সে কারণে তাদের দেহ সাঁতার কাটার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে, এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য তাদের বিশেষ শ্বসন ব্যবস্থা থাকতে হয়। ডলফিন এই পরিবেশের উদাহরণ, এদের শরীর সাঁতারের উপযোগীভাবে গঠিত। তাদের সাঁতার দেওয়ার জন্য পাখনা (fin), গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফ্লিপার থাকে। পানির পৃষ্ঠে শ্বাস নেওয়ার জন্য ডলফিনের ব্লো-হোল রয়েছে।

মেরু অঞ্চল: মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের চরম শীতল তাপমাত্রা, খাদ্যের অপ্রতুলতা এবং দীর্ঘ সময় সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে থাকার জন্য অভিযোজন করতে হয়। তাই সাধারণত এই এখানকার প্রাণীদের ঘন লোম, তাপনিরোধক চর্বির স্তর, এবং দীর্ঘ শীতনিদ্রায় অভ্যস্ত হতে হয়। শ্বেতভালুক এদের উদাহরণ। তাদের ঘন লোম এবং পুরু চর্বির স্তর রয়েছে। তাদের ছোটো ছোটো কান এবং ছোটো লেজের কারণে কম তাপ হারিয়ে থাকে।

গুহাজীবী প্রাণী: এই প্রাণীদের অন্ধকার পরিবেশে থাকায় অভ্যস্ত হতে হয়। দৃষ্টি ব্যবহার করতে পারে না বলে এদের স্পর্শানুভূতি এবং গন্ধের অনুভূতি অনেক তীব্র হয়ে থাকে। সূর্যালোকের অভাবে এদের গায়ের রং হাল্কা হয়ে থাকে। দৃষ্টিহীন গুহার মাছ এদের উদাহরণ। অন্ধকারে থাকতে থাকতে এদের চোখের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে কিন্তু অন্ধকারে খাবার অনুসন্ধান করার জন্য গন্ধ ও স্পর্শানুভূতি অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চল: উঁচু স্থানের প্রাণীদের কম অক্সিজেনে অভ্যস্ত হতে হয়। তাদের ফুসফুসের আকার সাধারণত বড়ো হয় এবং অক্সিজেন সরবরাহের জন্য শ্বসনতন্ত্র অনেক বেশি দক্ষ। এই প্রাণীদের মেটাবোলিজম ধীরগতির হয়ে থাকে। হিমালয়ের টার (tahr) পাহাড়ি ছাগল -এর উদাহরণ, শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের ঘন লোম হয়, এবং এগুলোর পায়ের খুর পাথুড়ে এলাকা আঁকড়ে ধরার উপযোগী হয়ে অভিযোজিত হয়েছে।

মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ: মানুষের সৃষ্ট পরিবেশেও পশুপাখি অভিযোজিত হয়। শহুরে এলাকার প্রাণী রাত্রিজীবী হয়ে যায়, সেগুলো দালানকোঠা বা কংক্রিটের স্থাপনায় আস্তানা গড়ে তুলে, শুধু তাই নয় এগুলো মানুষের পরিত্যক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ইঁদুর -এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারা দালানকোঠার ফাঁকফোকরে বসবাস করে এবং মানুষের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে।

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় যে প্রাণীগুলো বেশি অভ্যস্ত হবে সেগুলোই সফলভাবে টিকে থাকবে এবং বংশধরদের মাঝে এই অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে। এভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে প্রাণীকুল নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং এভাবে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা হয়ে থাকে।

অধ্যায় ১৩

পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অধ্যায় ১৩ পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবীর বয়স
- ☑ ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা (Geologic Time Scale)
- ☑ জীবাশ্ম : সংজ্ঞা, ধরন, গুরুত্ব
- ☑ সময়প্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর পরিবর্তন
- ☑ পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্তন
- ☑ বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন
- ☑ ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর জীবজগৎতে পরিবর্তন

পৃথিবী—আমাদের গ্রহ, মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে সেটি এক কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা যখন রাতের আকাশের দিকে তাকাই, এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানটি নিয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। এই মহাবিশ্বের বয়সও পৃথিবীতে মানব প্রজন্মের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। এই অধ্যায়ে, আমরা আমাদের পৃথিবীর বয়স, তার গঠন প্রক্রিয়া এবং প্রাণের উন্মেষ নিয়ে আলোচনা করব। পৃথিবীর উৎপত্তি, পৃথিবীর ভূত্বক, মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল এবং জীবজগতের সৃষ্টির সময়কাল এবং জানার প্রক্রিয়া বোঝার মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের গ্রহের প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

১৩.১ মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবীর বয়স

মহাবিশ্ব এখনো তার বিশালতা এবং বয়সের কারণে মানুষের সাধারণ বোধগম্যতার বাইরে একটি ক্ষেত্র। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যমতে মহাবিশ্ব আনুমানিক 13.8 বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং (Big Bang) নামে একটি ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে। তার তুলনায় পৃথিবী অপেক্ষাকৃত নতুন একটি মহাজাগতিক বস্তু, যেটি প্রায় 4.6 বিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল এবং ভূত্বক গঠিত হয়েছে প্রায় 400 কোটি বা 4 বিলিয়ন বছরের কিছু আগে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পাথর এবং খনিজগুলোর আইসোটোপের ক্ষয়ের হার (আইসোটোপ ডেটিং) পরীক্ষা করে আমাদের গ্রহের বয়স বের করে একটি টাইমলাইন বা সময়সীমা তৈরি করেছেন। যদিও মহাবিশ্বের বয়সের তুলনায় পৃথিবীর বয়স কম, তবুও তাদের বয়সের পার্থক্য পৃথিবীর অস্তিত্বকে আরও উল্লেখযোগ্য করে তোলে। আমাদের গ্রহের গঠনের রহস্য জানার জন্য এবং যেসব কারণে

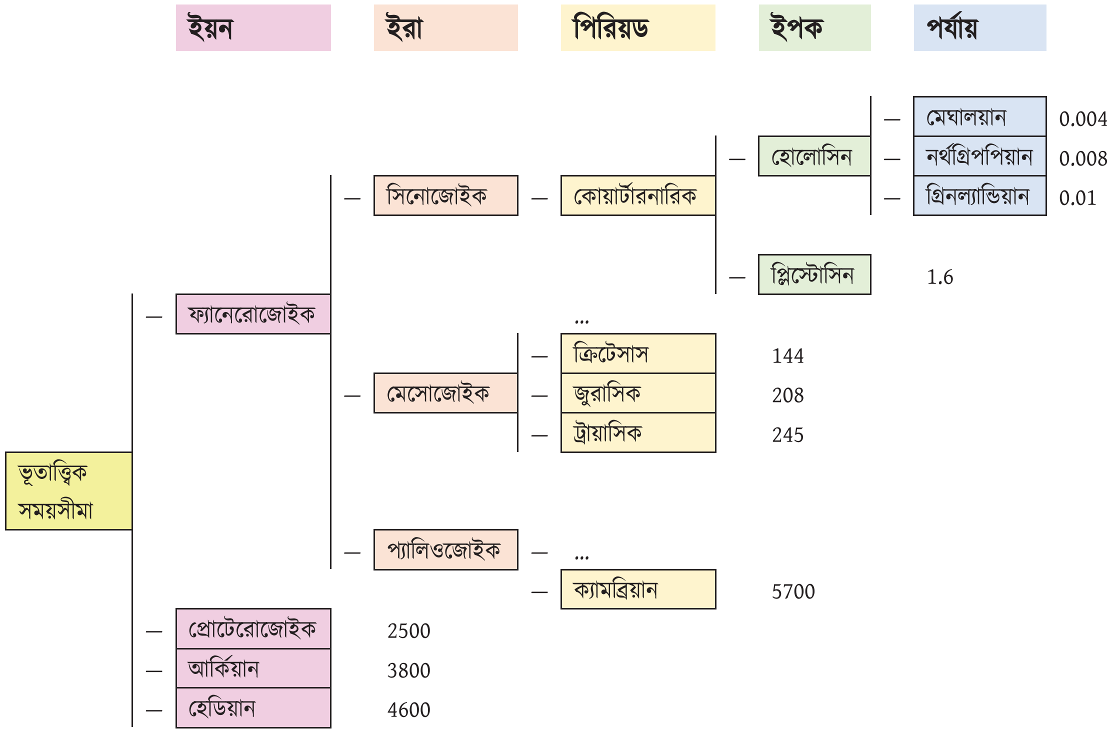

চিত্র ১৩.১ : ভূতাত্ত্বিক সময় সীমার বিভাজন। বিভাজনের পাশে কত মিলিয়ন বছর আগে এই পর্বটি শুরু হয়েছিল সেটি দেখানো হয়েছে।

পৃথিবী জীবের বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে তা বোঝার জন্য পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের বয়স সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১৩.২ ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা

রসায়ন অধ্যয়নে যেমন- পর্যায় সারণি, ভূগোল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যেরকম মানচিত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেরকম পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণনা করার সময় ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় টুল বা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসকে সময়ের ছোটো এবং বড় বিভিন্ন এককে সাজানো হয় (চিত্র ১৩.১)। আমরা সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা ইত্যাদি একক ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু পৃথিবীর এবং মহাবিশ্বের ইতিহাস এত পুরোনো যে তা মাস বা বছর দিয়ে পরিমাপ করা অত্যন্ত দুরূহ এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া অনেক আগের ঘটনা শনাক্ত করাও সহজ নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ছোটো বড়ো এককে পৃথিবীর ইতিহাসকে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়।

১৩.২.১ ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার একক

ভূতাত্ত্বিক সময়সীমাকে নিচের এককগুলোতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই এককগুলোর মান সুনির্দিষ্ট নয়। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর নির্ভর করে কোনো একক কখনো অনেক বড়ো আবার কখনো তুলনামূলকভাবে ছোটো। এককগুলো এরকম :

কল্প বা ইয়ন (Eon) : এটি সবচেয়ে বড়ো একক। ভূতাত্ত্বিক সময়সীমায় প্রাচীনত্বের হিসেবে যথাক্রমে হেডিয়ান, আর্কিয়ান, প্রোটেরোজোইক এবং ফ্যানেরোজোইক এই চারটি কল্প বা ইয়ন রয়েছে। প্রতিটি ইয়ন কয়েকটি ইরা বা মহাযুগে বিভক্ত। ফ্যানেরোজোইক ইয়ন ছাড়া অন্য তিনটি ইয়নকে অনেক সময় প্রাক-ক্যামব্রিয়ান বলা হয়।

মহাযুগ বা ইরা (Era) : এটি ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার দ্বিতীয় বৃহত্তম একক। যেমন- বর্তমানে চলমান ফ্যানেরোজোইক ইয়নকে তিনটি ইরা বা মহাযুগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচীনতার দিক থেকে সেগুলো হচ্ছে প্যালিওজোইক, মেসোজোইক ও সিনোজোইক। প্রতিটি মহাযুগ আবার অনেকগুলো যুগ বা পিরিয়ডে বিভক্ত।

যুগ বা পিরিয়ড (Period) : মহাযুগের পরের একক হলো যুগ বা পিরিয়ড। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মেসোজোয়িক মহাযুগকে প্রাচীনতার দিক থেকে ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেসাস এই তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি যুগ আলাদা ভূতাত্ত্বিক এবং জৈবিক ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত।

উপযুগ বা ইপক (Epoch) : যুগের পরবর্তী ছোটো একক হলো উপযুগ। যেমন- সর্বশেষ পিরিয়ড কোয়ার্টারনারিকে (quaternary) প্রাচীনতার দিক থেকে হোলোসিন এবং প্লিস্টোসিন এই দুটি উপযুগে বিভক্ত করা হয়।

এছাড়া বিস্তারিতভাবে জানার জন্য প্রতিটি উপযুগ কয়েকটি পর্যায়ে (Stage or Age) বিভক্ত করা হয়েছে; যেমন- সর্বশেষ উপযুগ হোলোসিনকে প্রাচীনতার দিক থেকে গ্রিনল্যান্ডিয়ান (greenlandian), নর্থগ্রিপপিয়ান (Northgrippian) এবং মেঘালয়ান (Meghalayan) এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

এখানে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার বিভিন্ন এককের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সময়সীমার চার্টে উল্লেখযোগ্য এককগুলো তাদের শুরুর সময়সহ সাজানো আছে যা থেকে আমরা সেই এককের মোট সময়কাল বের করতে পারি। লক্ষ করলে দেখা যাবে সকল যুগ, উপযুগ বা অন্যান্য একক সমান সময় পরিব্যাপ্ত করে না। এর কারণ হলো পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বারা এক একক থেকে অন্য একক পৃথক করা হয়। এসব বিশেষ ঘটনার মধ্যে রয়েছে কোনো এক বা একাধিক জীবের আবির্ভাব, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন, বিভিন্ন জীবের গণবিলুপ্তি ইত্যাদি। ছবিতে পৃথিবী সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত পুরো সময়টিকে ঘড়ির বারোঘণ্টা সময় হিসেবে বিবেচনা করে দেখানে হয়েছে (চিত্র ১৩.২)। 4.6 বিলিয়ন বৎসরকে ঘড়ির বারোঘণ্টা হিসেবে ধরে নিলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে মাত্র দুই সেকেন্ড আগে।

ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা বা স্কেল একটি কালানুক্রম যা পৃথিবীর অতীত অধ্যয়ন এবং বোঝার একটি পদ্ধতিগত

উপায়। এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক এবং জৈবিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রধান এককগুলোতে বিভক্ত করে। স্কেলটি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ইয়নের সঙ্গে শুরু হয়, যা পৃথিবীর গঠন থেকে জটিল জীবনের রূপের আবির্ভাব পর্যন্ত বিশাল সময়কে নির্দেশ করে।

প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগের শেষে ফ্যানেরোজোইক ইয়নের শুরু হয়। এই ইয়নে প্যালিওজোয়িক মহাযুগের শুরুতে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীবনের উত্থান ঘটে এবং পর্যায়ক্রমে গাছপালা এবং প্রাণীদের ভূমিতে বিস্তরণ এবং প্রাথমিক উভচর ও সরীসৃপের বিস্তার দ্বারা চিহ্নিত।

মেসোজোয়িক ইরা'কে, প্রায়ই 'ডাইনোসরের মহাযুগ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এ সময় এই আকর্ষণীয় প্রাণীদের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে পাখি এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের উন্মেষ ঘটে।

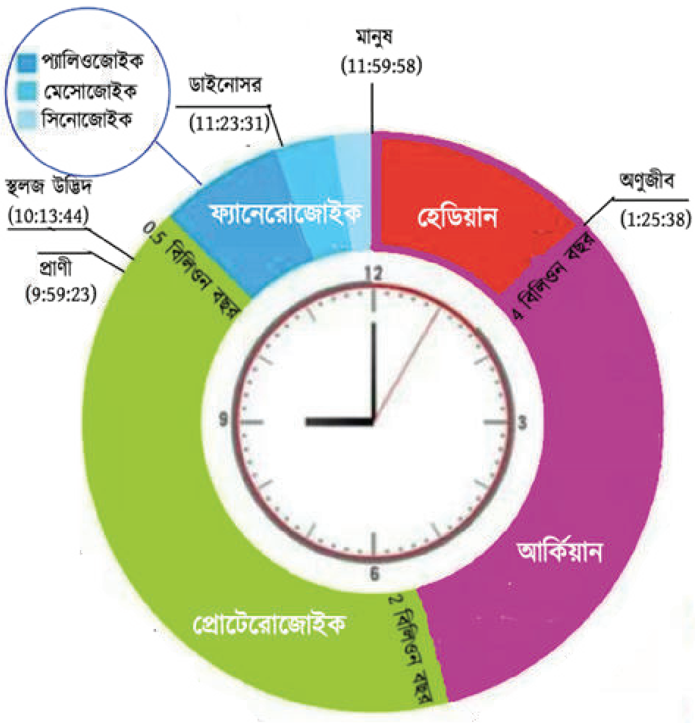

চিত্র ১৩.২ : পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে দুপুর বারোটায় এবং বর্তমান সময়কে রাত বারোটা কল্পনা করে বিভিন্ন ইয়ন এবং কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখানো হয়েছে। এই বারো ঘণ্টার ভিতরে ঠিক কয়টার সময় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি ঘটনার নিচে দেখানো হয়েছে।

অবশেষে সেনোজোয়িক মহাযুগ যা প্রায় 6.5 কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল তা বর্তমান দিন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্থান, মানুষের আবির্ভাব এবং আধুনিক বিশ্বের গঠন দ্বারা এই মহাযুগ বা ইরা'কে চিহ্নিত করা হয়।

১৩.২.২ ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার গঠন ও পরিবর্তন :

ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস সুসংবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করার একটি পদ্ধতি। তবে এর গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে 17 শতাব্দী থেকে। সে সময় ড্যানিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস স্টেনো (Nicolas Steno) একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। তার প্রস্তাবনা অনুসারে পাথরে যে সকল স্তর দেখা যায় তার সবচাইতে উপরের স্তরটি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং ক্রমান্বয়ে যত নিচের দিকে যাওয়া যায় তত সেগুলোর বয়স বেশি হতে থাকবে। পাললিক শিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অবক্ষেপ জমা হয়ে এ সকল স্তর তৈরি হয়। এই প্রস্তাবনাটি উপরিপাত সূত্র (Law of Superposition) নামে পরিচিত। লক্ষ করলে দেখা যাবে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার বিভিন্ন এককগুলো উপরিপাত নীতি অনুসরণ করে সাজানো রয়েছে। এছাড়াও এই সময়সীমা ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ঘটনাগুলো শনাক্ত করা যায়।

অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদ পরবর্তী কালে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার উন্নয়ন ও পরিমার্জন করেন। যেমন- আঠারো ও উনিশ শতকে ইংলিশ ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়াম স্মিথ এবং স্কটিশ ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েলসহ আরও অনেকে পৃথিবী ইতিহাস উন্মোচনের ক্ষেত্রে ফসিল বা জীবাশ্মের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। শিলার বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম অতীতের বিভিন্ন সময়ে প্রাণের অস্তিত্ব ও ধরন নির্দেশ করে। এই ধারণা থেকে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার প্রাথমিক কাঠামো গঠিত হয়। পরবর্তী কালে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) আবিষ্কৃত হয় তখন তা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে জানার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করে। বিভিন্ন শিলা বা খনিজ বা জীবাশ্মের বয়স বের করার ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম, কার্বন, স্ট্রনসিয়াম ইত্যাদি মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা ও রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়। যার ফলে ক্রমাগত সংশোধন এবং নতুন তথ্য যোগ হয়ে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে এটিতে আরও অনেক নতুন তথ্য যুক্ত হবে।

ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা অধ্যয়ন করে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অতীত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উন্মোচন করতে পারেন। এছাড়া জীবনের বিবর্তন শনাক্ত করতে, ব্যাপক বা গণ-বিলুপ্তি শনাক্ত করতে, মহাদেশগুলোর স্থানান্তর বুঝতে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং উল্কাপিণ্ডের প্রভাবের মতো প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করতে পারেন। ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা বৈশ্বিক ঘটনাগুলোর ভেতর সম্পর্কগুলো জানার জন্য এবং ঘটনাগুলো বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং জীবাশ্মবিদ, ভূতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর সমৃদ্ধ ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে সাহায্য করে।

১৩.২.৩ গণ-বিলুপ্তি (Mass extinctions) :

বিলুপ্তি বলতে কোনো একটি জীব প্রজাতির সকল সদস্যের ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বোঝায়। যেমন- ডাইনোসরের একটি প্রজাতি টাইরানোসোরাস রেক্স (T. Rex) এর সব সদস্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এই প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। একইভাবে বলা যায় যে, স্যাবারটুথ টাইগার নামে এক ধরনের বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং যার ফলে এখন একটিও জীবিত স্যাবারটুথ টাইগার খুঁজে পাওয়া যাবে না। গণ-বিলুপ্তি হলো টাইরানোসোরাস রেক্স এবং স্যাবারটুথ টাইগারের মতো আরও হাজার হাজার প্রজাতি একসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি গণ-বিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে। যেমন- এখন থেকে প্রায় 6.6 কোটি বছর পূর্বে ক্রিটেশাস-পেলিওজিন গণ-বিলুক্তির ঘটনা ঘটে। সে সময় ডাইনোসরসহ পৃথিবীর মোট জীব প্রজাতির অন্তত 75 শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই গণবিলুপ্তি দ্বারা মেসোজোয়িক মহাযুগের সমাপ্তি এবং সিনোজোয়িক মহাযুগের সূচনার সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

আবার উল্টো ঘটনাও রয়েছে। যেমন- আজ থেকে প্রায় 54 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রচুর নতুন প্রজাতি এবং জটিল (Complex) ধরনের প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। এই ঘটনার মাধ্যমে ক্যামব্রিয়ান যুগের সূচনা চিহ্নিত করা হয়। অতি প্রাচীনকালের এসব তথ্য মূলত জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায়।

১৩.৩ জীবাশ্ম (Fossils) :

চিত্র ১৩.৩ : গাছের আঠায় আটকে পড়া একটি ভিমরুল যা আজ থেকে 2.0-1.5 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল।

অতীতে বসবাসকারী যে কোনো জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) দেহাবশেষ বা দৈহিক গঠনের অথবা বসবাসের যে কোনো চিহ্ন জীবাশ্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। ল্যাটিন শব্দ 'Fossus' থেকে ফসিল (Fossil) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। জীবাশ্ম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন- হাড়, দাঁত, দেহের বাইরের শক্ত খোলস, এমনকি অবক্ষেপ বা পাথরের মাঝে জীবের দেহের যে কোনো চিহ্ন জীবাশ্মের মধ্যে পড়ে। জীবাশ্ম বিভিন্ন আকারের হতে পারে, অতি ক্ষুদ্র এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বিশালাকার ডাইনোসর বা গাছের অংশ ফসিল আকারে পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত কোনো জীবের ফসিল হতে হলে তার চিহ্ন বা দেহাবশেষ কমপক্ষে ১০ হাজার বছরের পুরোনো হতে হয়। এছাড়া সবচেয়ে পুরোনো জীবাশ্মের মধ্যে রয়েছে ৩৫০ কোটি বছরের পুরোনো এককোষী সায়ানোব্যাকটেরিয়া যা Stromatolites নামে পরিচিত। জীবাশ্মের ধরনগুলো নিম্নরূপ হয়ে থাকে :

১৩.৩.১ বডি জীবাশ্ম (Body Fossil) :

এক্ষেত্রে কোনো জীবের সম্পূর্ণ বা আংশিক দেহাবশেষ জীবাশ্ম আকারে পাওয়া যায়। যেমন- বরফে জমে থাকা আদি মানবের মৃতদেহ অথবা লোমওয়ালা হাতির (Mammoth) মৃতদেহ, গাছের আঠা বা কষে আটকে পড়া পতঙ্গ ইত্যাদি। পরবর্তী কালে গাছের আঠা জমে তা অ্যামবারে (Amber) পরিণত হয় এবং তার মাঝে আটকে পড়া জীবদেহ প্রায়শ অক্ষত থাকে (চিত্র ১৩.৩)।

১৩.৩.২ মোল্ড এবং কাস্ট জীবাশ্ম (Mold and Cast) :

অনেক ক্ষেত্রে কোনো জীবের দেহাবশেষ যে অবক্ষেপে (Sediment) চাপা পড়ে তা সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পাললিক শিলায় পরিণত হয়। পরবর্তী কালে জীবের দেহাবশেষ ক্ষয় হয়ে গেলেও তার ছাপ সেই শিলায় থেকে যায়। এগুলোকে মোল্ড বা ছাঁচ বলা হয়। মোল্ড বা ছাঁচের ভেতরের ফাঁকা অংশ যদি পুনরায় অবক্ষেপ দ্বারা পূর্ণ হয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং দেখতে সেই জীবের দেহের মতো হয় তখন তা কাস্ট জীবাশ্মে পরিণত হয় (চিত্র ১৩.৪)।

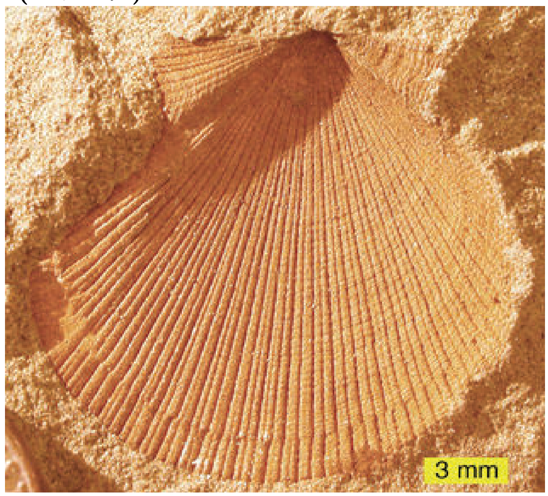

চিত্র ১৩.৪ : প্রায় 6 কোটি বছর পূর্বের ঝিনুক জাতীয় প্রাণীর মোল্ড এবং কাস্ট জীবাশ্ম।

১৩.৩.৩ ট্রেস জীবাশ্ম (Trace Fossils) :

কখনো কখনো জীবের বসবাসের বা চলাচলের বিভিন্ন চিহ্ন পাললিক শিলায় বা অবক্ষেপে পাওয়া যায়। যেমন- পায়ের ছাপ, চলাচলের ফলে সৃষ্ট পথ, বসবাসের গর্ত, তৈরি বাসা ইত্যাদি (চিত্র ১৩.৫)।

চিত্র ১৩.৫ : জুরাসিক যুগের শুরুর দিকে বিচরণকারী ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

১৩.৩.৪ পারমিনারালাইজড

জীবাশ্ম (Permineralized Fossil) :

চিত্র ১৩.৬ : প্রস্তরীভূত বৃক্ষ

অনেক ক্ষেত্রে মৃত জীবের দেহের শক্ত অংশের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থান বা ছিদ্রসমূহ খনিজ দ্বারা (সাধারণত পানিবাহিত) পূর্ণ হয়ে যায় এবং সেই জীবের দেহের আকার ও আকৃতি সংরক্ষণ করে। কখনো কখনো সেই খনিজ জীবের টিস্যুর উপাদানকে প্রতিস্থাপন করে ফেলে। এ ধরনের জীবাশ্মের একটি উদাহরণ হলো প্রস্তরীভূত গাছ (চিত্র ১৩.৬)।

জীবাশ্ম আমাদের সামনে অতীতের জানালা খুলে দেয়। জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করে সেই জীবের গঠন এবং তৎকালীন পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন- সমুদ্র থেকে বহু দূরে কোথাও যদি মাটি বা পাথরের মাঝে সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাহলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে সেখানে এককালে সাগর বা মহাসাগর ছিল। যেমন- বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের টেকেরঘাট এলাকায় প্রাপ্ত পাললিক শিলায় বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। কাজেই আমরা জানি এই এলাকাটি এক সময় সমুদ্রের নিচে ছিল। বর্তমান সময়ে আধুনিক রেডিও আইসোটোপ ডেটিং-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সেই জীবের অবস্থানের প্রকৃত সময় পর্যন্ত বের করা সম্ভব।

১৩.৪ সময় প্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর পরিবর্তন :

শিলার রেডিও আইসোটোপ ডেটিং ও অন্যান্য পদ্ধতি থেকে জানা যায় যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে। এই সময়কালে পৃথিবীতে প্রথম যে দুটি পরিবর্তন ঘটে তা হলো- (১) পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তন এবং (২) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি ও পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি পরিবর্তনের কারণে যে তৃতীয় পরিবর্তনটি ঘটে তা হলো- (৩) পৃথিবীর জীবজগতে পরিবর্তন। এই তিনটি পরিবর্তনের কথা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১৩.৪.১ ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তন

460 কোটি বছর পূর্ব থেকে 57 কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় প্রাক-ক্যামব্রিয়ান। ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার প্রায় 85% সময় এই অংশের অন্তর্গত। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান সময়কালকে হেডিয়ান, আর্কিয়ান এবং

প্রোটোজোয়িক ইয়নে বা কল্পে ভাগ করা হয়েছে।

প্রাক ক্যামব্রিয়ান সময়ের তিনটি ইয়ন বা কল্পের মধ্যে হেডিয়ান সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে কম সময়কাল বিস্তৃত (460 কোটি বছর পূর্ব থেকে 400 কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত)। এ সময় মূলত পৃথিবীর গঠন প্রক্রিয়া চলমান ছিল। পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল প্রাণ ধারণের জন্য সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পৃথিবীর মহাকর্ষের কারণে অসংখ্য গ্রহাণু, ধূমকেতু এবং অন্যান্য ছোটো-বড় মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছিল মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। অক্সিজেন ছিল না বললেই চলে। আদি মহাসাগরও এই কল্পের শেষ পর্যায়ে গঠিত হতে শুরু করে। ভূত্বকের প্রথম খনিজ ও শিলাও এই সময় তৈরি হয়।

এরপর আসে আর্কিয়ান (400 কোটি বছর পূর্ব থেকে 250 কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত) এবং প্রোটেরোজোয়িক (250 কোটি বছর থেকে 54 কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত) ইয়ন বা কল্প। আর্কিয়ান কল্পে প্রথম মহাদেশ গঠিত হয় এবং পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণ ধারণের উপযোগী হতে থাকে। প্রথম পাললিক শিলাও এ সময় গঠিত হয়। প্রোটেরোজোয়িক কল্পে প্রথম প্লেট-টেকটোনিকের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। এ সময় প্রথম বিশালাকার মহাদেশ (Supercontinent) এবং প্রথম মহাসাগরীয় ভূত্বক (Ocean crust) গঠিত হয়।

১৩.৪.২ ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন

ডিগ্যাসিং (Degassing) নামক এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প, সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস বের হয়ে এসে আদি বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়। পরবর্তী কালে সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম সায়ানোব্যাকটেরিয়ার আগমনের পর থেকে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আগমন ঘটে যা উদ্ভিদের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে। ওজোন স্তর তৈরি হবার পর সেটি সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে তার প্রভাব থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠকে রক্ষা করতে শুরু করে। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রাণ ধারণের জন্য অধিকতর উপযোগী ও নিরাপদ হওয়ায় জীবের প্রজাতি সংখ্যাও বাড়তে থাকে। উল্লেখ্য, ওজোনস্তর ফলে সমুদ্র ছাড়াও স্থলভাগে নানান প্রজাতির প্রাণের বিচরণ ও বিকাশ ঘটতে থাকে। পৃথিবীর পানির উৎস হিসেবে মূলত পৃথিবীর আদিপর্যায়ে আঘাত করা ধূমকেতুকে চিহ্নিত করা হয়। তবে ভূপৃষ্ঠের গভীর থেকে প্রাপ্ত শিলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর গুরুমণ্ডলে (Mantle) উচ্চ তাপে ও চাপে বিশেষ অবস্থায় গলিত শিলার সঙ্গে পানি সংযুক্ত রয়েছে যার পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত পানির তুলনায় অনেক বেশি।

১৩.৪.৩ ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর জীবজগতে পরিবর্তন

পৃথিবীতে জীব তার পুরো ইতিহাস জুড়ে অসাধারণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাচীনতম এককোষী জীব থেকে শুরু করে বর্তমান জটিল ইকোসিস্টেম পর্যন্ত যা আমরা আজ পর্যবেক্ষণ করি সেগুলো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন গঠনের একটি ক্রমাগত পরিবর্তন (চিত্র ১৩.৭)। এই পরিবর্তনের ঘটনাটি বিবর্তন নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক নির্বাচন, জেনেটিক প্রকরণ এবং অভিযোজনের মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, প্রজাতিগুলো

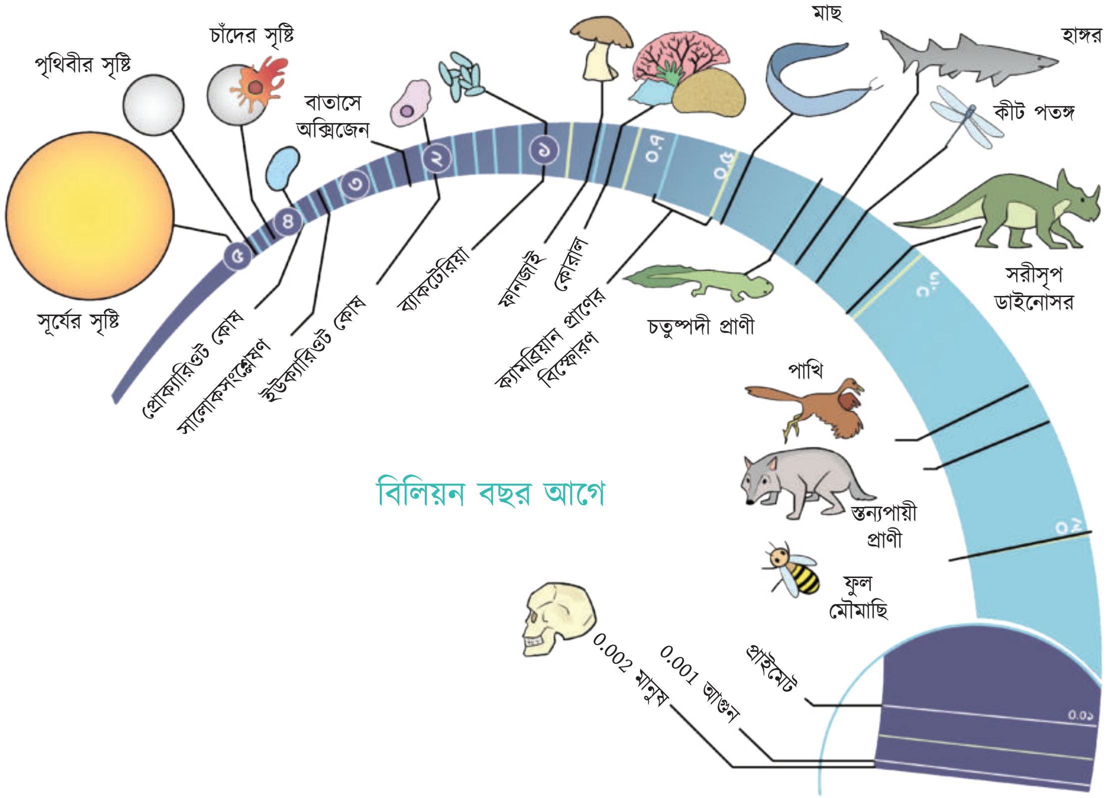

চিত্র ১৩.৭ : পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ এবং বিকাশ

বৈচিত্র্যময় ভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং কখনও কখনও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীবাশ্ম রেকর্ড পৃথিবীতে জীবনের বিবর্তনীয় যাত্রা শনাক্ত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, জীবজগৎ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং অভিযোজনের মধ্য দিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জলজ থেকে স্থলজ আবাসস্থলে রূপান্তরের ফলে গাছপালা এবং প্রাণীদের দ্বারা স্থলভাগ পরিপূর্ণ হয়েছে। এই রূপান্তরটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে এবং আমরা আজ যে জীবনের অসাধারণ বৈচিত্র্য দেখি তার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল মেসোজোয়িক যুগে সরীসৃপদের উত্থান এবং আধিপত্য, যাকে সাধারণত 'ডাইনোসরের মহাযুগ' বলা হয়। ডাইনোসরসহ অন্যান্য প্রাচীন সরীসৃপগুলো তখন ভূমিতে প্রাধান্য বিস্তার করে বিচরণ করেছিল। তাদের বিবর্তন পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতি এবং নতুন পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে জটিলভাবে যুক্ত ছিল।

ডাইনোসরের আকস্মিক বিলুপ্তির পর সেনোজোয়িক যুগে স্তন্যপায়ী প্রাণীর আগমন ঘটে এবং তাদের পরবর্তী বৈচিত্র্য পৃথিবীতে জীবনের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিভিন্ন বাসস্থানের সঙ্গে

খাপ খাইয়ে নেয়, জটিল সামাজিক আচরণের বিকাশ ঘটায় এবং অবশেষে মানুষসহ প্রাইমেটদের উদ্ভব ঘটায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিবর্তনের অধ্যয়ন জীব এবং তাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এটি বিবর্তনের গতিপথ নির্ধারণে পরিবেশগত মিথস্ক্রিয়া এবং জিনগত পরিবর্তনের ভূমিকা তুলে ধরে। জীবের পরিবর্তনের ধরন এবং প্রক্রিয়াগুলো পরীক্ষা করে, বিজ্ঞানীরা জীবনের জটিল জালিকায় আমাদের অবস্থান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করেন।

পৃথিবীর ইতিহাস এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো অধ্যয়ন করে, আমরা মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান অনুভব করতে পারি। আমরা আমাদের গ্রহের সংবেদনশীলতা এবং এর ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মানুষের যে দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি।

আমরা কখনওই যেন ভুলে না যাই যে পৃথিবী এখন পর্যন্ত জীবের একমাত্র আবাসস্থল যা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীকে অনন্য করে তুলেছে।

অধ্যায় ১৪

পরিবেশ ও ভূমিরূপ

অধ্যায় ১৪ পরিবেশ ও ভূমিরূপ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ ভূগর্ভস্থ পানি : ধরন, সৃষ্টি, জলাধার
- ☑ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি
- ☑ ভূমিরূপ সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া
- ☑ ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া (Endogenic)
- ☑ ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়া (Exogenic)
- ☑ বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের গঠন ও জীববৈচিত্র্যের ধরন
- ☑ পর্বত
- ☑ টিলা এবং পাহাড়
- ☑ মালভূমি
- ☑ সমতলভূমি

পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশেরও কম অংশ জুড়ে রয়েছে স্থলভাগ, এই স্থলভাগের ভূমিরূপ খুবই বৈচিত্র্যময়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর বৈচিত্র্য এবং ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন শক্তির কারণে স্থলভাগের ভূমিরূপে এই বৈচিত্র্য এসেছে। একদিকে টেকটোনিক প্লেটের গতিশীলতার কারণে প্লেট সীমানা বরাবর বিশেষ ভূমিরূপ দেখা যায়, অন্যদিকে নিরক্ষীয় অথবা মেরু অঞ্চল এলাকায় জলবায়ুজনিত কারণে ভূমিরূপ অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থান হিসেবে ৭০% -এর বেশি জলভাগ, শুধু তাই নয় স্থলভাগেও ভূপৃষ্ঠের উপরে এবং নিচে বিভিন্নভাবে পানির অস্তিত্ব রয়েছে। এই জলভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু এবং ভূমিরূপ গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো স্থানের প্রাকৃতিক গঠন এবং পরিবেশ সেই স্থানে ভূমিরূপ গঠন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে আবার অন্যদিকে নানান ধরনের ভূমিরূপ থাকার কারণে সেখানকার পরিবেশেও তার প্রভাব পড়ে থাকে।

১৪.১ ভূগর্ভস্থ পানি (Ground Water) :

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ির আশপাশে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা কিংবা হ্রদ-হাওড়ের পানি দেখেছ। শুধু তাই নয়, নিশ্চয়ই বর্ষাকালে আকাশ ভেঙে বৃষ্টিও হতে দেখেছ তাই তোমাদের ধারণা হতে পারে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের এই পানি বুঝি পৃথিবীর পানির বড়ো একটা অংশ। আসলে এটি মোটেও সত্যি নয়,

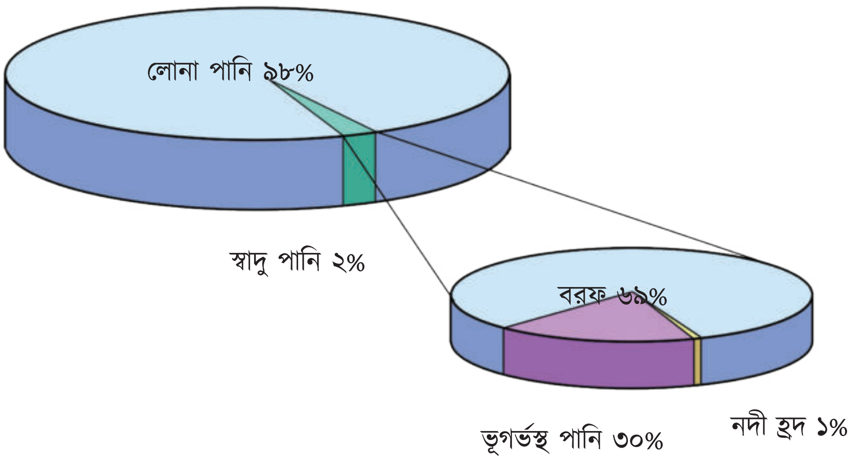

চিত্র ১৪.১ : পৃথিবীর নানা ধরনের পানি এবং তার পরিমাণ

ভূপৃষ্ঠের এই পানি পৃথিবীর মোট পানির অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ (চিত্র ১৪.১)। পৃথিবীর মোট পানির 98 শতাংশ পানি হচ্ছে সমুদ্র মহাসমুদ্রের লোনা পানি, মাত্র 2 শতাংশ পানি হচ্ছে স্বাদু পানি। স্বাদু পানির এই 2 শতাংশকে যদি 100 ভাগ ধরে নিই তাহলে তার 69 শতাংশ রয়েছে বরফ বা হিমবাহ আকারে মেরু অঞ্চলে এবং উঁচু পর্বতশৃঙ্গে। বাকি 31 শতাংশের 30 শতাংশই হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি, যেটি রয়েছে মাটির নিচে। বাকি 1 শতাংশ পানি হচ্ছে খাল-বিল-নদীনালা বা মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদির পানি।

আমরা বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হতে দেখি। যখন স্থলভাগের উপর বৃষ্টিপাত হয় তখন এবং তারও কিছু সময় পর পর্যন্ত বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। যেমন-

(১) গাছের ডালপালা, পাতা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে বা ঝরে পড়ে বৃষ্টির পানি মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছে। একে বলা যেতে পারে উদ্ভিজ্জের পৃষ্ঠস্থ প্রবাহ (Through flow) । গাছপালার আবরণ না থাকলে বৃষ্টির পানির ফোঁটা সরাসরি উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে।

(২) বৃষ্টির পানির বড়ো একটি অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীনালায় যায় এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে সাগর মহাসাগরে মেশে। একে বলে পৃষ্ঠতলীয় প্রবাহ (Surface Runoff)।

(৩) কিছু পানি ভূপৃষ্ঠস্থ মাটির ভেতর প্রবেশ করে থাকে। একে বলে অনুপ্রবেশ (Infiltration)। এই পদ্ধতিতে পানি মাটির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থানে সঞ্চিত হয় যা গাছ তার প্রয়োজনে গ্রহণ করতে পারে।

বাকি পানি মাটির নিচে শিলার ফাঁকা স্থান বা ফাটল ভেদ করে আরও গভীর প্রবেশ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানি হিসেবে সঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে মাটি অথবা শিলার অভ্যন্তরের ফাটল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা স্থানগুলো সম্পূর্ণ পানি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। পানি ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় যদি সেখানে কোনো অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে পৌঁছায় তখন সেই পানি আরও গভীরে যেতে পারে না। বরং সেই শিলাস্তরের উপরে অবস্থিত শিলা বা

অবক্ষেপের (Sediments) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা ফাটলের মাঝে জমা হতে থাকে। এর ফলে যে ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরি হয় তাকে বলে অ্যাকুইফার (Aquifers)। আলগা শিলার মাঝে প্রচুর ফাঁকা স্থান থাকায় তার মাঝে পানি প্রবেশ ও সংরক্ষিত থাকতে পারে তাই বালু, বেলেপাথর, চুনাপাথর প্রভৃতি দ্বারা গঠিত আলগা স্তর ভালো অ্যাকুইফার হিসেবে কাজ করে।

প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের অবস্থানের ভিত্তিতে অ্যাকুইফার (চিত্র ১৪.২) দুই ধরনের হয়ে থাকে; যেমন-

(১) উন্মুক্ত অ্যাকুইফার (Unconfined Aquifers),

(২) আবদ্ধ অ্যাকুইফার (Confined Aquifers)

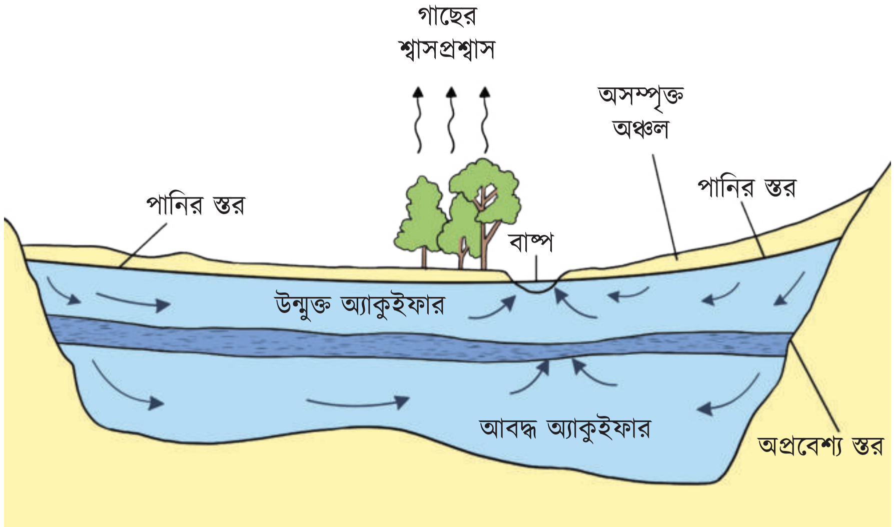

চিত্র ১৪.২ : দুই ধরনের অ্যাকুইফারের অবস্থান। এখানে লক্ষণীয় যে ভূগর্ভে কোথাও কোথাও পানি জমতে কয়েক হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ বছরও লাগতে পারে।

১৪.১.১ উন্মুক্ত অ্যাকুইফার :

ভূগর্ভস্থ কোনো পানির স্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যদি অনুপ্রবেশযোগ্য শিলাস্তর থাকে তবে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সহজে তার ভিতর প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই স্তরের পানি উত্তোলন করে ফেললেও সেটি পুনরায় পূর্ণ হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠে যদি কংক্রিটের স্তর, রাস্তা, দালান বা অন্যান্য স্থাপনার কারণে অপ্রবেশ্য স্তর সৃষ্টি করা হয় তবে উন্মুক্ত অ্যাকুইফারের পানি পুনরায় পূর্ণ হওয়া ব্যাহত হয়। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে সেই স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর (Water Table) পূর্বের অবস্থানে তুলনায় নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই সকল এলাকায় পানি উত্তোলন করতে হলে নলকূপ বা পাম্পের পাইপ মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করাতে হবে।

১৪.১.২ আবদ্ধ অ্যাকুইফার :

উন্মুক্ত অ্যাকুইফারের চেয়ে মাটির অনেক গভীরে আবদ্ধ অ্যাকুইফার অবস্থিত। এই অ্যাকুইফারের উপরে এবং নিচে দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে। এই অপ্রবেশ্য স্তরে পানি প্রবেশ করতে পারে না বলেই চলে। যদি অপ্রবেশ্য স্তরে কোনো ফাটল বা ছিদ্র থাকে সেক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই সেই ছিদ্র বা ফাটল থেকে পানি ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসবে। উপরের পাথরের স্তরের ভর এবং প্রবেশ্য অংশ থেকে প্রবেশ করা পানির চাপে এই স্তরের পানি অধিক চাপে থাকে বলে এরকম হয়ে থাকে। আবদ্ধ অ্যাকুইফারের ছিদ্র বা ফাটল দিয়ে ভূগর্ভে থাকা উচ্চ চাপের পানি বাইরে বের হয়ে আসলে তাকে আর্টেশিয়ান কূপ (Artesian well) বলা হয়।

১৪.২ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ভূমিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আমরা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নদীর পলিবাহিত সমতলভূমি দেখি। এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে রয়েছে পাহাড় ও টিলা। সিলেট বিভাগের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে নিচু হাওড় অঞ্চল। আমরা যদি বাংলাদেশ ছেড়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তাকাই তাহলে মরুভূমি, হিমবাহ, উঁচু পর্বত, উপত্যকা, মহাসাগরের নিচে গভীর খাত, হ্রদ, আগ্নেয়গিরি এরকম আরও অনেক বিচিত্র ভূমিরূপ দেখতে পাব। এসব ভূমিরূপ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণেও একধরনের ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়ে অন্যধরনের ভূমিরূপে রূপান্তরিত হতে পারে।

এই অধ্যায়ে আমরা ভূমিরূপ গঠনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানব। পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু শক্তি কাজ করে ভূ-অভ্যন্তর থেকে এবং কিছু শক্তি কাজ করে ভূপৃষ্ঠের বাইরে থেকে। কাজেই প্রাকৃতিক যেসব কারণে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া (Endogenic Process) এবং

(২) ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়া (Exogenic Process)

১৪.৩ ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া

এই ধরনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমিরূপের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং শক্তি কাজ করে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে। আমরা পূর্বের শ্রেণিগুলোতে প্লেট টেকটোনিক সম্পর্কে জেনেছি। মূলত প্লেট টেকটোনিকের সঙ্গে ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া জড়িত। এক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে ওপরের স্তর বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত শিলাসমূহে আকার ও অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যেতে পারে অথবা ভূ-অভ্যন্তর

থেকে ম্যাগমা বের হয়ে এসে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়াকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়,

(১) বলের প্রভাবজনিত বিকৃতি (Diastrophism)

(২) আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত (Volcanism)

১৪.৩.১ বলের প্রভাবজনিত বিকৃতি (Diastrophism)

ভূপৃষ্ঠের শিলার উপর বল প্রযুক্ত হলে শিলার আকার ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন শিলার উপর প্রযুক্ত বলটি কতটুকু এবং কোনদিকে কাজ করেছে তার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের বল কাজ করে। যেমন-

(ক) সংকোচন বল (Compression force)

(খ) প্রসারণ বল (Extension force)

সংকোচন বা প্রসারণ বলের ক্ষেত্রে শিলার উপর দুই দিক থেকে প্রযুক্ত বলের কারণে শিলার সংকোচন এবং বিকৃতি ঘটে।

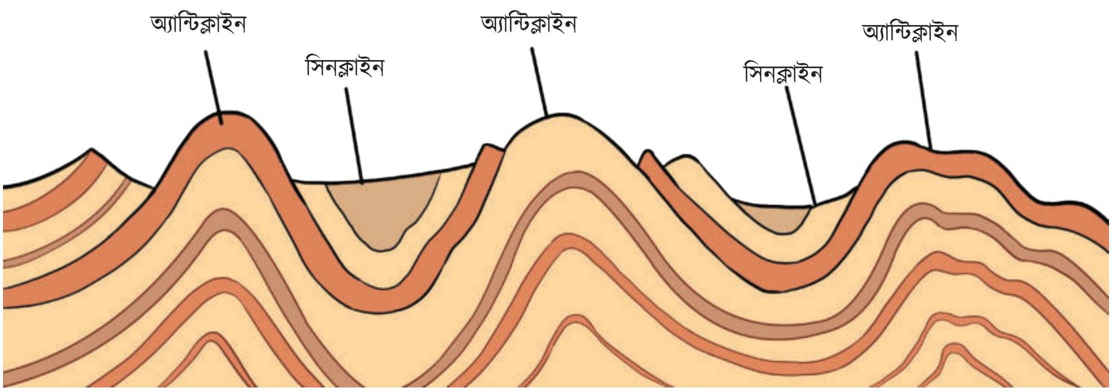

চিত্র ১৪.৩ : ভাঁজে উঁচু বা তোরণ আকৃতির অংশ অ্যান্টিক্লাইন বা উত্তল ভাঁজ এবং নিচু বেসিনের মতো অংশকে সিনক্লাইন বা অবতল ভাঁজ বলে।

ভাঁজ (Folding) : আমরা পূর্বে জেনেছি যে বিভিন্ন প্রকার শিলার কাঠিন্য বিভিন্ন রকম। ফলে তাদের উপর প্রযুক্ত বল সহ্য করার ক্ষমতাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠস্থ শিলায় যদি দুই দিক থেকে পরস্পরমুখী সংকোচন বল কাজ করে তাহলে সেই শিলার বিকৃতি ঘটে এবং তাতে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে শিলার শুধু

আকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু তা ভেঙে যায় না। ভাঁজের উঁচু অংশকে উত্তল ভাঁজ অ্যান্টিক্লাইন এবং নিচু অংশকে অবতল ভাঁজ বা সিনক্লাইন (চিত্র ১৪.৩) বলে। অ্যান্টিক্লাইনে পাহাড়শ্রেণি এবং সিনক্লাইনে উপত্যকা সৃষ্টি হয়। আমরা যদি এই বিজ্ঞান বইটি টেবিলে রেখে দু দিক থেকে চাপ দিই তবে দেখা যাবে বইয়ের মাঝের অংশ ভাঁজ হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। এখানে যেমন- অনেকগুলো পাতা ভাঁজ হয়ে যায় তেমনি ভূপৃষ্ঠে শিলার যে অনেকগুলো স্তর একটি আরেকটির উপরে অবস্থিত সেগুলো ভাঁজ হয়ে যায় (চিত্র ১৪.৪)।

চিত্র ১৪.৪ : গ্রিসে চুনাপাথর এবং চার্ট পাথরের স্তরে গঠিত ভাঁজ। এগুলো পূর্বে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ছিল। পরবর্তী সময়ে সংকোচন বলের প্রভাবে এমন ভাঁজ গঠিত হয়েছে।

পাহাড় এবং উপত্যকা ছাড়াও আরেক ধরনের ভূমিরূপ হচ্ছে মালভূমি। মালভূমি মূলত অধিক উচ্চতায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ সমতল বা আংশিক তরঙ্গায়িত ভূমি। মালভূমির চারদিক খাড়া ঢালযুক্ত যা অনেকটা টেবিলের মতো। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মালভূমি হলো- পামির মালভূমি, ইরানের মালভূমি ইত্যাদি। পানি ও হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, প্লেট টেকটোনিক প্রভৃতি কারণে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে।

চিত্র ১৪.৫ : মরক্কোতে অবস্থিত একটি চ্যুতি। এখানে চ্যুতি রেখা বরাবর পাথরের স্তরের মাঝে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

চ্যুতি (Faulting) : কোনো স্থানের ভূপৃষ্ঠে শিলার উপর সংকোচন বা প্রসারণ বল প্রয়োগের ফলে যদি তাতে ফাটলের সৃষ্টি হয় তখন সেই ফাটল তল বরাবর একটি শিলার খণ্ড অপরটির থেকে বিভিন্ন দিকে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে (চিত্র ১৪.৫)। শিলা প্রযুক্ত বল সহ্য

করতে না পারার কারণে তাতে ফাটল সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপরটির থেকে, (১) নিচে নেমে যেতে পারে অথবা (২) অনুভূমিকভাবে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিংবা (৩) উপরে উঠে যেতে পারে। সেই হিসেবে চ্যুতি তিন ধরনের (চিত্র ১৪.৬) হয়ে থাকে, যেমন-

(ক) স্বাভাবিক চ্যুতি : স্বাভাবিক চ্যুতির ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপর শিলাখণ্ড থেকে নিচে নেমে যায়। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে যে অংশটি উপরে উঠে থাকে তা নিম্নগামী শিলাখণ্ডের সঙ্গে স্থূলকোণে অবস্থান করে (ছবি)। ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ডের দৃশ্যমান অংশকে চ্যুতি খাড়াই বলা হয়।

(খ) স্ট্রাইক-স্লিপ চ্যুতি : এই ধরনের চ্যুতির ক্ষেত্রে দুটি শিলাখণ্ড পাশাপাশি অবস্থান পরিবর্তন করে। খাড়া দিকে অবস্থান পরিবর্তন না হওয়ায় এক্ষেত্রে কোনো চ্যুতি খাড়াই দেখা যায় না।

(গ) বিপরীত চ্যুতি : এই ধরনের চ্যুতির ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড অপর একটি শিলাখণ্ডের উপরে উঠে যায় এবং ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ডের কিছু অংশ নিচের শিলাখণ্ডের উপর ঝুলে থাকে। এই ঝুলন্ত অংশটি ভেঙে নিচে পড়ে এবং ভূমিধসের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নিচে অবস্থানকারী শিলাখণ্ডের সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী শিলাখণ্ড সূক্ষ্মকোণে অবস্থান করে (ছবি)। এই কোণ অতিরিক্ত কম হলে (১০ ডিগ্রির চেয়ে কম) তাকে ওভারথ্রাস্ট চ্যুতি বলে।

স্বাভাবিক চ্যুতি

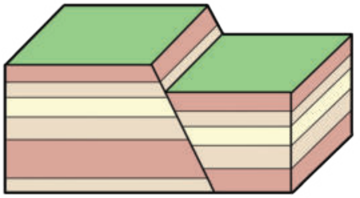

স্ট্রাইক-স্লিপ চ্যুতি

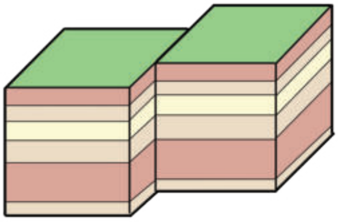

বিপরীত চ্যুতি

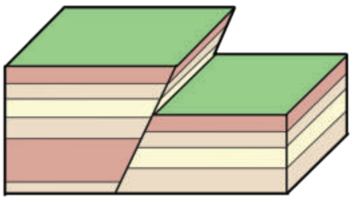

চিত্র ১৪.৬ : স্বাভাবিক চ্যুতি, স্ট্রাইক-স্লিপ চ্যুতি এবং বিপরীত চ্যুতি।

১৪.৩.২ আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত (Volcanism)

পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একটি চমকপ্রদ ভূমিরূপ (চিত্র ১৪.৭) হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। এক্ষেত্রে ভূ-অভ্যন্তর থেকে গলিত পাথর, ছাই, বিভিন্ন গ্যাস, জলীয় বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ইত্যাদি বাইরে বের হয়ে আসে। গলিত পাথর ভূ-অভ্যন্তরে থাকলে তাকে ম্যাগমা বলে, সেই ম্যাগমা বা গলিত পাথর বাইরে বের হলে তাকে লাভা বলে (চিত্র ১৪.৮)। বিভিন্ন ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। লাভার ধরনের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরি দুই ধরনের হতে পারে; যেমন-

চিত্র ১৪.৭ : গত 12,000 বছরের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হওয়া আগ্নেয়গিরির অবস্থান। এখানে প্রতিটি ডট দ্বারা একটি বা ক্ষেত্রবিশেষে একগুচ্ছ আগ্নেয়গিরি বুঝানো হয়েছে।

বিস্ফোরক ধরনের : একটি আগ্নেয়গিরি কী ধরনের হবে সেটি লাভার বৈশিষ্ট্য, তাতে গ্যাসের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। লাভার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে গলিত সিলিকার (SiO_2) শতকরা পরিমাণ।

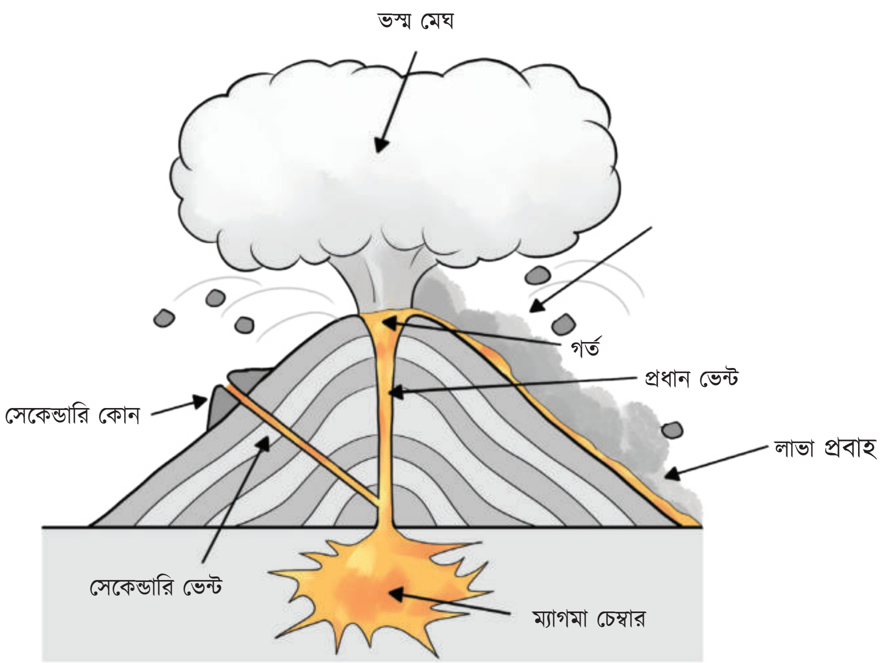

চিত্র ১৪.৮ : আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অংশ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

লাভাতে যদি সিলিকার শতকরা পরিমাণ বেশি হয় তবে সেটি অ্যাসিডিক টাইপের লাভা হয়। এই ধরনের লাভা বেশি ঘন ধরনের হয় বলে সহজে বের হয়ে আসতে বা প্রবাহিত হতে পারে না। এই ধরনের লাভা নির্গমনকারী আগ্নেয়গিরিগুলো বিস্ফোরক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত মাউন্ট সেন্ট হেলেন।

শান্ত বা শিল্ড ভলকানো : লাভাতে সিলিকার পরিমাণ কম হলে তাকে ব্যাসিক টাইপের লাভা বলে এবং এ ধরনের লাভা সহজে প্রবাহিত হতে পারে। এই আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণ ছাড়াই লাভা বের হতে থাকে। সাধারণত দুটি টেকটোনিক প্লেট একে অপর থেকে দূরে যেতে থাকলে সেই স্থানে এমন প্রক্রিয়ায় নতুন প্লেট গঠিত হয়। লাভা সহজে প্রবাহিত হয় বলে এই ধরনের লাভা দিয়ে গঠিত আগ্নেয়গিরির ঢাল খুব মসৃণ হয় এবং সেটি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। দেখতে অনেকটা যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের মতো হওয়ায় এই ধরনের আগ্নেয়গিরিকে শিল্ড ভলকানো বলা হয়; হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের শিল্ড ভলকানো এরকম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ।

চিত্র ১৪.৯ : ২০১৭ সালে পেরুতে সাবানকায়া (Sabancaya) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

আবার আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার ভিত্তিতে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন-

১. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি : যেসব আগ্নেয়গিরিতে বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত চলছে (চিত্র ১৪.৯)।

২. সুপ্ত আগ্নেয়গিরি : এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে সেটি অনেক বছর ধরে বন্ধ আছে। ম্যাগমা প্রকোষ্ঠ পুনরায় ম্যাগমা দ্বারা পূর্ণ হলে আবার ভবিষ্যতে এতে অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা আছে।

৩. মৃত আগ্নেয়গিরি : এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতে আর অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই।

আগ্নেয়গিরির গঠন বা তা দেখতে কেমন তার ওপর ভিত্তি করেও অনেক ধরনের আগ্নেয়গিরি হতে পারে। এছাড়া মহা আগ্নেয়গিরি (Super Volcano) নামে আরেকটি ধরন রয়েছে। এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে কয়েক লক্ষ বছরে একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়। অন্যান্য আগ্নেয়গিরি তুলনায় নির্গত লাভা ও অন্যান্য বস্তুর পরিমাণও অনেক বেশি। ইন্দোনেশীয় মাউন্ট টোবা (Mount Toba) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন জাতীয়

উদ্যান এ ধরনের আগ্নেয়গিরির উদাহরণ। মহা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলে এবং সেটি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হলে তা পুরো পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমরা এতক্ষণ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে জানলাম। তবে আগ্নেয়গিরির কারণে ভূ-অভ্যন্তরে এমন অনেক গঠন সৃষ্টি হয় যা উপরের শিলা বা মাটি ক্ষয় হয়ে গেলে তবেই দেখা যায়।

সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি :

স্থলভূমির মতো সমুদ্রের নিচেও আগ্নেয়গিরি পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে অগ্ন্যুৎপাতও হয়ে থেকে। এই ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা বের হয়ে আসে সেগুলো সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে এসে জমাট বেঁধে পানির নিচে পর্বতমালার সৃষ্টি করে থাকে। যখন এই পর্বতমালার উচ্চতা অনেক বেড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে তখন সেগুলো সাগর-মহাসাগরে দ্বীপ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে টঙ্গা নামে একটি দ্বীপকে এভাবে গড়ে ওঠা সবচেয়ে নতুন একটি দ্বীপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (চিত্র ১৪.১০)।

চিত্র ১৪.১০ : প্রশান্ত মহাসাগরে সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি দিয়ে তৈরি টঙ্গা নামে দ্বীপ।

১৪.৪ ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়া (Exogenic) :

ভূমিরূপ সৃষ্টিতে এই ধরনের প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের বাইরের বস্তু ও শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেসব বস্তুর দ্বারা এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাদেরকে বলা হয় এজেন্ট (agent)। ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়ায় পানি, বায়ু এবং বরফ, এই তিনটি এজেন্ট কাজ করে। ভূ-বহিঃস্থ প্রক্রিয়ায় তিনটি মূল ধাপ রয়েছে; যেমন-

১. ক্ষয় কার্য,

২. পরিবহণ

৩. অবক্ষেপণ

এই প্রতিটি ধাপেই বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। তবে কোথায় কোনো ধরনের এজেন্ট দ্বারা এই তিনটি ধাপে ভূমিরূপ গঠিত হবে তা নির্ভর করে সেই স্থানের অবস্থান ও জলবায়ুর উপর। যেমন- যেসব স্থানে পানির প্রাচুর্য রয়েছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে পানি ভূমিরূপ সৃষ্টির এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

শুষ্ক স্থানে পানির অভাব থাকে। সেক্ষেত্রে বায়ু এজেন্টের ভূমিকা পালন করে। আবার অতি ঠান্ডা অঞ্চলে বরফ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

১৪.৪.১ ক্ষয়কার্য (Erosion)

প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিলার দুর্বল ও ক্ষয় হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচূর্নিভবন (Weathering) বলে। প্রথমে ভূপৃষ্ঠের শিলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এজেন্ট দ্বারা অন্য স্থানে অপসারিত হয়। তিন প্রক্রিয়ায় বিচূর্নিভবন হতে পারে। যেমন-

১. ভৌত বিচূর্নিভবন

২. রাসায়নিক বিচূর্নিভবন

৩. জৈব বিচূর্নিভবন

ভৌত বিচূর্নিভবন (Physical Weathering) :

এই প্রক্রিয়ায় শিলা বিভিন্ন ভৌত শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং খণ্ড বিখণ্ড হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে শিলার গঠনকারী খনিজসমূহের রাসায়নিক গঠন অক্ষুণ্ন থাকে, শুধু শিলার আকার এবং আকৃতির পরিবর্তন হয়। যেমন- একটি বড়ো গ্রানাইট (এক ধরনের আগ্নেয় শিলা) পাথর ভৌত বিচূর্নিভবনের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি পাথরে পরিণত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভৌত বিচূর্নিভবন প্রক্রিয়ার মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এরকম :

হিমজনিত প্রক্রিয়া (Frost action): ঠান্ডা অঞ্চলগুলোতে পাথরের মাঝে ফাটলে দিনের বেলা তরল পানি প্রবেশ করে এবং রাতের অধিক ঠান্ডায় তা জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পানি বরফে পরিণত হলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং ফাটলের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ফাটল আরও বর্ধিত হয়। দিনের বেলায় সূর্যের তাপে সেই বরফ গলে আবার পানিতে পরিণত হয় এবং রাতের তৈরিকৃত বড়ো ফাটলে

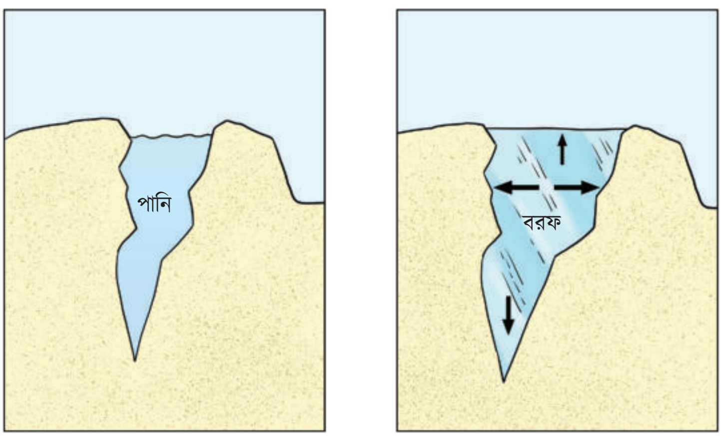

চিত্র ১৪.১১ : হিমজনিত প্রক্রিয়া। এখানে পাথরের মাঝে তরল পানি প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে রাতের বেলা অধিক ঠান্ডায় পানি বরফে পরিণত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি এবং পাথরের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে।

আরও অধিক পানি প্রবেশ করতে পারে (চিত্র ১৪.১১)। পরে তা রাতে আবার বরফে পরিণত হলে তা পাথরে অধিক চাপ সৃষ্টি করে এবং ফাটলকে আরও বর্ধিত করে। এভাবে কঠিন শিলা ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলায় পরিণত হয় (চিত্র ১৪.১২)।

লবণ স্ফটিক গঠনজনিত (Salt crystal growth) : এই প্রক্রিয়াটি হিমজনিত প্রক্রিয়ার মতোই, তবে এক্ষেত্রে পাথরের ফাটলে চাপ সৃষ্টি করে লবণের স্ফটিক। পৃথিবীর বিভিন্ন শুষ্ক অঞ্চলে পানি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। ফলে সেই পানিতে অবস্থিত দ্রবীভূত লবণ স্ফটিকে পরিণত হয়। লবণের স্ফটিক যত বৃদ্ধি পায়, পাথরের মাঝে ফাটলে তা তত বেশি চাপ সৃষ্টি করে এবং ভৌত বিচূর্ণিভবন সংঘটিত হয় (চিত্র ১৪.১৩)।

তাপের পরিবর্তন জনিত (Thermal Action) : কিছু স্থানে দিন ও রাতে তাপমাত্রার মাঝে অনেক পার্থক্য থাকে। সেসব স্থানে দিনে সূর্যের তাপে শিলা প্রসারিত হয় এবং রাতে ঠান্ডায় সংকুচিত হয়। আমরা জানি শিলা বিভিন্ন ধরনের খনিজের মিশ্রণ। বিভিন্ন ধরনের খনিজ তাপের কারণে বিভিন্ন হারে প্রসারিত হয়। ফলে শিলার মাঝে বিভিন্ন অংশে চাপের পার্থক্যের কারণে তা ভেঙে যেতে থাকে।

চিত্র ১৪.১২ : হিমজনিত প্রক্রিয়ায় পাথরে সৃষ্ট ফাটল

চিত্র ১৪.১৩ : ক্যালিফোর্নিয়ার সল্ট পয়েন্ট স্টেট পার্কে লবণ স্ফটিক গঠনের কারণে সৃষ্ট ভূমিরূপ

চিত্র ১৪.১৪ : ক্যালিফোর্নিয়ার ইউসেমাইট (Yosemite) জাতীয় উদ্যানে এক্সফলিয়েসন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ

এক্সফলিয়েসন (Exfoliation) : মাটির নিচে গভীরে যেসব শিলা থাকে তা উপরের মাটি এবং শিলার চাপে কিছুটা সংকুচিত অবস্থায় থাকে। সময়ের পরিবর্তনে উপরের শিলা বা মাটি অপসারিত হলে নিচের শিলা ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত হয়। এসব শিলার উপরে প্রযুক্ত চাপ না থাকায় তা প্রসারিত হয় এবং সমান্তরাল অনেকগুলো ফাটল সৃষ্টি হয়। এভাবে শিলা পেঁয়াজের খোসার মতো স্তরে স্তরে ভাঙতে থাকে (চিত্র ১৪.১৪)।

রাসায়নিক বিচূর্নিভবন (Chemical Weathering)

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা শিলা বিচূর্ণ হলে তা রাসায়নিক বিচূর্নিভবন সংঘটিত করে। এক্ষেত্রে শিলা শুধু আকারে নয়, রাসায়নিক গঠনেও পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিচূর্নিভবনও বিভিন্ন রকম হতে পারে; যেমন-

জারণ (Oxidation) : বায়ু এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন শিলার খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নতুন ধরনের পদার্থ সৃষ্টি করে। সাধারণত ধাতব খনিজসমূহ এই প্রক্রিয়ায় অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে নতুন পদার্থ পূর্বের খনিজের তুলনায় গঠনগতভাবে দুর্বল হয় এবং সহজে ভেঙে যায়। অনেক সময় নতুন সৃষ্ট পদার্থ আয়তনের বৃদ্ধি পায় এবং শিলায় চাপ সৃষ্টি করে তা ভাঙতে সাহায্য করে।

পানিযোজন (Hydration) : শিলা গঠনকারী খনিজসমূহ পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে একাধিক নতুন যৌগ গঠন করতে পারে। যেমন- গ্রানাইট শিলায় (যা একটি অত্যন্ত কঠিন শিলা) অবস্থিত একটি খনিজ ফেল্ডসপার। পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে তা অপেক্ষাকৃত নরম ক্লে বা কাদা এবং সিলিকা বালুতে পরিণত হয়।

আর্দ্রবিশ্লেষণ (Hydrolysis) : এক্ষেত্রে পানির অণু খনিজের যৌগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভিন্নধর্মী খনিজ গঠন করে। যেমন- অ্যানহাইড্রাইট নামক খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে জিপসাম গঠন করে।

অম্লীয় বিক্রিয়াজনিত (Acid reaction) : বায়ুতে অবস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির পানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দুর্বল কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিড কার্বনেট জাতীয় শিলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে এবং সেই শিলাকে ক্ষয় করে ফেলে। চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি শিলা বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রাসায়নিকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। আমরা অনেকেই মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য অথবা

চিত্র ১৪.১৫ : অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে ক্ষয় হওয়া মার্বেল পাথরে তৈরিকৃত ভাস্কর্য

ভিত্তিপ্রস্তর ক্ষয় হতে দেখেছি যা মূলত অম্লীয় বিক্রিয়াজনিত কারণে হয়ে থাকে (চিত্র ১৪.১৫)।

জৈব বিচূর্নিভবন (Biological Weathering) : উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কার্যক্রমের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে। যেমন- কিছু কিছু উদ্ভিদ পাথরে জন্মাতে পারে। এসব উদ্ভিদের শিকড় পাথরের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে আরও গভীরে প্রবেশ করে এবং এর ফলে পাথরে ফাটলের সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিক্রমায় সেই পাথর ক্ষয় হয়ে আরও ছোটো টুকরায় পরিণত হয়। আমরা অনেকেই বিভিন্ন দালানের গায়ে বট বা পাকুর গাছ জন্মাতে দেখেছি। এসব গাছের শিকড়ের কারণে ভবনের দেয়ালে বা ছাদে ফাটল সৃষ্টি হয়। ছোটো ছোটো অণুজীব দ্বারাও শিলা ক্ষয় হতে পারে। এক্ষেত্রে সে সকল অনুজীব থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক শিলা ক্ষয়ে সাহায্য করে (চিত্র ১৪.১৬)।

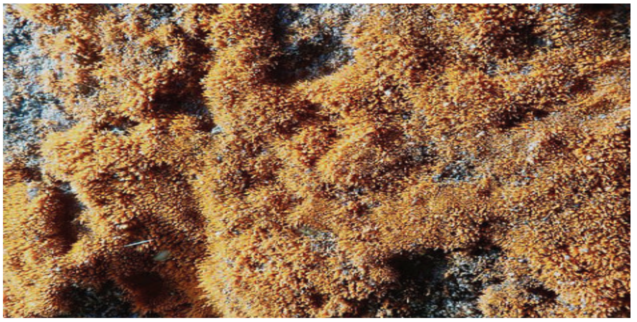

চিত্র ১৪.১৬ : স্পেনের লা পালমায় (La Palma) ব্যাসল্ট নামক আগ্নেয় শিলায় লাইকেন দ্বারা জৈব বিচূর্নিভবন

১৪.৪.২ পরিবহণ (Transportation)

বিচূর্নিভবনের পর পানি, বায়ু অথবা বরফ দ্বারা সেই অবক্ষেপ (Sediment) পরিবাহিত হয়। এক্ষেত্রে অবক্ষেপ কী দ্বারা পরিবাহিত হচ্ছে তার উপরে সেই পরিবহণের গতি নির্ভর করে। যেমন- নদীতে পানি দ্বারা পরিবহণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত সংঘটিত হয়। অপরদিকে বরফ বা হিমবাহের দ্বারা পরিবহণ তুলনামূলকভাবে অনেক ধীরগতিতে (দিনে দুই থেকে তিন ফুট) হয়ে থাকে। বায়ুর গতিবেগের পরিবর্তনের সঙ্গে অবক্ষেপ পরিবহণের গতি ভিন্ন হতে পারে। পরিবহণের এজেন্টের উপর ভিত্তি করে নির্ভর করে কত বড় আকারের অবক্ষেপ পরিবাহিত হবে। যেমন- পাহাড়ি নদীগুলোতে অনেক বড়ো আকারের পাথরের টুকরো

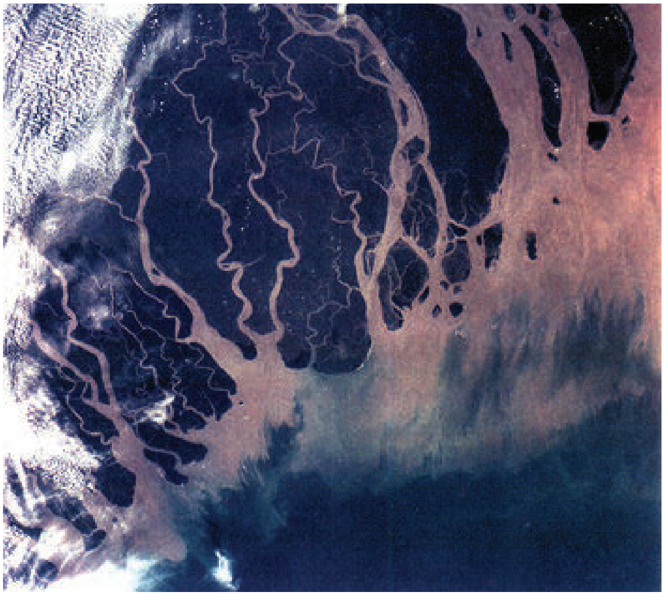

চিত্র ১৪.১৭ : বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ।

পরিবাহিত হয়। হিমবাহতেও বড়ো আকারের পাথর পরিবাহিত হতে পারে। অপরদিকে বায়ুর ঘনত্ব পানির তুলনায় প্রায় এক হাজার ভাগে এক ভাগ হয় হওয়ায় তা বড়ো আকারের অবক্ষেপ পরিবহণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বালি বা ধূলিকণা বায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবহণ কয়েকশো মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। শুনে তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, আফ্রিকার মরুভূমিগুলো থেকে মিহি সিল্ট জাতীয় ধূলিকণা পরিবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় এসে জমা হতে পারে।

১৪.৪.৩ অবক্ষেপণ (Deposition)

পানি বায়ু এবং বরফের দ্বারা পরিবাহিত অবক্ষেপ অবশেষে বিভিন্ন স্থানে জমা হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। যেমন- নদীবাহিত পলি জমা হয়ে প্লাবনভূমি গঠন করে। সমুদ্রে নদীর পানি যেখানে মেশে সেখানে বদ্বীপ গঠিত হয় (চিত্র ১৪.১৭)। বায়ুবাহিত ধূলিকণা জমা হয়ে লোয়েস (Loess) নামক উর্বর ভূমি গঠন করে। মরুভূমির বিভিন্ন আকারের বালিয়াড়িও বায়ুবাহিত বালি জমা হয়ে তৈরি হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বায়ু প্রবাহের সঙ্গে অবস্থান পরিবর্তন করে। হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত অবক্ষেপ জমা হয়ে বিভিন্ন ধরনের মোরেইন (Moraine) নামক ভূমিরূপ গঠন করে (চিত্র ১৪.১৮)।

১৪.৫ বিভিন্ন ভূমিরূপে জীববৈচিত্র্যের ধরন

ভূমিরূপের গঠন এবং ধরনের উপর ভিত্তি করে সেই স্থানের জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। আমরা পৃথিবীব্যাপী পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমতলভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি নানা ধরনের ভূমিরূপ দেখতে পাই। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপে জলবায়ু এবং পরিবেশ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যা সে স্থানের জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে। যেমন- মরুভূমিতে জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং পানি অত্যন্ত দুর্লভ। সেখানে দিন অত্যন্ত উষ্ণ এবং রাত অত্যন্ত শীতল হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসকারী প্রাণী এবং জন্মানো উদ্ভিদ অনন্য বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। মরুভূমির ক্যাকটাস তার কাণ্ডে প্রচুর পানি জমা রাখতে পারে। অপরদিকে মরুভূমির উট, ছোটো ইঁদুর, ছোটো পতঙ্গ, সাপ প্রভৃতি সামান্য পানি গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে পারে।

চিত্র ১৪.১৮ : বুলগেরিয়াতে অবস্থিত আইসি হ্রদের চারপাশে জমা হওয়া মোরেইন।

উঁচু পাহাড় বা পর্বত সাধারণত অত্যন্ত দুর্গম হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসকারী জীবজন্তুও সেই স্থানের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে থাকে। যেমন- পাহাড়ে বসবাসকারী ছাগল অত্যন্ত উঁচু এবং বিপজ্জনক খাড়া ঢাল ধরে চলাচল করতে

পারে। বেশি উঁচু পর্বতসমূহ এবং পৃথিবীর শীতপ্রধান স্থানসমূহ বরফে আচ্ছাদিত থাকে। তাই সেখানে জন্মানো অনেক গাছ কোনাকার হয়ে থাকে। এতে করে সেই গাছের উপরে পড়া তুষার সহজে ঝরে পড়তে পারে। একই সঙ্গে সেইসব স্থানের প্রাণীদের শীত সহনশীলতা বেশি এবং সাধারণত তাদের চামড়ার নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং বাইরে লম্বা লোম থাকে। এসব তাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীর শীতল ও পাহাড়ি স্থানগুলোতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হলো তুষার চিতা, এন্ডিয়ান কন্ডর, লম্বা শিঙের ভেড়া, আইবেক্স, পাহাড়ি গরিলা, লিঙ্কস ইত্যাদি।

সমতলভূমি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থাকলেও সেখানে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সেই স্থানের জলবায়ু অক্ষাংশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বিভিন্ন স্থানের সমতল ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে।

নিরাপদ সড়ক: দায়িত্ব আমারও

আমি পথচারী, চালক অথবা শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যখন যে অবস্থানে থাকি না কেন, নিরাপদ সড়কের দায়িত্ব আমারও। আইন মান্য করা, সচেতনতা আর দায়িত্বশীলতাই পারে নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে।

পথচারীর দায়িত্ব: রাস্তা চলাচল ও পারাপারে ফুটপাথ, জেব্রা ক্রসিং ও ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার পাশ দিয়ে চলা, পাশাপাশি কয়েকজন না হেঁটে লাইন ধরে ঝুঁকিমুক্তভাবে হাঁটা, রাস্তা পারাপারের নিয়ম মেনে চলা।

চালকের দায়িত্ব: নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানো, বৈধ লাইসেন্সসহ গাড়ি চালানো, নিবন্ধিত গাড়ি চালানো, সড়ক আইন ও ট্রাফিক সংকেত মেনে গাড়ি চালানো।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম শ্রেণি বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য